শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৫ম বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৩

প্রকাশকাল
১৫.০৩.১৪

সম্পাদক
শরমিন নিশাত
শওকত হোসেন

যোগাযোগ
বাবুল অডিও
১৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

প্রচ্ছদ অংকন
রুবাবা হোসেন নদী

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়

বেশিদামে কেনা বিনাদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা! নিম্নবিত্তের দেশে বেশ কিছু বিষয় অন্তত বেচা-বিক্রির বাইরে রাখা প্রয়োজন ছিল। বেচা হবে, কতটা, সেটি নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন ছিল। বেচা হয়েছে চাষির হালের বলদ, কর্পোরেট কোম্পানির কাছে ফসলের বীজ, নিজস্ব আবাস, শিক্ষা, চিকিৎসা। বেচা হয়ে গেছে বাকিটুকু নৈতিকতা। পর্ণ-বেনিয়াদের কাছে অমল যৌনতা!

রাষ্ট্রের প্রয়োজন আর আছে কি? রাষ্ট্রই বেচে দিয়েছে তেল-গ্যাস-কয়লা, চাষের পানি, আকাশের ফ্রিকুয়েন্সি, সমুদ্র-সম্পদ! সংস্কৃতি, ভাষা, আমার স্বপ্ন! মুক্তিযুদ্ধের আর অর্থ কী–? সে-ও বিক্রি হয়ে আছে– বিনাদামে!

দেশ ছাড়ছে দলে-দলে যুবক। ওদের মেধা বিক্রি হচ্ছে দেশে-দেশে। বিনাদামে! সোনার দেশে পড়ে রইছে রুগ্‌ণ মানুষ। নেতৃত্বশূন্য চারদিক। মুখের দিকে দেখি– সব চাকর! দালাল! এদের হাতে বাঁচবে দেশ?

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
সম্পাদক, গোলাঘর
১৫.০৩.২০১৪

সূচি

স্ম র ণ

ছবি: রণদা প্রসাদ সাহা ০৪

ব্য ক্তি ত্ব / প্র ব ন্ধ

জনসেবা ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রণদা প্রসাদ সাহা

হে না সু ল তা না ০৫

রা জ নৈ তি ক অ র্থ নী তি / প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা:একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আ বু ল বা র কা ত ১৭

ই ং রে জি / প্র ব ন্ধ

A Method of Colonization

Z a f r u l l a h C h o w d h u r y ৮০

না ট ক / প্র ব ন্ধ

মৌলিক নাটকের সংকট ও রূপান্তরিত নাটকের সম্ভাবনা: প্রেক্ষিত কোর্টমার্শাল

কা মা ল উ দ্দি ন ক বি র ৯১

ক বি তা

সত্তর, আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা ১০০

গ ল্প

থ্যালা সামলিয়ে লে লে

মো হা ম্ম দ আ সা দু জ্জা মা ন ১৭১

প্রকাশিত গল্পের উপলব্ধি

স্ব কৃ ত নো মা ন ১৭৬

না রী / প্র ব ন্ধ

‘শেষের রাত্রি’ এবং রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর নারীভাবনা

কা জ ল ব ন্দ্যো পা ধ্যা য় ১৭৭

(স্ম র ণ)

রণদা প্রসাদ সাহা

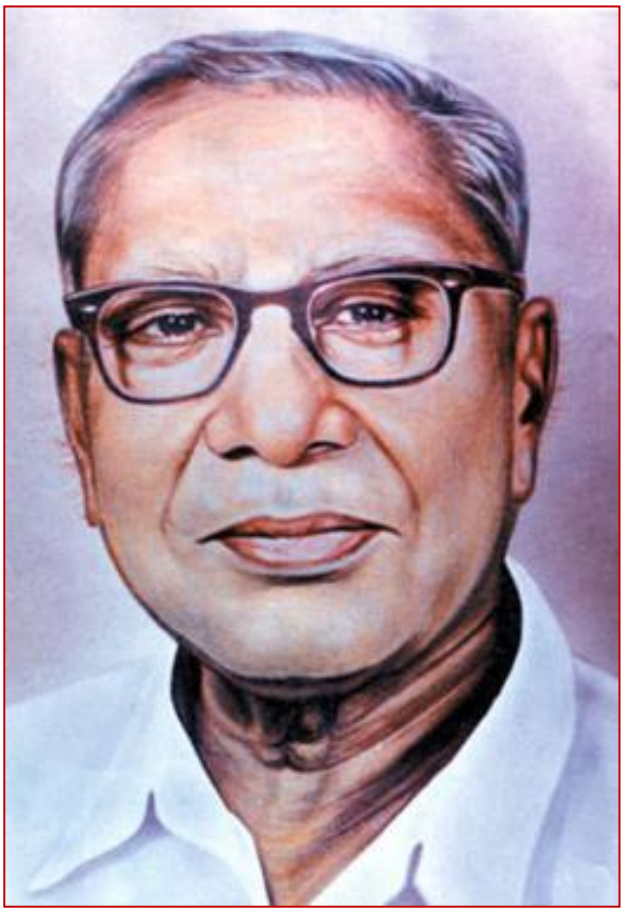

১৮৯৬ - ১৯৭১

জনসেবা ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রণদা প্রসাদ সাহা

হে না সু ল তা না

উচ্চতর মূল্যবোধের অধিকারী এক বিস্ময়কর রকম শক্তিমান মানুষ ছিলেন রণদা প্রসাদ সাহা। তাঁর শ্রমশক্তি ও চিন্তাশক্তি দুই-ই ছিল বিস্ময়কর।

রণদা প্রসাদ সাহার জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে। বাংলার এক অতিসাধারণ গ্রামের প্রথাবদ্ধ এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে বিত্তশালী হয়েছিলেন এবং সেই যাবতীয় বিত্তকে, বিত্তের উৎস সকল কর্মকা- কে বিশেষ নীতিমালার আলোকে দেশসেবা ও কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি রণদা প্রসাদের অবদান এই সরল বাক্যে প্রকাশিত হলেও তিনি অপ্রকাশিতই থেকে যান আমাদের কাছে। কারণ তাঁকে জানতে হলে, একটা বিশাল সময়কে ধারণ করতে হবে। সেই সময়ের সকল উত্থান-পতনের পূর্বাপর ইতিহাসও আমাদের জানতে হবে।

রণদা প্রসাদ সাহাকে খণ্ডিত ভাবে দেখার কোনো উপায় নেই। সমগ্র সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রতিটি কর্মকা- কে মিলিয়ে দেখলেই অনুধাবন করা সম্ভব সামগ্রিকভাবে তিনি কতটা মহৎ ছিলেন, কী ভাবে কাজে কর্মে, দেশচিন্তায় স্বপ্নে ও বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে ব্যক্তি রণদা প্রসাদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন। রণদা প্রসাদ যে স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবায়নের জন্য প্রধান যে উপকরণের প্রয়োজন তা হল আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি হিসেবে তিনি আনুষঙ্গিক উপকরণ যথা অর্থ ও অর্থের জন্য নিশ্চিত সংস্থানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ী হবার দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন যেমন তাঁর নিজের জীবন থেকে তেমনি দেশমাতৃকার সেবার দীক্ষা পেয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে। উন্নয়নের ইতিহাসে রণদা প্রসাদ সাহার অবদান সুবিশাল। কুমুদিনী হাসপাতাল বা ভারতেশ্বরী হোমস মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার হয়নি। রণদা প্রসাদ এইসব কীর্তি স্থাপন করেছেন গত শতকের চল্লিশের দশকে।

১৮৯৬ সালে ঢাকা জেলার সাভারের অদূরে শিমুলিয়ার কাছৈড় গ্রামে মাতুলালয়ে রণদা প্রসাদের জন্ম। ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন পশ্চাদপদ এক অখ্যাত গ্রাম মির্জাপুরে। মির্জাপুর সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা

শহরে অবস্থিত। যাতায়াতের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, ভয়ঙ্করভাবে বিচ্ছিন্ন। লোকজনের যাতায়াতের জন্য একমাত্র উপায় পায়ে হাঁটা অথবা নদীপথ। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু রয়েছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আড়াআড়িভাবে যাওয়া কাদামাটির পথ আর চারপাশের গ্রামগুলোতে সংযোগকারী সরু মেঠোপথ। অধিকাংশ পথ তৈরি হয়েছে খাবারসন্ধানী পশুর চলাচল অথবা সাপ্তাহিক হাটে দ্রুত যাওয়ার জন্য লোকজন যে সব জায়গা দিয়ে যাতায়াত করত সেখানেই সংক্ষিপ্ত পথ তৈরি হত। বর্ষা মৌসুমে মানুষ ও পশুর এই সব পায়ের ছাপ রূপান্তরিত হত অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী-নালায়। পানি সরে যাওয়ার পর এইসব ক্ষুদ্র নদী-নালা হয়ে পড়ত কর্দমাক্ত নোংরা জলাশয়ে। এরই ওপরে যাতায়াতের জন্য বানানো হত বাঁশের সাঁকো। সেইসব জায়গায় নিরাপদ বসবাস ছিল ম্যালেরিয়া, আমাশয় আর কলেরা বাহকের।

রণদা প্রসাদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ছিল না, তেমন সুযোগও পাননি। তিন ভাই, এক বোন। সংসারে বাবা, মা, ঠাকুমা আরো বোধহয় বাড়তি দু'একজন– একান্নবর্তী পরিবার যেমন হয়। বাবা দেবেন্দ্র পোদ্দারের ধরাবাঁধা আয়ের কোনো উৎস নেই। সংসারের মানুষগুলো দিনরাত খেটেও কোনো কূলকিনারা খুঁজে পায় না। উপরন্তু সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তারা বেশ খানিকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতিরই হয়ে ওঠেন। শিশুরা হয়ে পড়ে স্নেহ-শাসনহীন বেয়াড়া।

এই রকম একটি পরিবারে বড় হওয়া রণদা প্রসাদের চরিত্রে এসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তাহলে এল কোথা থেকে? কতটা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে? কতটাই-বা পরিবেশ থেকে? সেই গ্রামে কত শত ছেলেই তো বড় হয়েছে, একই বাড়িতে তাঁর ভাই-বোন রণদা প্রসাদের দুরন্তপনায় সঙ্গী হয়েছে। কেউ তাঁর মতো বিস্ময়কর হয়ে ওঠেনি! ক্রমে আমরা জানতে পারব, কোনো একটি সূত্রের কাছে রণদা এই আদর্শ পাননি অথবা একদিনেও তিনি যা হয়েছিলেন, তা হননি। শৈশবে রণদা প্রসাদ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মা কুমুদিনীর নামে একটি হাসপাতাল করবেন এই আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষাই-বা কোথায় খুঁজে পেলেন তিনি?

ব্যক্তিচরিত্র গঠনে যেমন পরিবারের প্রভাব থাকে, তেমনি পরিবেশের প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই। রণদা প্রসাদ কি তাহলে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে রণদা প্রসাদের জীবন, তাঁর পরিবার এবং পরিবারের আওতার বাইরে তিনি কিভাবে মানুষ হয়েছিলেন তা জানা দরকার।

রণদা প্রসাদ মাত্র সাত বছর বয়সে মাকে হারান। তিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন খুব দুরন্ত হাসি-খুশি, চঞ্চল, নির্ভীক ও বড়ই প্রাণবন্ত। বাল্য-কৈশোরে ভরপুর চঞ্চলতা, স্বভাবের অনুক্ষণ অস্থিরতাই নাকি প্রতিভার ধর্ম। বাল্যের দুরন্তপনার ভেতরেই হয়তো লুকানো থাকে উত্তরকালের যাবতীয় বৈপ্লবিক সম্ভাবনা। অঙ্কুরের মধ্যেই তো থাকে বনস্পতির সংকেত। রণদা প্রসাদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পদচিহ্ন যেন আঁকা হয়ে গিয়েছিল তাঁর আপন শৈশবেই।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্র পোদ্দার আত্মীয়-পরিজনের পরামর্শে ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবার জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। ঘরে এলেন নতুন মা। মা-হারা ছেলেটি সংসারে তাঁর কাছে পেতে পারত হারানো মাতৃস্নেহ, দুষ্টুমির প্রশ্রয়, পূর্ণ হতে পারত মায়ের শূন্যস্থান। কিন্তু তা হয়নি।

ছায়াহীন রৌদ্রদগ্ধ খোলা মাঠে হাজারো আগাছার সাথে কখনো একটি একরোখা চারাগাছ সবার অলক্ষে বড় হতে থাকে। স্নেহমায়াশূন্য সংসারে রণদা প্রসাদও তেমনি আরো দুরন্ত ও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন যেন। ঠাঁই হল না সৎ মায়ের সংসারে। সংসারের শান্তির জন্য বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন শিমুলিয়ায় মামাবাড়িতে। ইতিমধ্যে ছোট ছেলে ফণীকে টাঙ্গাইলের মহেরার জমিদারবাড়িতে পুষ্যি করে দেয়া হয়। রণদা প্রসাদ স্থানীয় নিম্ন-মাধ্যমিক পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণির পর আর এগুতে পারেননি। বাবার দ্বিতীয় বিবাহ ও সংসারের নিষ্ঠুরতা রণদা প্রসাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মামাবাড়িও তাঁর জন্য ছিল বৈরী। স্নেহের কাঙ্গাল শিশুমন টিকল না সেখানেও। তিনি পালিয়ে গেলেন নিরুদ্দেশে যখন সবেমাত্র কৈশোরে পা দিয়েছেন। অনেকদিন খোঁজখবরে জানা গেল নতুন জীবনের সন্ধানে সবার অলক্ষে পৌঁছে গেছেন কলকাতায়।

ঠিকানাহীন রণদাকে কলকাতায় আক্ষরিক অর্থেই ভাসতে হয়েছে প্লাবনে ভাসা কচুরিপানার মতো। সেখানে প্রতিকূল পরিবেশের পায়ে তাঁকে মাথা খুঁড়তে হয়েছে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, যেখানে কেউ কাউকে দয়া করে না। শুধুই বন্ধ দরজা, কোথাও আশ্রয় নেই। না পাওয়ার বেদনায় ভার হয়ে উঠছে জীবনের পেয়ালা। দেশের অবস্থাও তখন তেমনি। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকের বড় অবদান হল জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধের ফলে এদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাজনীতির সংস্পর্শে এসে চিন্তাশীল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে, নিজের দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবার অধিকার তাদের নিজেদেরই রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই অধিকার আদায় করার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং আরও অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। কংগ্রেস গঠনের প্রায় পনের বছর পর ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমালোচনা শুরু হল। কংগ্রেস ভারতীয় অ্যাক্টের বিলোপ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার ও সম্প্রসারণের দাবি করল। কালক্রমে চরমপন্থীদের অভ্যুদয় এবং ১৮৯৭ সাল থেকে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক নীতি দেখা দিল। বঙ্গদেশ ও মহারাষ্ট্র বিপ্লবীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হল। ব্রিটিশ সরকার এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এই আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হল।

একদিকে বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে বিফলতার গ্লানি। তখন স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রসারের ফলে ইংরেজসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে উঠছে। কিন্তু সে অনুপাতে চাকরি জুটছে না। অথচ পল্লিকেন্দ্রিক মানুষ ইংরেজি শিক্ষা

লাভ করে আর পল্লিগ্রামে ফিরে যেতে চাইছে না। অবহেলিত ও পরিত্যক্ত পল্লিবাংলায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তখন ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করেছে। গ্রামবাংলার কুটিরশিল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং শহরে কল-কারখানা প্রসারের ফলে অশিক্ষিত মানুষও শহরে এসে ভিড় করছে। শহরেও চাকরির অবস্থা দ্রুত অবনতি হয়। এরই ভিতরে দানা বেঁধে ওঠে নতুন বিপ্লব স্বদেশী আন্দোলন। রণদা প্রসাদকে বিপ্লব হাতছানি দিল। তিনি জড়িয়ে পড়লেন তাতে। এ সময় জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্য নির্দ্বিধায় তিনি কুলিগিরি থেকে ফেরিওয়ালার কাজ করেছেন, কখনো-বা কলকাতার রেলস্টেশনে খবরের কাগজ বিক্রি। হতাশা কখনো তাঁকে কাবু করতে পারেনি। এ সবের মধ্যেই চলছিল স্বদেশীদের সঙ্গে ওঠা-বসা, গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদানের বহক। রণদা প্রসাদ আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের পথটিতে। অচিরেই পুলিশের নজরে পড়লেন। কয়েকবার পুলিশের হাতে মারধর খেলেন, কিছুদিন জেলও খাটলেন। মাতৃভূমির যে স্বাধীনতা ছিল সেদিনের মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষা তাতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল রণদা প্রসাদ সাহার হৃদয়। সৎমায়ের অত্যাচার, বাবার অবহেলায় ঘরছাড়া কোমলহৃদয় ছেলেটির মনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনালগ্নে দেশপ্রেমের যে বীজটি উপ্ত হয়েছিল, পরবর্তী কালে ব্যাপক সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর আত্মনিয়োগ তারই ফলশ্রুতি।

১৯১৪ সাল। শান্ত পৃথিবীতে বেজে উঠল প্রলয়ঙ্করী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্যের আহ্বান জানালেন সকল বিপ্লবীকে– যাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল দখলদার ইংরেজের উৎখাত ও দেশের মুক্তি। তাই নেতার এই আহ্বানে অনেক বিপ্লবীই অসন্তুষ্ট হন। তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা জানিয়ে ছিল এই আশায় যে, যুদ্ধশেষে তাদের মস্তবড় প্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এর বিনিময়ে জুটল কুখ্যাত 'রাউলাট-আইন'। ১৯১৭ সালে সরকার বিচারপতি এস. এ. রাউলাট-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে বিপ্লবী অপরাধীদের অনুসন্ধান ও যারা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত, তাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধান প্রণয়নের আদেশ জারি করেন। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পেশকৃত "আন্দোলন ও বিপ্লবাত্মক অপরাধ অ্যাক্ট" সাধারণত 'রাউলাট অ্যাকট'– নামে পরিচিত। এই আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালে। এই অ্যাকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব ও রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অবদমিত করেছিল। এতে প্রচলিত বিধান ছাড়াই রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার করা হত। ফলস্বরূপ ব্রিটিশের দমননীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক মারাত্মক আন্দোলন শুরু হয়।

দেশপ্রেমে তাড়িত রণদা প্রসাদ নেতার আহ্বানে অন্যান্য বাঙালি যুবকের মতো অংশ নিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে "প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের

সদস্যদের পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়। রণদা পুলিশের ছাড়পত্র পেলেন না। কারণ তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগে কিছুদিন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসেবে হাজতে ছিলেন। বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মাহতাব এবং বেঙ্গল মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. এস পি সর্বাধিকারী মূল ভূমিকা রাখেন। ডা. সর্বাধিকারী সরাসরি পুলিশ কমিশনার ও তার সহকারীদের সাথে রণদার বিষয়ে যোগাযোগ করেন এবং চূড়ান্তভাবে রণদার ছাড়পত্র আদায়ে সমর্থ হন।"–*বাঙালি পল্টন*– মুহাম্মদ লুৎফুল হক।

কুতল আমারায় ব্রিটিশ বাহিনী তুর্কি সেনাপতি হাসিম পাশার হাতে দীর্ঘদিন বন্দি ছিল। সেই সঙ্গে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরও। রণদা প্রসাদ যুদ্ধক্লান্ত আহত সৈনিকদের সেবা করতেন প্রাণ দিয়ে। তিনি যখন যে কাজেই থেকেছেন তাতে যেমন আন্তরিকতা থাকত তেমনি ছিলেন অবিচল ও বিশ্বস্ত। শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে তখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আহত ইংরেজ সৈন্যরা নানা রোগে আক্রান্ত। দারুণ খাদ্যাভাব। বিপদের মুখে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে রণদা প্রসাদ চুপি চুপি সবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁর সংগ্রহ করা টাটকা সবজি খেয়ে সৈনিকরা পাইওরিয়া, স্কার্ভি ও অন্যান্য অসুখের হাত থেকে রক্ষা পায়।

১৯১৬ সালের ২৭ জুন, এক দুর্ঘটনায় সামরিক হাসপাতালে আগুন ধরে যায়। আগুনের লেলিহান শিখার তাণ্ডব চারিদিকে। সবাই জীবন বাঁচাতে পালাতে ব্যস্ত। রণদা তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন কিংয়ের কাছে আটকে পড়া রোগীদের উদ্ধারের জন্য অনুমতি চান, কিন্তু আগুনের অবস্থা বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন কিং এই ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেন। রণদার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি ঝুঁকি নিতে রাজি হন। রণদা প্রসাদ একাই জ্বলন্ত হাসপাতালে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন, রণদার সাহস দেখে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন ডা. এস পি সর্বাধিকারী, জগদীশ মিত্র এবং ক্যাপ্টেন কিং স্বয়ং। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসে আটকে পড়া রোগীরা।

যুদ্ধশেষে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য লন্ডনের Hampton Court-এ সম্রাট পঞ্চম-জর্জ বীর সৈনিকদের 'সোর্ড অব অনার' পদকে সম্মানিত করেন। রণদা প্রসাদ সাহা এই সম্মানে সম্মানিত হন।

রণদা বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁর কাজকর্ম, বীরত্ব, সাহস, পরোপকারিতা ইত্যাদি মানবিক গুণের জন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি বন্দি অবস্থাতেও অন্যদের উপকার বা সাহায্যের জন্য সবসময়ই সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর এইসব গুণে মুগ্ধ হয়ে মেসোপটেমিয়ার উচ্চ সামরিক কর্মচারীরা বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের ডা. এস পি সর্বাধিকারীকে জানায়, 'বাংলায় যদি রণদা প্রসাদের ন্যায় আরও বীর যুবক থাকেন, তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে ও সাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব।'

রণদা প্রসাদ সাহা ১৯১৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩ টায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। এদিন রাতেই তিনি নবগঠিত বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের যুদ্ধফেরত ৭ জন সৈনিকের মধ্যে ৩ জন বাঙালি পল্টনে যোগ দেয়। রণদা প্রসাদ ল্যান্স নায়েক পদোন্নতি পেয়ে যোগ দেন।

রণদা প্রসাদ নতুন করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাঙালি পল্টনের সাথে ট্রেনিং নেয়ার জন্য নওশেরায় যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। কবির সঙ্গে রণদা'র সখ্য গড়ে উঠেছিল সহজেই। সৈনিক জীবনের শিক্ষা যে তাঁদের দুজনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করতে, দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করতে, সর্বোপরি জীবনকে চিনে নেবার প্রস্তুতিকে পূর্ণতা দান করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সৈনিকজীবন যেমন নজরুলকে বাংলার প্রাদেশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনি সৈনিকজীবনের শৃঙ্খলাবোধ ও সংঘবদ্ধ সমবায়ী জীবনযাপন রণদা প্রসাদ সাহাকে পূর্ণ দায়িত্ববান যুবকে পরিণত করেছিল। সামরিক শিক্ষার পাশাপাশি আরো যে বিষয়াদি তিনি তাঁর ভেতরে ধারণ করেছিলেন তার প্রতিফলন বাস্তবজীবনে আমরা তাঁর নেতৃত্বে দেখতে পাই– দেখি অদ্ভুত দেশাত্মবোধ। পরবর্তী কালে রণদা প্রসাদ যখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তৈরি করেছেন তাঁর স্বপ্নসৌধ হাসপাতাল, তখন কবির অসুস্থতার খবর পান। তিনি সেখান থেকে কবিকে এনে চিকিৎসা করাতে চান। কিন্তু নানা কারণে ভারত থেকে কবিকে এনে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রাণ কাঁদত অসুস্থ কবির জন্য। কবির দুই ছেলে বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে এলে দেখা করতেন রণদা প্রসাদের সঙ্গে। আর্থিক সহায়তা ছাড়াও তিনি তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ-ফেরত সকল ভারতীয়কে যোগ্যতা অনুসারে ইংরেজ সরকার কোনো না কোনো সরকারি চাকরির সুযোগ দেয়। রণদা প্রসাদের লেখাপড়া সামান্য হলেও তিনি যুদ্ধফেরত হিসেবে রেলের টিকিট কালেক্টরের চাকরি পান। চাকরিটি বেশিদিন থাকেনি। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ায় ১৯৩২ সালে তাঁকে এই চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পান। ইট-কাঠ পাথরের শহর কলকাতায় তখন যোগ হয়েছে আরও একটি বস্তু– কয়লা। ক্ষতিপূরণের সামান্য অর্থকে পুঁজি করে শুরু করলেন কয়লার ব্যবসা। প্রথমে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ। তারপর বড় সাপ্লাই। ধনাঢ্য রণদা প্রসাদের আত্মপ্রকাশের সূচনা ঘটে এভাবেই। কিন্তু রণদা প্রসাদের সৈনিকজীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল যা ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক সেনাবাহিনীতে বাঙালি জাতির প্রথম প্রজন্ম রণদা প্রসাদ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের মাহবুব উল আলম (পরে সাহিত্যিক), কুষ্টিয়ার শম্ভু রায়, শ্রী মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এ সময় বাঙালির কোনো সামরিক ঐতিহ্য ছিল না। এঁরাই এই ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেন অথচ বিষয়টি সে ভাবে ইতিহাসে আসেনি বা

গবেষণাও হয়নি। বাঙালির সামরিক গৌরব অনুল্লিখিতই রয়ে গেছে। রণদার সাহসিকতার গল্প আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে অন্তত চারটি বইয়ে রণদাকে নিয়ে পৃথক অধ্যায় লেখা হয়েছিল।

রণদা প্রসাদের চরিত্রে ছিল এক আশ্চর্য গুণ। যেসব ব্যবসায় অন্যরা ব্যর্থ হয়ে নামমাত্র মূল্যে বেচে দিত, সেগুলো তিনি কিনে নিতেন এবং দক্ষতার সাথে সেগুলোকে সফল করে তুলতেন। ব্যবসায়ী গোত্রের সন্তান বলেই সম্ভবত তিনি যে কোনো ব্যবসার প্রধান সাংগঠনিক সমস্যাগুলো বুঝতে ও দ্রুত সমাধান করতে পারতেন।

কয়লা-ব্যবসার সূত্রে রণদা প্রসাদ সাহা একদিন লক্ষ করলেন যে তাঁর খরিদ্দার, যিনি একজন লঞ্চের মালিক, কিছুদিন থেকে কয়লার দাম পরিশোধ করতে পারছেন না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে তাঁর ব্যবসা ভালো চলছে না এবং তিনি লঞ্চ বিক্রির জন্য খদ্দের খুঁজছেন। নিজের বাকি টাকা আদায় এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে একটি লঞ্চ কিনতে পারা– এই দুয়ের সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি নিজেই সেই লঞ্চটি কেনার প্রস্তাব দেন। এই লঞ্চ দিয়েই রণদা প্রসাদের নৌযান-ব্যবসার শুরু।

কিছুদিন রণদা প্রসাদ দেখলেন যে লঞ্চ খারাপ হলে মেরামতের জন্য প্রায়ই ডকইয়ার্ডে প্রচুর অর্থ গচ্চা দিতে হয়। একাধিক লঞ্চ থাকলে খরচ আরো বাড়ে। ডকইয়ার্ড থাকলে নিজের খরচও কমে, অন্যদের কাজও করা যায়। এভাবেই তাঁর ডকইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা। কয়লা থেকে লঞ্চ এরপর ডকইয়ার্ড। এইসব ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর ছিল না। তাই তিনি কয়েকজন বিত্তশালী বাঙালি মহাজনকে শরিক করে যৌথভাবে নদীপথে মালামাল বহনের জন্য, 'বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি' গড়ে তুললেন।

বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর একসময় খুব চড়া ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন হলে অন্যান্য শরিক তা পছন্দ করলেন না। বলা বাহুল্য, রণদা প্রসাদ নিজ পরিশ্রমে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা, সেখানে স্বভাবতই প্রয়োজনবোধে বুদ্ধি খাটাবার সুযোগ আর ঝুঁকি নেয়ার সাহস ও ইচ্ছে তাঁর ছিল। তাই অন্যান্য অংশীদারদের টাকা শোধ করে দিয়ে তিনি নিজেই কোম্পানির মালিক হন। এই কোম্পানিই তাঁকে নৌপরিবহন ব্যবসার একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর রণদা প্রসাদ বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশে চলে আসেন। ফলে ব্যবসাটি দুভাগ হয়ে যায়। ভারত বিভাগের আগে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের যে অংশটি ভারতে ছিল, তার আয়ে পরিচালিত হতে থাকে কলকাতা, কলিমপং ও মধুপুরের কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

১৯৪০ সালের দিকে রণদা প্রসাদ নারায়ণগঞ্জে ডেভিড এন্ড কোম্পানি পরিচালিত জর্জ এন্ডার্সনের যাবতীয় পাটের ব্যবসা, গুদাম, বেইল প্রেসিং ইত্যাদি ক্রয়

করেন। এভাবেই তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান। এই ব্যবসা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি বীমাকৃত করেন।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় রণদা প্রসাদ দুস্থ মানবতার পাশে এসে দাঁড়ান। এ সময় সারা বাংলার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল ক্ষুধাতুর মানুষের হাহাকারে। এ ছিল মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। একমুঠো অন্নের জন্য তখন মানুষের অদেয় কিছুই ছিল না। নিরন্ন মানুষের মুখে একমুঠো খাবার তুলে দেবার জন্য রণদা প্রসাদ দেশের নানা জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন। দুর্ভিক্ষের ৪ মাস ধরে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানসহ কলকাতার আশেপাশে তিনি আড়াই শতাধিক লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

রণদা প্রসাদ ব্যবসার এক পর্যায়ে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কল্যাণধর্মী কাজের স্বার্থে একটি ট্রাস্টভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন– এর নাম দেন 'কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল।' ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ থেকে ট্রাস্ট তাঁর সকল ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং কল্যাণ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, প্রয়োজনে সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

এক সময় রাশিয়ার মেনশেভিকরা মনে করতেন মানুষের শ্রেণিচেতনা জন্মগত। অর্থাৎ যার জন্ম যে শ্রেণিতে তার ভাবাদর্শও সেই শ্রেণিরই। কিন্তু লেনিন প্রথম এই ধারণা পালটে দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, কোনো ব্যক্তিই কোনো বিশেষ শ্রেণির ভাবধারা বা আদর্শের লেবাস নিয়ে জন্মায় না। জীবনের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তার শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠে।

রণদা প্রসাদ সাহার উল্লেখ করার মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। জীবনের পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা লাভ। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখার পাঠ তিনি পেয়েছিলেন স্বদেশীদের সঙ্গলাভ করে। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়েছিলেন মানবিক সাম্যের পাঠ। রণদা প্রসাদ বলতেন, "মানুষের দুটো জাত– নারী ও পুরুষ। আর ধর্ম একটাই– মানবধর্ম। আমি মানুষ–এটাই আমার বড় পরিচয়। মানুষ হতে চেষ্টা করো– এটাই হবে তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।"

রণদা প্রসাদ ছিলেন সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত। জীবন-আহৃত জ্ঞানই প্রয়োগ করেছিলনে কর্মক্ষেত্রে। তিনি বিশ্বাস করতেন কর্মসাধনাই আসল ধর্ম। মুক্তির জন্য ধ্যানের বদলে কর্মযোগের সাধনাই ছিল তাঁর পাথেয়। এ থেকেই গৃহী-সন্নাসী হয়ে থাকার মতো একটি জীবনকাঠামো গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। পরিবার-পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও রণদা প্রসাদ দেশের দুর্দশাপীড়িত মানুষের জন্য দান করে গেছেন তাঁর কষ্টার্জিত সম্পদের গোটাটাই।

রণদা প্রসাদের চিন্তা-চেতনায় গতির প্রচণ্ড আবেগ লক্ষণীয়। গতানুগতিক ভাবধারা পালটে দিয়ে সংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য কর্মস্থল হিসেবে তিনি বেছে

নিয়েছিলেন শহর থেকে বহুদূরে এক গণ্ডগ্রাম জন্মভূমিকে। বিশ শতকের শুরুতে গ্রামটি ছিল জলাজঙ্গলে ভরা আর অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ঘেরা কিছু বসতবাড়ি। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ৬৭ কিলোমিটার দূরে হলেও একমুখী স্রোতের লৌহজং (আদিনাম খাগজানি) নদীটিই ছিল যাতায়াতের প্রধান পথ। মাথায় নানা সাংগঠনিক ভাবনা নিয়ে আত্ম-পর ভুলে কাজ করতে শুরু করলেন তখন গ্রামের লোকেরা এককালের বখে-যাওয়া, ঘরছাড়া সেই ছেলেটির জাত-বেজাতে খাওয়া-দাওয়া, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো রণদাকে আদৌ মেনে নিতে পারছিলেন না। রণদার জাত গেছে– তাদের এই সিদ্ধান্ত। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া রণদাকে সমাজে গ্রহণ করা হবে না। প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যি তাঁকে করতে হয়নি। সে সময়ে সতীশ চন্দ্র পোদ্দার ছিলেন গ্রামের প্রভাবশালী তালুকদার, রণদা প্রসাদের আত্মীয়– ভাই। পাকা জহুরি লোকটি। চিনেছিলেন রত্ন, বুঝেছিলেন এই রণদাই একদিন গ্রামের নাম রাখবে। পরবর্তীকালে রণদা প্রসাদের চেষ্টায় গ্রামের নামই শুধু রক্ষা হয়নি লোকের মুখে মুখে দেশে-বিদেশে এর খ্যাতি ছড়িয়েছে। উদারপন্থী সতীশচন্দ্র নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

সতীশচন্দ্র পোদ্দারের উদ্যোগেই রণদা প্রসাদ বিয়ে করেন বালিয়াটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের কন্যা কিরণবালা দেবীকে। এ বিবাহ অনুষ্ঠানে গ্রামের সকলেই যথাযোগ্য মর্যাদায় আপ্যায়িত হলেন, সমাজপতিরা প্রচুর দান-দক্ষিণা পেলেন। সে সব গ্রহণ করতে কাউকে কুণ্ঠিত দেখা যায়নি। এরপর জাতপাত নিয়ে কোনো অবান্তর সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি রণদা প্রসাদকে, বরং সমাদর বেড়েছে উত্তরোত্তর। কিরণবালা দেবী ছিলেন রণদাপ্রসাদের সুযোগ্য সহধর্মিণী। রণদা প্রসাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনে এই মহীয়সী নারীর অবদান অসামান্য। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীলা ও স্নেহময়ী। তিনি ছিলেন তাঁর সুখ-দুঃখের চিরসাথী।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় হিন্দু নারীসমাজ সহমরণের চিতা ও বৈধব্যের আগুন থেকে রক্ষা পেলেও সতীনের সাথে ঘর করতে কোনো আত্মগ্লানি খুঁজে পেত না। অমানুষ, লম্পট স্বামীর চরণামৃত পান করার মধ্যে নিজেদের সৌভাগ্য দেখত। নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষায় আধুনিক চিকিৎসার বদলে ঝাড়ফুঁক, জলপড়া আর মাদুলির বোঝাকেই যথেষ্ট ভাবত। এই কুসংস্কার আর অশিক্ষার নিরেট দেয়ালে আঘাত করেছিলেন রণদা প্রসাদ। এজন্য কিছুটা পাশ্চাত্য ভাবধারায় গড়েছিলেন আবাসিক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান– ভারতেশ্বরী হোমস, প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নাম অনুসারে। শিক্ষা প্রসারের জন্য এ ছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী মহিলা মহাবিদ্যালয়। বিদ্যোৎসাহী রণদা প্রসাদ সাহার দান ছড়িয়ে আছে এদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মির্জাপুর এস. কে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, করটিয়া সাদত কলেজ, ভুঁঞাপুর কলেজ, চৌমুহনী কলেজে তিনি মুক্ত হস্তে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গারোধে আত্মাহুতি দাতা আলতাফ হোসেনের নামানুসারে গঠিত বরিশাল শহরের 'আলতাফ মেমোরিয়াল স্কুল' রণদা প্রসাদের অর্থানুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

রণদা প্রসাদ সাধারণ মানুষের জন্য একটি আধুনিক দাতব্য হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন দেখতেন। এ স্বপ্নের মূলে ছিল শৈশবে দেখা প্রায় বিনা-চিকিৎসায় মায়ের মৃত্যুদৃশ্য এবং সেই দুঃখস্মৃতির লালন– বিপুল বিত্তশালী হবার পরও সেকথা ভুলে যাননি রণদা প্রসাদ।

১৯৪৩ সালে শুরু হল কাজ। ঠাকুরমা শোভা সুন্দরী দেবীর নামে ডিসপেনসারি ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু হল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের কারণে নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিসহ অন্যান্য অসুবিধাও দেখা দিল। ফলে ভারতেশ্বরী হোমস ও কুমুদিনী হাসপাতালের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণে বাধার সৃষ্টি হয়। তবুও তিনি কাজ চালিয়ে যান শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও। ১৯৪৪ সালের ২৭ জুলাই বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড আর জি কেসি ২০ শয্যার এই হাসপাতালের শুভ-উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণে সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশে বলেন : "You are no doubt aware that the opening ceremony of the Kumudini Hospital is the main object of my visit. Some of you may wonder why I should take such close personal interest in a hospital which happens to be situated in a part of Bangal never before visited by a Governor of the province. My answer to this is simple. I have come here today because I feel that this hospital affords a high example of what can be done when the initiative enterprise and public spirit of one man are directed towards the welfare and the well being of the community."

যে হাসপাতালটি শুরু হয়েছিল মাত্র কুড়ি শয্যা নিয়ে, সেটি রণদা প্রসাদ উন্নীত করেন সাতশো পঞ্চাশ শয্যাসংখ্যায়। কুমুদিনী হাসপাতালের পাশাপাশি একটি মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হবার আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বেসরকারি উদ্যোগে নিঃসন্দেহে কুমুদিনী হাসপাতাল বাংলাদেশের অন্যতম বড় হাসপাতাল। কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর দেশের দূর-দূরান্ত থেকে গরিব রোগীরা জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য এখানে এসে উপকৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এই রোগীদের থাকা-খাওয়াসহ সুচিকিৎসার যাবতীয় খরচ কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বহন করে।

হাসপাতালের সূচনালগ্ন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের অভাব ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য রণদা প্রসাদ বেছে নিয়েছিলেন স্থানীয় গ্রামের দরিদ্র, বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্ত মহিলাদের। এভাবেই পুনর্বাসিত হয়েছিল গ্রামের দুস্থ ও অসহায় মেয়েদের একাংশ। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন রণদা প্রসাদ নিজেই। বর্তমানে এখানে নার্সিং স্কুল ও কলেজ হয়েছে। কুমুদিনী হাসপাতাল এদেশে চিকিৎসাক্ষেত্রে যোগ করেছে একটি নতুন মাত্রা। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি নিয়ে আসতেন খ্যাতনামা

চিকিৎসকদের। ১৯৭০ সালে হাসপাতালে টিবি-ওয়ার্ড যুক্ত হয়। এদেশে যক্ষ্মারোগের ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও তৎকালে ঢাকা শহর ছাড়া আর কোথাও এই রোগের কোনো চিকিৎসালয় ছিল না। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় কুমুদিনী হাসপাতালের খ্যাতি ছিল সারা বাংলায়। 'যার হয় যক্ষ্মা– তার নাই রক্ষা'– এই বিশ্বাসে আগেকার মানুষ যক্ষ্মারোগীকে অস্পৃশ্য করে রাখত। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে মর্মান্তিক মৃত্যু ছিল এদের নিয়তি। রণদা প্রসাদ এসে দাঁড়ালেন এই অসহায়দের পাশে। তিনি চালু করলেন এক অভিনব ওয়ার্ড। মারাত্মক সংক্রামক বিধায় সাধারণ ওয়ার্ড থেকে দূরে নিয়ে তিনি রোগীদের রাখার ব্যবস্থা করলেন নৌকায়– কুমুদিনী হাসপাতালের লাগোয়া লৌহজং নদীতে আচ্ছাদিত নৌকায়– ভাসমান ওয়ার্ড। সুচিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা। রণদা প্রসাদ সকাল-বিকাল তাদের দেখতে যেতেন। আলাদা ওয়ার্ড না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু ছিল।

রণদা প্রসাদ সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। প্রচুর বিত্তশালী হয়েও এড়িয়ে চলতেন সকল বিলাসিতা। মানুষের কাছাকাছি থেকে মানুষকে ভালোবাসাই ছিল তাঁর আদর্শ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন মানুষের সঙ্গে– দেশের সঙ্গে একাত্ম। তিনি প্রচলিত ধারার কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষ ও দেশের কল্যাণ।

রণদা প্রসাদ সাহাকে 'দানবীর' বলা হলেও তাঁর সম্পর্কে শব্দটি তিনি পছন্দ করতেন না। মানুষ হয়ে মানুষকে দান করার বিষয়টি তাঁর মনে কোনোদিন স্থান পায়নি। মানুষের সেবা করা কর্তব্য বলে মনে করতেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই রণদা প্রসাদের জীবনে এক নতুন দর্শন লাভ ঘটে। তিনি তাঁর সৈনিক-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন নিয়মানুবর্তিতা ও পরিকল্পিত জীবন সার্বিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, শৃঙ্খলাবোধ জাতীয় জীবনেও প্রয়োজন। তিনি বলতেন, 'আমার গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানগুলোই আমার তীর্থস্থান।'

দেশের প্রতি রণদা প্রসাদের ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা। ছেলে-মেয়েদের ভিতরেও তিনি সেই দেশাত্মবোধ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ইংল্যান্ডে বসবাসরত কন্যা জয়াপতি স্বল্পকালের জন্য অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসেন দেশে ১৯৭০ সালে। এ সময়ে বাবা রণদা প্রসাদ তাঁকে নিজদেশে থেকে দেশের সেবা করবার উপদেশ দেন। তিনি আর ফিরে যাননি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নিখোঁজ বাবা ও একমাত্র ভাইয়ের শোক বুকে নিয়েও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ২০০০ সালে জয়াপতি অবসরে যান।

রণদা প্রসাদের স্বপ্নের সৌধ কুমুদিনী কমপ্লেক্সের ইমারত স্থাপত্য নির্মাণরীতি সংশ্লেষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কুমুদিনী হল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের একটি প্রতীক। তিনি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের সর্বকালের ইতিহাসে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন কুমুদিনীর স্থাপত্যকলায়। হাসপাতালের সুউচ্চ খিলান ও বহুমাত্রিক বিন্যাসের ভিত্তিতে গড়া গম্বুজ রথচক্রের গতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কুমুদিনীর সেই রথযাত্রা আজও চলছে। চলবে অনন্তকাল। এই রথযাত্রীদের রসদের ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন। আলোকিত রথটি আজও চলছে জনতার মাঝে, শুধু নেই রথচালক রণদা প্রসাদ সাহা।

রণদা প্রসাদ সাহা জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাইলে যেতে পারতেন ১৯৪৭ সালে, দেশভাগের পরই। সেখানে তাঁর সম্মান কিছু কম জুটত না। কিন্তু তিনি থেকে গেলেন মাটি কামড়ে দেশের মানুষের সঙ্গে। ৭১-এর সেই ভয়াল দিনগুলোয় কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী মহিলা মহাবিদ্যালয়, দেবেন্দ্র কলেজ সর্বোপরি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রিয়জনদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে দেশত্যাগ তাঁর পক্ষে অকল্পনীয় ছিল।

জীবনকে বাজি রেখে এমনি এক কঠিন পরিস্থিতিতে রণদা প্রসাদ হানাদার বাহিনীর নজর এড়িয়ে সাহায্য করেছিলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। সাধারণ রোগীর ছদ্মবেশে আহত মুক্তিযোদ্ধারা আসত কুমুদিনী হাসপাতালে, পেত চিকিৎসা, ওষুধ, পথ্য, অর্থ। গোপন বিষয়টি আর গোপন থাকেনি। রাজাকার আল বদরদের চেষ্টায় একদিন ফাঁস হয়ে গেল সবই। যারা একদিন কুমুদিনী হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছিল, পেয়েছিল নতুন জীবন, সে সময় তারাই রণদা প্রসাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

৭১-এর ২৯ এপ্রিল পুত্রসহ রণদা প্রসাদ সাহাকে হানাদার বাহিনী আটক করে। ৫ মে তাঁরা ছাড়া পান। তাঁরা ভাবলেন বিপদ কেটে গেছে। রণদা প্রসাদ তখনো এতটুকু ভয় পাননি, কোথাও লুকিয়ে জীবন রক্ষার কথা একবারও ভাবেননি। ৭ মে নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী কমপ্লেক্স থেকে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা রাত ১১.৩০ মিনিটে রণদা প্রসাদ ও পুত্র ভবানী প্রসাদ রবিকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁদের আর কোনো খোঁজ মেলেনি।

রণদা প্রসাদ সাহা যখন একমাত্র পুত্রসহ নিখোঁজ হন তখন তাঁর বয়স ৭৪ আর ভবানী প্রসাদ রবি ২৭ বছর। তিনি তখন ৩ বছর বয়সের এক পুত্রসন্তানের জনক।

ক্ষণজন্মা পুরুষ রণদা প্রসাদ সাহা একটি বিশ্বাসের নাম, একটি কীর্তির নাম, একটি গৌরবের নাম। প্রচুর সামাজিক সম্মান, খ্যাতি, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজনদের প্রেম ভালোবাসায় রণদা প্রসাদের জীবন ছিল পরিপূর্ণ। তিনি আজ নেই। কিন্তু মানবকল্যাণে নিবেদিত তাঁর সত্তা মৃত্যুহীন।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

আ বু ল বা র কা ত

প্রাক্‌কথন

রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) নতুন কোনো বিষয় নয়। ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্র রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসেবেই অভিহিত হত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের এক পর্যায়ে বিশেষত গত শতকের ৩০-এর দশকের শুরুর দিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার (Great Depression, ১৯২৯-১৯৩৩) সমসাময়িককাল থেকেই রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের নামকরণ থেকে রাজনীতি শব্দটি বাদ দেয়া হয়। আবার সময় কালটা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের শুরুর কাল। অর্থাৎ অর্থনীতি শাস্ত্রের নামকরণ পরিবর্তনের পিছনেও রাজনীতি কাজ করেছে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি চিরায়ত অর্থে উৎপাদন সম্পর্কের (production relation) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র।[১] যেখানে মূল কথা হল নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাবে। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোনো অনড় (static অর্থে) বিষয় নয় তা পরিবর্তনশীল (dynamic অর্থে)।

আমরা সাধারণভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সরকার, রাষ্ট্র সব নিয়েই কথা বলি। এসবের অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, আছে রাজনৈতিক সারবত্তা। আর সে কারণেই আমার মতে এমন কোনো বিষয়ই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মবস্তু নেই– কারণ-পরিণাম যেদিক দিয়েই দেখি-না কেন। এসব বিবেচনা থেকেই আজকের লোকবক্তৃতায় আমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোগত বিষয়াদির হাজারো বিষয় থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় আন্তঃসম্পর্কিত শুধু সে বিষয়গুলোই বেছে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি যার সংশ্লেষণের

ফলে যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সমগ্রক (holistic) চিত্র বের করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়। এ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আমার বেছে নেয়া বিষয়গুলো নিম্নরূপ: দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা, দুর্বৃত্তায়ন, একচেটিয়া বাজার, বাজারসন্ত্রাস ও মূল্য সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, মৌলবাদের অর্থনীতি, সুশাসন, আর বিশ্বায়ন-এর পাশাপাশি ধনী দেশের অর্থনীতি ও সমাজে অসাম্য-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ-পরিণাম। ধনী দেশের (এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বিষয়টি যুক্ত করেছি দু'টি কারণে, প্রথমত প্রায়শই মনে করা হয় যে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-অপশাসন– এসব শুধু আমাদের মতো *উন্নয়নশীল-অনুন্নত-স্বল্পোন্নত-দরিদ্র* দেশেই ঘটে থাকে। দ্বিতীয়ত অসাম্য-বৈষম্য বিষয়ে উন্নত দেশের উদাহরণ টেনেছি উপরোল্লিখিত প্রথম ধারণার অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি প্রমাণ করার লক্ষ্যে; বলার চেষ্টা করেছি যে ব্যাপক প্রচলিত এসব ধারণা আসলে অলীক বা কল্পকথা মাত্র (myth অর্থে)।

দুই.

'দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা'-র শেকড়ে Rent Seeking: বিষয়টি আসলে কী?

যেহেতু দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির শেকড়ে আছে rent seeking সেহেতু আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই rent seeking প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটির (category অর্থে) মমার্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলে রাখি এ প্রবন্ধে 'rent seeking' এবং 'rent seeker'-এর বাংলা অনুবাদ করা হয়নি এবং তা সচেতনভাবেই। 'Rent seeking'-এর মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি। Rent seeking বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এরকম। বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে rent seeking -এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হল সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হল এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু

নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কী হয়ে গেল! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

Rent seeking -এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (যাকে অর্থনীতিবিদেরা বলেন invisible hand of market) অন্য সকলের জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ -এর বিশ্বমহামন্দা আর ২০০৭-০৮ -এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাততত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য।[২] আগেই বলেছি rent seeking বিষয়টি এমনকি 'zero sum game'ও নয় যখন একজন ব্যক্তির লাভ বা প্রাপ্তি (gain) অন্য আর এক জনের ক্ষতির (loss) সমান হয়। আসলে rent seeking হল negative sum game যেখানে বিজয়ীর লাভ বা প্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির চেয়ে কম। আর এ প্রক্রিয়ায় সমাজের ক্ষতির হিসাব কষলে– ব্যাপারটি আরো বেশি সত্য। সেইসাথে এটা 'negative sum game' এজন্যও যে গরিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ পৌঁছে দেবার এ প্রক্রিয়ায় সরকার ও রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট সম্পদ ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ অর্থনীতির rent seeking আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিত্ত-সম্পদ নিচতলার অন্য সবার কাছ থেকে উঁচুতলার ধনীদের কাছে পৌঁছে যায়। Rent seeking -এর রূপ হতে পারে অনেক ধরনের। যেমন, অদৃশ্য হস্তান্তর (hidden transfer), দৃশ্যমান হস্তান্তর (open transfer), সরকারি ভর্তুকি, নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান যা বাজারের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা হ্রাস করে অথবা বাজারকে প্রতিযোগিতাহীন করে, বাজার-প্রতিযোগিতার বিদ্যমান আইন-কানুন-বিধি-বিধান কার্যকর হতে না দিয়ে বা প্রয়োগে বাধা দিয়ে (non enforcement), বিধি-বিধান-স্টাটিউট যা ব্যবসা-বাণিজ্য-কর্পোরেশনসমূহকে অন্যের জন্য প্রদেয় সুবিধে হস্তগত করতে সহায়তা করে অথবা অনেক কিছুর ব্যয়ভারের দায়ভার সমাজের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। আর এ প্রক্রিয়ায় rent seeker -দের সহায়তা করে সরকার ও রাজনীতি। যেসব ক্ষেত্রে বিত্তবান অথবা সম্পদশালী হবার প্রক্রিয়ায় সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে rent seeking পদ্ধতি জোরতালে চলে সেক্ষেত্রে সরকার ও রাজনীতি rent seeker-দের অধীনস্থ অথবা বলা যায় rent seeker গোষ্ঠীর কথায় ওঠাবসা করে। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সমাজের নিচতলার মানুষের সম্পদসহ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের উঁচুতলার গুটিকয়েক মানুষের হাতে তুলে দিয়ে সমাজে বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়, তেমনি ওই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা অর্থনীতি ও সমাজে অস্থিতিশীলতা বাড়ায়, আর বর্ধমান এ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়ায়। Rent seeking প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত এ এক দুষ্টচক্র (vicious cycle)।

যেহেতু দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম rent seeking সেহেতু rent seeking-এর ইতিবৃত্ত নিয়ে আরো একটু বলা দরকার। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রে rent seeking বলতে ভূমি খাজনা (agricultural/land rent) বা ভূমি থেকে প্রাপ্তি (returns to land) বুঝানো হত। অর্থাৎ জমির মালিক ভূ-স্বামী (যেমন ব্রিটেনে Lord, Barron, Knight ইত্যাদি) জমিতে নিজে কোনো শ্রম না দিয়েই শুধুমাত্র জমির মালিক হবার কারণেই অন্যের শ্রমে (কৃষকের) সৃষ্ট উৎপাদনের ভাগ পেতেন– এটাই ভূমি খাজনা। পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে যে একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profit)-র প্রত্যয়টি (terminology অর্থে) দেখি তা আসলে ওই ভূমি খাজনা বা rent-এরই সম্প্রসারিত রূপ, যাকে বলা হয় একচেটিয়া খাজনা বা monopoly rent, যার সারার্থ হল ওই আয় যা একজন একচেটিয়াভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য কর্মকা- নিয়ন্ত্রণের (control অর্থে) ফলে পেয়ে থাকেন। আরো পরে rent প্রত্যয়টি সম্প্রসারিত হল মালিকানা দাবির অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যেমন সরকার যদি কোনো কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণের কোনো পণ্য আমদানির একচ্ছত্র অনুমতি বা অধিকার দেয় (যাকে বলে 'কোটা') যেমন চিনি, ভোজ্য তেল, চাল, ডাল, পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওই অনুমতি বা অধিকার-উদ্ভূত মালিকানা থেকে অতিরিক্ত প্রাপ্তি (extra return)-টিই হল 'কোটা খাজনা' (quota-rent)। উল্লেখ্য, প্রায়শই দেখা যায় যে যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যতবেশি সেসব দেশে rent seeking কর্মকা- ততবেশি প্রকট।

অনেকেই মনে করেন একটি দেশে সম্পদ বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি থাকবে ততবেশি দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের উপকার হবে, ততবেশি দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারের ব্যয় করার সক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত সত্যটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

এ কথা সত্য যে মানুষের শ্রম ও সঞ্চয়ের উপর বেশি কর বসালে কর্মপ্রণোদনা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু বিপরীতে একথা ধ্রুব সত্য যে ভূমি, জ্বালানি তেল (পেট্রোল, গ্যাস, ডিজেল ইত্যাদি), খনিজদ্রব্য (যেমন কয়লা) অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট rent এর উপর কর বসালে এসব সম্পদ অদৃশ্য (disappear) হয়ে যাবে না। উল্টো ওইসব সম্পদ থেকেই যাবে এবং আজ না হোক পরে– ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করা যাবে। এবং এক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রণোদনা প্রভাব (adverse incentive effects)-এর প্রশ্ন অবান্তর। অর্থাৎ, এসব কারণে নীতিগতভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মানব উন্নয়ন খাতে অর্থায়নের জন্য সরকারের রাজস্ব আয়ের কমতি হবার যৌক্তিক কারণ নেই। তারপরেও আমরা দেখছি সেসব দেশেই বৈষম্য-অসমতা বেশি যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি। তবে এসব দেশের মধ্যে তাদের অবস্থা বেশি খারাপ যেখানে rent seeker-গোষ্ঠী রাজনীতি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাসঙ্গিক বিধায় উল্লেখ্য যে ল্যাতিন আমেরিকার সবচে' বেশি তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ ভেনিজুয়েলায় হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার আগে দেশের অর্ধেক মানুষই ছিলেন দরিদ্র– এবং এটা ধনবান দেশে সেই প্রকৃতির দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেখানে হুগো শ্যাভেজের মতো জনকল্যাণকামী নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে।

Rent seeking-এর আরো কয়েকটি রূপের কথা বলা প্রয়োজন। যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ) যখন ন্যায্য-বাজার মূল্যের (fair price) চেয়ে কমদামে কারো হাতে চলে যায়। আরো একটা রূপ হল যখন ওরাই অথবা অন্য কেউ বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে তা সরকারের কাছে বিক্রি করে (যাকে বলে non competitive procurement)। ওষুধ কোম্পানি ও মিলিটারি কন্ট্রাকটররা এসবে যথেষ্ট পটু। এসবের পাশাপাশি rent seeking-এর অন্যান্য ক্ষেত্রের অন্যতম হল বিভিন্ন ধরনের সরকারি ভর্তুকি (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য) যখন এর বড় অংশ হাতড়ে নেয় rent seeker-রা। Rent seeker-রা যে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে সবসময় সরকারকেই ব্যবহার করে তা-ও নয়। যেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পদ হাতিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি, পুঁজিবাজার ইত্যাদি) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা এবং পূর্ণাঙ্গ সত্য তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে তাদের শোষণ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাবক হিসেবে সরকারের ভূমিকা থাকে– সরকারের যা করার কথা তা না করে, অবৈধ কর্মকা- প্রশ্রয় দিয়ে অথবা তা বন্ধ না করে, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নসহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে।

ইদানীং rent seeker -এর অবাধ চারণক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি (বিশ্বের সবচে ধনীদের মধ্যে মেকিক্সোর কার্লোস স্লিম থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ভিওআইপি ব্যবসা), খনিজসম্পদ (ইদানীং রাশিয়ার খনিজসম্পদ কব্জাকারী অলিগার্খি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (corporate CEOs), স্বাস্থ্যসেবা খাত, তথ্য-প্রযুক্তি খাত (মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে অনেকেই), উচ্চ পর্যায়ের আইনজীবী যারা জটিল ও অস্বচ্ছ derivative· market ডিজাইনে সহায়তা করেন এবং যারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়েই মনোপলি ক্ষমতা ব্যবহারের চুক্তিপত্র তৈরি করে দেন– আর এসব করে তারা কিন্তু কখনও জেল-হাজতে যান না।

Rent seeking-এর সাথে রাজনীতির সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ। নিয়ম মেনে খেলা অর্থাৎ 'Fair game' -এ জেতা এক কথা আর ওই খেলার নিয়ম-কানুন এমনভাবে বানানো যার ফলে সুনির্দিষ্ট কোনো পক্ষের জেতার সম্ভাবনা বাড়ে সেটা আরেক কথা। আরো মারাত্মক হল সে অবস্থাটি যখন আপনি খেলছেন আবার আপনিই খেলার রেফারি নিয়োগ দিচ্ছেন। বিষয়টি এরকম যে প্রায়শ দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রেগুলেটরি এজেন্সিতে প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তারাই যারা নিজেরাই rent seeker অথবা তাদের চাকরি করেন আবার এজেন্সির কাজ শেষে আবারও rent seeker গোষ্ঠীতে ফিরে যান।[৪] এটা হল 'regulatory capture' (নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দখল)। আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দখল অর্থের শক্তিতে নয় মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণেও ঘটে, যাকে বলে 'cognitive capture' (অভিজ্ঞানগত দখল)। এসব ক্ষেত্রে rent seeker-দের লবিস্টদের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে দুর্ভেদ্য ঐক্যভিত্তিক। Rent seeker-দের সাথে

সরকারের সম্পর্কটিও প্রত্যক্ষ। আগেই বলেছি সরকারি 'granted' হোক আর সরকারি 'sanctioned' হোক বাজার প্রতিযোগিতার আইন-কানুন কার্যকরভাবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন (inadequate enforcement) না হবার কারণে দুনিয়াজুড়ে বিত্তভাগ্য খুলেছে অনেকেরই। যারা প্রায় সবাই rent seeker। কিন্ত rent seeking পদ্ধতিতে ধনী হবার আরো সহজ কিছু পথ-পদ্ধতি আছে। যেমন ধরুন আইনের এমন কিছু পরিবর্তন যা সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু ফাঁক দিয়ে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়। এদেশে এসব প্রায়শই ঘটে (যেমন, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শুল্কহার নির্ধারণ থেকে শুরু করে রাজস্ব আয়ের অনেক ক্ষেত্রে)। এ বিষয়ে আরো কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যেতে পারে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেয়ার ড্রাগ বেনিফিট ২০০৩ আইনে একটি ধারা সংযোজিত হল যেখানে বলা হলো "সরকার ঔষধের মূল্য নিয়ে দরকষাকষি করতে পারবে না"। এর ফলে ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিরা এমনি এমনিই বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি উপহার (gift) পেয়ে গেল[৫]। ঠিক একই ধরনের উপহার পেল আর্থিক derivative market -এর কোম্পানি AIG ২০০৮-০৯ সালে, তবে অর্থের পরিমাণ ১৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার একই সময়ে মন্দা কাটিয়ে উঠতে সরকার শূন্য সুদ হারে কোটি কোটি ডলার দিল ব্যাংকগুলোকে যে ব্যাংকগুলো আবার উচ্চসুদে ওই ডলারই ধার দিল সরকারকে (এ হল কোটি কোটি ডলারের অদৃশ্য উপহার)[৬]। একইভাবে rent seeker-দের জন্য সরকারের প্রভাবকের ভূমিকা স্পষ্ট যখন দেখি 'ethanol subsidy' দেয়া হল, আর ২০০৮ -এর recession -এর পর যখন বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে গেল তখন subsidy দেবার পরে ethanol তৈরির কারখানাগুলো দেউলিয়া হয়ে গেল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিতে ভর্তুকির ক্ষেত্রেও দেখা যায় কৃষিভর্তুকির ডিজাইনটাই এমন যে অর্থের পুনর্বণ্টন এমনভাবে হবে যে দরিদ্র কৃষক এবং পরিবারভিত্তিক কৃষিফার্ম তেমন কিছুই পাবেন না, কৃষি-ভর্তুকির প্রায় পুরোটাই পাবেন ধনী এবং কর্পোরেট কৃষিফার্ম। এসবই rent seeking যা নিচতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উঁচুতলায় পৌঁছে দেয়। Rent seeking-এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা কিছু বললাম সবগুলোই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য তবে পার্থক্যটা হতে পারে মাত্রা, গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ধরনের ক্ষেত্রে। তাহলে যা দাঁড়াল তা হল বাজারব্যবস্থাটাই এমন যা rent seeker সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking অর্থনীতির instability (অস্থিতিশীলতা) বাড়াবে আর ওই অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।

তিন.

দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট

পনেরো কোটি[৭] মানুষের এদেশে "দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা"[৮] যে অতি রূঢ় বাস্তবতা এবং উদ্বেগের বিষয়, তাতে কেউই সম্ভবত দ্বিমত পোষণ করবেন না। অতীতেও এ নিয়ে দ্বিমত ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অদূর ভবিষ্যতেও এ উদ্বেগের নিরসন হবে না। তবে উত্তরণ জরুরি। কারণ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যহীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু তা অর্জিত হয়নি। আর অর্জিত হয়নি দেখেই আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমরা অনেক স্বপ্ন-কল্পের কথা বলছি। এ স্বপ্নের প্রকাশ হিসেবেই 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন এখন জন-আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে যার মর্মবস্তু মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি নাগাদ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার-গণতান্ত্রিক, কল্যাণ রাষ্ট্র"; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে স্বল্প-বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের একটি দেশ; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। ২০২১-এ আমরা থেমে নেই এখন ২০৪১ সালের বাংলাদেশ কেমন চাই– এ নিয়েও ভাবছি। এসব কারণেই আমি এ প্রবন্ধে একদিকে যেমন মানব-কল্যাণমুখী রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি গঠনপ্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট গূঢ় অর্থ উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি আর অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক-অর্থনীতির একীভূত তত্ত্ব (unified theory) বিনির্মাণের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস নিয়েছি।

অর্থনীতি শাস্ত্রের মানুষ হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন— উভয় কারণেই দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিষয়াদির পুনর্মূল্যায়ন জরুরি বলে মনে করি। আমি মনে করি দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা, বিমোচনের শ্লথ গতি, দারিদ্র্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের কার্যকারণ, এবং সেই সাথে আমাদের দারিদ্র্য বিষয়ে অন্যদের (অতি)-আগ্রহ ইত্যাদি কারণে বিষয়টির খোলামেলা, যুক্তিনির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। 'দারিদ্র্য' ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পুনঃউত্থাপন করতে চাই এজন্যও যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'ভাবনার দারিদ্র্য' প্রকট; মূল ধারার গবেষকদের দারিদ্র্য চিন্তায়– চিন্তার দারিদ্র্য প্রকট। দারিদ্র্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দারিদ্র্য প্রতিফলিত হয় একদিকে যেমন বহুমুখী দারিদ্র্য চিহ্নিত করাসহ বহুমুখী দারিদ্র্যের কারণ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে, আর অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পথ-পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও। দারিদ্র্য ভাবনায় কখনও বলা হয় না যে দারিদ্র্য মনুষ্যসৃষ্ট– যেখানে rent seeking-এর উপস্থিতি ও বাড়-বাড়ন্ত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– এসব নিয়ে এ দেশের মানুষের মনে প্রশ্নের শেষ নেই; প্রশ্ন শেষ হবার কোনও শর্তও সৃষ্টি হয়নি। এসব নিয়ে কিছু প্রশ্ন

উত্থাপন করতে চাই। চাই কিছু উদ্বেগ তুলে ধরতে। হতে পারে উদ্বেগ উদ্বেগই থেকে যাবে। সম্ভবত অনেক প্রশ্নের উত্তর এ মুহূর্তে আমরা পাব না। কিছু প্রশ্নে মতানৈক্য থাকবে, সেটাও স্বাভাবিক। নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, তা আশার কথা। এসব বিবেচনা থেকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি বলে মনে করি। আর সেই সাথে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ ও হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু সমাধান-ভাবনাও উপস্থাপন জরুরি বোধ করি। দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়নে আমরা ব্যর্থ হয়েছি– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ নিয়ে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। আমরা দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য দেখি না। এমনকি আমাদের মতো অদরিদ্রদের দারিদ্র্য পরিমাপের প্রয়াসও দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়, মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য ভোগ (পুষ্টিমান যাই হোক-না কেন), তথাকথিত সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত নিরক্ষরতা হ্রাস না পাওয়া (আর শিক্ষার মান যাই হোক-না কেন), প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সৃষ্টি করা (দরিদ্ররা সে সুযোগ গ্রহণ করুক বা না-করুক)— দারিদ্র্য সংজ্ঞায়ন ও পরিমাপনে এসব স্থূলতা অতিক্রমে আমরা অক্ষম হয়েছি। আর এসব কারণেই 'দরিদ্র জন্মসূত্রেই দরিদ্র হতে বাধ্য'— এ ধারণা আমাদের গবেষকদের বোধের দারিদ্র্যই নির্দেশ করে। সে কারণেই দারিদ্র্য দূরীকরণ বা হ্রাসের প্রেসক্রিপশনগুলোও অনুরূপ স্থূল। বিষয়টি শুধু আমাদের মতো 'দরিদ্র' দেশের জন্যই প্রযোজ্য নয় তা অতি উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও প্রযোজ্য (বিষয়টি গুরুত্বের কারণে পরে মানুষে-মানুষে অসাম্য কেন হয় শিরোনামে একটি ভিন্ন অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

'দারিদ্র্য' আমার মতে নেহায়েত এক অর্থনৈতিক প্রত্যয় বা প্রপঞ্চ (category) নয় যা 'আয়' এবং/অথবা 'খাদ্য পরিভোগ' দিয়ে মাপা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– যদি কেউ দৈনিক ৬৭ টাকার কম আয় অথবা ২,১২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য ভোগ করেন তিনিই দরিদ্র, আর তার অবস্থাটা 'দারিদ্র্য'। দারিদ্র্য পরিমাপের এ পদ্ধতি এক অতিস্থূলতা। এ স্থূলতার বিপরীতে আমি মনে করি যা কিছু মানুষের পরিপূর্ণ জীবনপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সে সবই দারিদ্র্যের মানদণ্ড। দারিদ্র্য হল rent seeking-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে কিছু মানুষের অঢেল বিত্তশালী হওয়া আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমসুযোগের অভাব থেকে উদ্ভূত বিত্তহীন হবার এক প্রক্রিয়া। আর বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা থেকেই এর উৎপত্তি। এ বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা প্রধানত অর্থনৈতিক হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। এখানে প্রভাবকের ভূমিকায় আছে রাজনীতি ও সরকার (বিষয়টি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আর পরে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেয়া হয়েছে)।

দারিদ্র্য বহুমুখী; বহু রূপ তার। দারিদ্র্য হতে পারে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-

উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানস-কাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি। আর এসবের সাথে আছে বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা– যা অনেকাংশেই বংশপরম্পরা এবং প্রধানত কাঠামোগত। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দারিদ্র্যের একাধিক রূপ একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। আমি মনে করি দারিদ্র্যকে দেখতে হবে সব ধরনের দারিদ্র্যের (বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ) পরস্পর সম্পর্কিত যৌথ রূপ হিসেবে যেখানে প্রতিটি রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে দারিদ্র্যের নির্দিষ্ট অংশকে প্রতিফলিত করে মাত্র। তবে এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দারিদ্র্যের কোনো এক বা একাধিক রূপ অন্যসব রূপের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। সেই সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হতে হবে যে দারিদ্র্য হতে পারে তুলনামূলক (relative) এবং নিরঙ্কুশ (absolute)। সুতরাং আমার বিশ্বাস 'দারিদ্র্য বিমোচন' বললে আমরা বুঝবো দারিদ্র্যের কোনো কোনো রূপের তুলনামূলক হ্রাস (poverty reduction) আবার কোনো কোনোটির নির্মূল বা উচ্ছেদ (poverty eradication)। বলে রাখা জরুরি যে এক্ষেত্রে 'অসমতার' বিষয়টি সম্ভবত আরো বেশি গুরুত্ববহ।

আমার সারবক্তব্য একবাক্যেও শেষ করা যেতে পারে। আর তা হল: যেহেতু দারিদ্র্য বিষয়টি– বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ– শেষ পর্যন্ত শোষণ সৃষ্টিকারী কাঠামো (structural) উদ্ভূত সেহেতু স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে বর্তমান কাঠামোটি ভেঙে তার জায়গায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় এমন একটি নতুন কাঠামো বসাতে হবে; আর যুক্তিগতভাবেই এ কাজটি হবে দরিদ্র-শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ। এ বক্তব্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের গন্ধ আছে বিধায় অনেকেই বাতিলযোগ্য বিবেচনা করলেও যুক্তি হিসেবে আমার বক্তব্যে ভুল নেই। ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আছে সময়ের নিরিখে, সম্ভাব্যতা বিচারে। সে কারণেই বক্তব্য এককথায় শেষ করা যাচ্ছে না। বক্তব্য এককথায় শেষ করা যাবে না এ জন্যেও যে আমরা সবাই মিলে আপাতত ধরেই নিয়েছি যে সম্ভবত পুঁজিবাদী কাঠামোতেই আমাদের চলতে হবে; ধরেই নিয়েছি যে মাত্রা যাই হোক-না কেন মুক্তবাজার অর্থনীতির আবরণের মধ্যেই দারিদ্র্য হ্রাস/উচ্ছেদ(?)/বিমোচন হতে পারে; ধরেই নিয়েছি যে বৈষম্য-অসমতা-দুর্বৃত্তায়ন জিইয়ে রেখেই 'চুইয়ে পড়া' (trickle down) উপাদান দিয়েই দারিদ্র্য প্রশমিত হবে; ধরেই নিয়েছি যে আমাদের দেশে বাণিজ্যপুঁজি ও ব্যাপক-বিস্তৃত (বিকাশমান) কালো টাকার নিকৃষ্ট পুঁজিকে (গত প্রায় ৪০ বছরে যার পুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে আনুমানিক ৮ লক্ষ কোটি টাকা) যে কোনোভাবে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তর করলেই দারিদ্র্যের অনেক রূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাল্কা হয়ে আসবে আর সেই সাথে হ্রাস পাবে বৈষম্য-অসমতা; ধরেই নিয়েছি যে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বায়ন-এর সুযোগ (!) গ্রহণ করতে পারলেই দারিদ্র্যাবস্থার ব্যাপক উপশম হবে ইত্যাদি। এসব ধরে নেয়ার পিছনের

যুক্তি একেবারেই ঠুনকো; বলা যায় কূটযুক্তি বা অলীক, কল্পকথা (myth অর্থে)। তবে এসব ধরে নেয়ার পিছনের যুক্তি কতটা যুক্তিসিদ্ধ ও বাস্তবসম্মত এ নিয়ে আমি পূর্ণমাত্রায় সন্দিহান। আর সে কারণেই যেখানেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ঐতিহাসিক বিচারে যুক্তির পিছনে বিজ্ঞান নেই সেখানেই আমার ভিন্নধর্মী বক্তব্য-বিশ্লেষণ থাকবে– পরিসর ক্ষুদ্র হলেও।

প্রথমেই আসা যাক দারিদ্র্য বিষয়ে সরকারি ভাষ্যের বিচারে। সরকারি ও দাতাগোষ্ঠীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রায়ই সরলীকৃত দারিদ্র্যের আপাতন (incidence of poverty)-কে সবচে' বেশি গুরুত্ব দেয়। এই ভিত্তিতেই বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে: ১৯৮৫/৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে ৪০.৪ শতাংশে আর ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ (head count ratio based, প্রধানত খাদ্য ভোগ বা প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ -এর হিসাবে মাথা-গণনা পদ্ধতিতে)। অর্থাৎ সরকারি হিসাবে গত ২৫ বছরে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। অথচ একই সরকারি দলিল বলছে দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ এমনকি সরকারি স্থূল হিসাবকে আমলে নিয়েও স্পষ্ট বলা যায় যে, তুলনামূলক দারিদ্র্য (শতাংশ হিসেবে) হ্রাস পেলেও মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেতে থাকবে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। তখন দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি। আর এখন (২০১০ সালে) সরকারি হিসাবে প্রায় ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। সুতরাং দারিদ্র্যের আপাতন-ভিত্তিক স্থূল হিসাবপত্তরও নির্দেশ করে যে, দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি। এ কথা আরো সত্য হবে যদি দারিদ্র্য পরিমাপে ইতোপূর্বে উল্লিখিত দারিদ্র্যের বিভিন্ন রূপ আমলে নেয়া হয়। এ কথা আরো সত্য হবে যদি বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিশ্লেষণ করে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। আর তাই-ই যদি করা হয় তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ অথবা হ্রাসের প্রচলিত কোনো প্রেসক্রিপশনই যুক্তিতে টিকবে না।

এখন সঙ্গত প্রশ্ন– দরিদ্র কে?[৯] বাংলাদেশে আসলেই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত? আমার ধারণা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' ও 'মৌলিক অধিকার' সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র, সম সুযোগের অভাব বঞ্চিতরা দরিদ্র, বৈষম্যের শিকার যারা তারাই দরিদ্র, অসমতার শিকার যারা তারাই দরিদ্র, শোষিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র, আইনের দৃষ্টিতে যিনি অসমান তিনিই দরিদ্র। এসব বিবেচনায় আমার হিসাবে বাংলাদেশের শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষই দরিদ্র– এ সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। সাংবিধানিক বিধান ও বিধৃত অধিকার (১৯৭২) থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। শুধু সাংবিধানিক বিধানই নয় ন্যায় অধিকার (justiciable rights) থেকে বঞ্চিতরাও দরিদ্র। বহুমাত্রিক মানববঞ্চনা দূরীকরণে আমাদের সংবিধান যে সব অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় তা হল ন্যূনতম নিম্নরূপ:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ (সংবিধান ,অনুচ্ছেদ ৭.১)

২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫.ক)

৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)

৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)

৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৯/১,২)

৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ)

৭. মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি (অনুচ্ছেদ ১৪)

৮. জীবনমানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লব (অনুচ্ছেদ ১৬)

৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১০)

১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (অনুচ্ছেদ ১১)

১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৩২)

১২. ... কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (অনুচ্ছেদ ২৭) ।

আমি মনে করি দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত– বহুমাত্রিকভাবেই বঞ্চিত। আমি মনে করি বঞ্চিতরাই দরিদ্র– এ বঞ্চনা হতে পারে সাংবিধানিক এবং ন্যায়-অধিকার কেন্দ্রিক। এসব মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়– নিরন্তর অসমতার শিকার, এবং কাঠামোগত কারণেই। আগেই বলেছি খাদ্য-পরিভোগকেন্দ্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ খুবই স্থূল। শারীরিকভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য পরিভোগ– দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে এক ধরনের 'গরু-ছাগল' পদ্ধতি। বিপরীতে আমি মনে করি দরিদ্র মানুষ মাত্রেই বঞ্চিত এবং বৈষম্য ও অসমতার শিকার; দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ বস্তুগত– আত্মিক– আবেগী সম্পদ থেকে বঞ্চিত; যে বঞ্চনা তাদের বেঁচে থাকা–বিকাশ-সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে; যে বঞ্চনা তাদেরকে করে অধিকারহীন। এবং এসব বঞ্চনা-অসমতা তাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি ও ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয় না– ফলে তারা সমাজের 'সম-সদস্য' হতে পারেন না এবং তারা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না। আর বস্তুগত, আত্মিক ও আবেগী সম্পদ বলতে আমি যা বুঝি তার পরিমাপসমূহ হল নিম্নরূপ (এ সবের পরিমাপ যতই জটিল অথবা দুরূহ হোক-না কেন):

বস্তুগত (material) সম্পদ = আয়, খাদ্য (সুষম-পুষ্টিসমৃদ্ধ), কর্মসংস্থান (ন্যায্য মজুরি-বেতনসহ), শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা (গুণগত মানসম্পন্ন), খাস জমি-জলা-বনভূমিতে অধিকার, রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার;

আত্মিক (spiritual) সম্পদ = উদ্যোগ, জীবনবোধের পরিপূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্ক-সৌহার্দ্য-সংহতি, আদর্শ মানুষের মডেল;

আবেগী (emotional) সম্পদ= ভালোবাসা-সহমর্মিতা, আস্থা-বিশ্বাস, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতাবোধ, অন্তর্ভুক্তি, ছিটকে না পড়ার বোধ, বিচ্ছিন্ন না হবার বোধ।

আমার এ বক্তব্যের পাশাপাশি উল্লেখ জরুরি যে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিভাজন সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক তেমন কোনো গবেষণা হয়নি অথবা এখনো অন্তত আমার চোখে পড়েনি। অর্থাৎ আমরা জানি না আমাদের দেশে ধনী মানুষের সংখ্যা কত, গরিব কত, মধ্যবিত্ত কত এবং সময়ের নিরিখে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির কী অবস্থা। এ বিবেচনা থেকে এ দেশের মানুষের প্রকৃত আয়, ভূমি মালিকানা এবং কালো-টাকার মালিকানা একীভূত করে জনসংখ্যার শ্রেণিবিভাজনসহ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা হিসাবের একটা চেষ্টা করেছি। আমার হিসেবে ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষই (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ) গরিব মানুষ। প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে আরো বেশি। কারণ বাজার অর্থনীতিতে যখন দ্রব্যমূল্যসহ জীবন-উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পায় তখন নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরকেও আসলে দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হিসেবে গণ্য করা উচিত। এ বিবেচনায় আমার হিসাবে বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ)-ই দরিদ্র। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যাটি সরকারি হিসাবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২ শতাংশ নয়– হবে ৮৩ শতাংশ। এই ৮৩ শতাংশ মানুষই নিরন্তর বঞ্চিত, বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার এবং অসমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর ক্রমবর্ধমান অসমতার হিসাব কষলে চিত্রটি হবে আরো ভয়াবহ। কারণ সেক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত চিত্র হবে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায় 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%' [১০]। বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা হিসাবে দারিদ্র্য এক চক্রাকারে বিবর্তিত হচ্ছে– যে চক্র চূর্ণ করা কঠিন, যে চক্র কাঠামোগত। আর সেইসাথে সময়ের নিরিখে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বঞ্চনা এক ধরনের পাইপ যে পাইপে দরিদ্র হিসেবে ঢুকবার পথ বেশি আর বেরুনোর পথ কম। দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্যের পাইপটি এমন যে একবার ঢুকলে বেরুনো কঠিন; আবার একবার বেরুলে বাইরে থাকাটাও কঠিন (অর্থাৎ আবার ঢোকার সম্ভাবনা অনেক)।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণির পরিবর্তনের গতি-প্রবণতা প্রমাণ করে যে গত ২৫ বছরে (১৯৮৪-২০১০) প্রধানত rent seeking থেকে উদ্ভূত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন[১১] এবং গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণিকাঠামো বদলে দিয়েছে। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটিকয়েক ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদসৃষ্টির মাধ্যমে নয় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল-বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের (অর্থাৎ rent seeking)-এর মাধ্যমে বিত্ত, সম্পদ ও ক্ষমতা (wealth, asset and power) পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতর করে। যে বিষয়ে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যাবে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণে যা পরে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো পরিবর্তন-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যসূচক চিত্রটিই এমন যা দিয়ে একদিকে প্রমাণ হয় যে প্রধানত 'rent seeking' প্রক্রিয়া নির্ধারক হবার কারণে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস পায়নি– বেড়েছে; আর অন্যদিকে এ কাঠামো দিয়ে

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতাসহ মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও সম্ভব[২২]। আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আমার হিসাবে বাংলাদেশে এখন ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (৬৬%), ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (৩১.৩%) এবং অবশিষ্ট ৪১ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। গত পঁচিশ বছরে (১৯৮৪-২০১০) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি তথাকথিত উন্নয়ন ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। যা অন্যান্য অনেক বিরূপ অভিঘাতসহ এ দেশে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা উৎসাহিত করার ভিত্তি সৃষ্টি ও তা মজবুত করেছে।

২. শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা কার্যত ভূমিহীন। ৭০ ভাগ খানাতে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। শতকরা ৬৫ জন মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত। বাংলাদেশে নগরায়ন মূলত বস্তিয়ায়ন (not urbanization but slumization) অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ন। এ নগরায়ন আসলে গ্রামের ভূমিহীন-দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষকে গ্রাম থেকে এক ধরনের 'গলাধাক্কা অভিবাসন'-এর পরিণাম মাত্র। এ নগরায়নের পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হল অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড উৎপত্তির জন্য সহায়ক শক্তভিত্তি।

৩. বিগত ২৫ বছরে (১৯৮৪-২০১০) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ৬৫ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা-সাম্প্রদায়িকতাসহ দারিদ্র্য-তাড়িত বিষয়াদির উদ্ভব ও বৃদ্ধির পরিমাণও গত পঁচিশ বছরে আনুপাতিকহারে বেড়েছে। আর এসব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রধান মাধ্যম 'rent seeking'।

৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৪৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং অবশিষ্ট ৪৭ লক্ষ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষত অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সব ধরনের অস্থিতিশীলতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের মেধাশক্তি গঠিত হয়। এখানেও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে rent seeking-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন।

Rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ সম্মিলনের ফলে এদেশে শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রেণিকাঠামোর এ পরিবর্তন স্পষ্টভাবেই দেখায় যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। যা সমাজকাঠামোতে অনেক ক্ষত সৃষ্টি করেছে এবং একই সাথে তা সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন অস্থিরতাসহ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। উপরের বিশ্লেষণ আরো একটু বিস্তৃত করে যা বলা সম্ভব তা হল নিম্নরূপ:

ক. বিগত ২৫ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৮ শতাংশই দরিদ্র আর ১৭ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের কেন্দ্রীভবন বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসাবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনও গ্রামে (যাদের ৫৯% নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ২৫ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৫ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১০ সালে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ)। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬১ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিচতলার মানুষের বিত্ত-সম্পদ উপরতলায় প্রবাহিত হবার এ এক লক্ষণ মাত্র।

ঘ. বিগত ২৫ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ২৯ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্নবিত্তের বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশ আর অতীতের নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে অদৃষ্টবাদী।

ঙ. ২০১০ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪১ লক্ষ। বিগত ২৫ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ৮ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ২৪ শতাংশ। বিত্ত-সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য-অসমতা বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় আনুপাতিক ধনীর সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যা-স্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা 'সুপার ধনী' (super rich; আর পল ক্রগম্যানের ভাষায় super-duper-elite)১৩ অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ১০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির বিত্ত-সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই হচ্ছে অর্থনীতির প্রধান 'rent seeker' যাদের সাথে সমস্বার্থ আঁতাত আছে সরকার ও রাজনীতির (ক্ষমতাসীন রাজনীতির)। আমার মতে এখানেই সেই শেকড় যেখান থেকে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশপ্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেইসাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৯০

শতাংশ বিত্ত-সম্পদ)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার উপরতলার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'[১৪]। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ্চ ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও (পরে বিশ্লেষিত হয়েছে)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ– এসবই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অস্থিরতাসহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাউদ্ভূত উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে।

এখন প্রশ্ন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিয়ে যা বললাম তার ভিত্তিতে আমরা দারিদ্র্য হ্রাস নিয়ে ভাবব, না'কি দারিদ্র্য উচ্ছেদ নিয়ে ভাবব, না'কি দারিদ্র্য হ্রাস ও উচ্ছেদ উভয় নিয়েই ভাবব? এ দেশে এখনও পর্যন্ত কেউ-ই দারিদ্র্য উচ্ছেদের কথা তেমন বলেননি, প্রায় সবাই বলেছেন দারিদ্র্য হ্রাসের কথা।

আগেই বলেছি সংবিধানকে দরিদ্র পরিমাপনের ভিত্তি হিসেবে ধরলে আমাদের 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ' (অনুচ্ছেদ ৭.১), তাদের কমপক্ষে ৮৩ ভাগ দরিদ্র (বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ)। কারণ ১৫ কোটি মানুষের এ দেশে (২০১০ সালের হিসাবে):

১. খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি (যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।

২. প্রায় ৯ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

৩. প্রায় ১০ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগবঞ্চিত। আর ৭.৫ কোটি মানুষ সুপেয় পানির অভাবে মরণব্যাধি আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছেন (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)

৪. প্রতিবছর যে ৯ লক্ষ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করেন তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও লজ্জাজনক কথা, ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য-উদ্ভূত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়ারিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মারোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)।

৫. সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে)।

৬. প্রায় ১০ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎসুবিধা-বঞ্চিত (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)।

৭. সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের (খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত) ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে

কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য-পরিভোগ তেমন বৃদ্ধি পায়নি– পুষ্টির কথা বাদই দিলাম। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাযুজ্যহীন)।

৮. দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।

৯. বিরাট এক জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছেন (যা সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সকল ধারার পরিপন্থী)।

১০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লক্ষ মানুষের ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এই জবরদখলকারী 'rent seeker'-রা আমাদের জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠীভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য – সবদিক থেকেই প্রান্তস্থ[১৫] (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮, ও ৪১ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।

সংবিধান দারিদ্র্যদূরীকরণে (বৈষম্য-অসমতা দূর করাসহ) যা নিশ্চিত করার কথা বলছে আর বাস্তবে 'rent seeker'-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের স্বার্থ সম্মিলনের যে চরিত্র-কাঠামো দেখছি তা চলতে থাকলে এদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কখনও দূর হবে না।[১৬] বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ডে হয় মৌলিক পরিবর্তন নয়তো সংবিধানের ৮ থেকে ৪৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদের আমূল সংশোধন জরুরি (সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অন্যান্য ১০৬-টি অনুচ্ছেদেও বিভিন্ন মাত্রায় সংশোধন করতে হবে)। আমার মতে এক্ষেত্রে মধ্যপথের অবকাশ নেই (যদিও আমরা অনেকেই ঝামেলামুক্ত হতে মধ্যপথকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করি)। তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলব কি'না যে, এ বিষয়ে সংবিধান কার্যকরী নয়? বিষয়টি ভাবনার– গভীর ভাবনার!

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. নিকোলাস স্টার্ন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমার টেবিলে দারিদ্র্য উচ্ছেদ (alleviation অর্থে) শিরোনামে কোনও কিছু এলে আমি সেটা waste paper basket-এ ছুড়ে ফেলে দিই"। অর্থাৎ তার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ সম্ভব নয়। বক্তব্যটি আমার কাছে অর্থনীতিবিদদের দারিদ্র্য বিষয়ক দর্শনচিন্তারই দারিদ্র্য বলে মনে হয়। আমার মতে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস– ধারণাগত দিক থেকে উভয়ই সঠিক। আসলে দারিদ্র্যের মাত্রা দুটো– নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য (absolute poverty) আর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র্য (relative poverty)। আমি মনে করি, মাথাপিছু দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য ভোগ যদি নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের একটা মাপকাঠি হয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে এ মুহূর্তেই বাংলাদেশ থেকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য হ্রাস নয় উচ্ছেদই সম্ভব। কারণ আমরা এখন যে পরিমাণ খাদ্যশস্য (ধান, গম, ডাল, ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস

ইত্যাদি) উৎপাদন করি সেটাকে মোট কিলোক্যালরিতে রূপান্তর করে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাথাপিছু দৈনিক কমপক্ষে তিন হাজার কিলোক্যালরি অথচ নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে প্রয়োজন মাথাপিছু দৈনিক ২,১২৩ কিলোক্যালরি। সহজ এই পাটিগণিত বাস্তবে কাজ না করার প্রধান কারণ হল বণ্টন-বৈষম্য[১৭] আর সংশ্লিষ্ট অসমতা যার মূলে আছে rent seeker-দের সাথে তাদেরই অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলন। আর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বৈষম্য রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, বলা হচ্ছে "বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ"। আসলে মূলনীতি শীর্ষক সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের বিধানসহ কৃষিসংস্কার (agrarian reform) ও অন্যান্য জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) ছাড়া বণ্টন-বৈষম্য রোধের প্রকৃত কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে বাজার অর্থনীতির কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইতোমধ্যে শেকড়ে rent seeking অনুচ্ছেদে এবং পরবর্তী 'মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়' শিরোনাম অনুচ্ছেদে।

আসা যাক আপেক্ষিক দারিদ্র্যের বিষয়ে। নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের বিপরীতে আপেক্ষিক দারিদ্র্য উচ্ছেদ বা নির্মূল সম্ভব নয়, হ্রাস সম্ভব। কারণ বিষয়টি তুলনামূলক। এক শ্রেণিতে পাঠরত দু'জনের পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) ভিন্ন হয় বিভিন্ন কারণে। আবার দু'জনের ফল ভিন্ন হতে বাধ্য– এ কথাও অসত্য হতে পারে। দু'জনের প্রথমজন যদি জন্মসূত্রে স্বল্প ওজনের (low birth weight) এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টিবাহিত হয় (গবেষকেরা বলেন জন্মপ্রক্রিয়ার দু'বছরের মধ্যে মস্তিষ্ককোষের মূল বিকাশ ঘটে থাকে) আর দ্বিতীয়জন যদি ঠিক উল্টো বৈশিষ্ট্যের হয়, তাহলে দু'জনের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে। আর দু'জনেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হলে অর্থাৎ প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করলে তুলনামূলক ফল কি ভিন্ন হবে? আমাদের দারিদ্র্য-গবেষকেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান বলে আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরীক্ষার ফল (অথবা অভিজ্ঞান-মাত্রা) বিষয়ক দারিদ্র্য হ্রাস নয়, উচ্ছেদই সম্ভব। সুতরাং, সামাজিক বৈষম্য-অবৈষম্যের বিচারে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য আপেক্ষিক আর আপেক্ষিক (বা তুলনামূলক) দারিদ্র্য নিরঙ্কুশ। নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক দারিদ্র্যের মর্মার্থ অনুধাবনে বিষয়টি আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা বিশ্লেষণ ও দারিদ্র্য উচ্ছেদ (নির্মূল) এবং/অথবা দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা জরুরি।

একদিকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা আর অন্যদিকে মানব (মানবিক) উন্নয়ন সম্ভাবনার গতি বৃদ্ধি– এ দু'টো যে পরস্পর সম্পর্কিত এ বিষয়েও আমাদের চিন্তাকাঠামোতে যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। সরকার ও দাতাগোষ্ঠী প্রায়শই আমাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, উন্নয়ন হলে দারিদ্র্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কমে যাবে। বিষয়টি উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধির চুইয়ে পড়া তত্ত্ব (trickle down theory) হিসেবে পরিচিত। এ বিষয়ে আমি আদৌ একমত নই; এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমি মনে করি উল্টো– দারিদ্র্য

উচ্ছেদ হলে উন্নয়ন হবে অথবা দারিদ্র্য উচ্ছেদ টেকসই উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। আসলে উন্নয়ন বলতে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী যা বুঝিয়ে থাকেন সে অর্থে তা হবে না। তারা উন্নয়ন বলতে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বুঝিয়ে থাকেন দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে অবস্থাতেই থাকুক-না কেন। এসব প্রবৃদ্ধির উৎস যাই হোক-না কেন এবং প্রবৃদ্ধির ফল যেখানেই যাক-না কেন– তাতে ওদের মাথাব্যথা নেই। অথচ আমি অন্তত ১০০টি দেশের নাম উল্লেখ করতে পারি যেসব দেশে এসব মাপকাঠিতে উন্নয়ন হলেও সেইসঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে খুব জোর দিয়েই বলতে চাই যে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিমাপক নয়। (বিষয়টি আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি পরবর্তী 'মানুষে-মানুষে অসাম্য কেন হয়' অনুচ্ছেদে)।

সুতরাং সবকিছু বিশ্লেষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট 'উন্নয়ন'-এর নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন। যে সংজ্ঞা বৈষম্য-হ্রাসকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কথা বলবে। যেখানে উন্নয়ন হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice) নিশ্চিত করবে, সম্প্রসারিত করবে, বিস্তৃত করবে। এ অর্থে উন্নয়ন হতে হবে স্বাধীনতা মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া (freedom-mediated process) যেখানে অধিকার হিসেবে জনগণের জন্য পাঁচ ধরনের চয়ন-স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে: অর্থনৈতিক সুযোগ (economic opportunity), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা (guarantee of transparency), ও সুরক্ষার বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (protective security)।[১৮] উন্নয়ন দর্শন কৌশল যদি এসব স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র তখনই উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচিত হবে অথবা দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনটি হতে হবে দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) যে দর্শনের মূল ভিত্তি-বিষয়সমূহ হবে–পূর্ণাঙ্গ জীবন বিনির্মাণে সবার সম-সুযোগের নিশ্চয়তা; বহিঃস্থদের অন্তর্ভুক্তিকরণ (বঞ্চিত, নিঃস্ব, দুস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখী মানুষ); মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা; মানুষ নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করেন সে লক্ষ্যে সুযোগের সম্প্রসারণ; অ-স্বাধীনতার সব উৎসমুখ বন্ধ করা; সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন; মানুষের অসীম সক্ষমতা বৃদ্ধির সব পথ সম্প্রসারণ; বঞ্চনার-চক্র ভেঙে ফেলা; বৈষম্য-অসমতা নিরসন এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা। এসবের সাথে প্রস্তাবিত দেশের মাটি-উত্থিত স্বদেশি উন্নয়ন দর্শনে rent seeker-দের রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং rent seeking প্রক্রিয়াকে চিরতরে নির্মূল করার ব্যবস্থা করতে হবে। মানবিক উন্নয়নের এ দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈষম্য-অসমতা নিরসন হবে উন্নয়নের লক্ষ্য, উপলক্ষ নয় (যেটা প্রচলিত চিন্তায় ঠিক উল্টো)।

কেন যেন আমাদের মতো উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র দেশ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ(?) মাত্রাতিরিক্ত ভাবেন (!)। এদের মধ্যে যারা খুব বেশি ভাবেন তারা প্রায়

সবাই ধনীদেশের নেতা অথবা তাদেরই প্রতিনিধি। তারা কিন্তু তাদের দেশের rent seeker-দের সম্পর্কে তেমন টু শব্দটি করেন না; নিজ দেশের বৈষম্য-অসমতা নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই তাদের। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ (?) ২০১৫ সাল নাগাদ কী হবে এ নিয়ে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goals, MDG) শিরোনামে ১৯৯৯ সালে ভাবনা শুরু করেছেন; আর ২০১৫ সাল যতই কাছে আসছে ততই নতুন ভাবনা শুরু করেছেন যার শিরোনাম দিয়েছেন 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' (Sustainable Development Goals, SDG)। MDG-র প্রথম লক্ষ্য হল 'চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা' (২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা)। জাতিসংঘের MDG-তে যেহেতু রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষর করেছি সেহেতু আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে শুরু করে দেশের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ফোরামে আমরা দারিদ্র্য-ক্ষুধা 'নির্মূল বা উচ্ছেদের' কথা জোরেশোরেই বলতে পারি। সেই সাথে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে জাতিসংঘে যখন আমরা 'দারিদ্র্য নির্মূল'-এ স্বাক্ষর করলাম তখন দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রে (PRSP) অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে কেন 'দারিদ্র্য হ্রাসে'র কথা বলছি। 'নির্মূল' ও ' হ্রাস' তো এক কথা নয়। এ দ্বৈততা কেন? একি নেহায়েত দ্বৈততা না'কি কমিটমেন্ট-এর অভাব; প্রতিশ্রুতি ও সদিচ্ছার অভাব? এ বিষয়ে জোরে কথা বলে কী হবে তা জানি না, তবে যুক্তি থাকলে উচ্চকণ্ঠ হতে অসুবিধা কোথায়? বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক।

সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা দু'ভাবে ভাবতে পারি: প্রথমত এ দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যা কিছু দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন ছিল অথচ 'উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিলে' স্থান করে নিতে পারেনি তা চিহ্নিত করা এবং উচ্চস্বরে বলা। যেমন দেশে ২ কোটি বিঘার বেশি যে খাস জমি ও জলা আছে তা কিভাবে দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যাতে রূপান্তরিত হবে (?); অথবা দরিদ্র বেকারদের (প্রধানত যুবদারিদ্র্য) কী হবে (?); অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কল-কারখানা খোলা নিয়ে ভাবনাটা কী (?); অথবা গত ৩৫ বছরে বিদেশি ঋণ-অনুদানের প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার লুটপাট, আর প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকার কী হবে (?); উন্নয়ন বিরোধী সব ধরনের– সব রূপের 'rent seeker'-দের নিরস্ত্র করা যাবে কিভাবে (?) ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র অথবা পাঁচসালা পরিকল্পনায় এমন কী আছে যা দিয়ে দরিদ্র মানুষ বুঝবে যে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে (?); বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কী এবং তাতে দরিদ্র মানুষ কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন? এক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'নিজস্ব-দেশজ (home grown)' বিস্তারিত দারিদ্র্য-বৈষম্যহ্রাসমুখী উন্নয়ন দর্শন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করে সেটা প্রচার করা এবং যুক্তি থাকলে তা গ্রহণে নাগরিক সমাজ ও সরকারকে পরামর্শ দেয়া; প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করা এবং তা অব্যাহত রাখা। আমাদের 'নিজস্ব-দেশজ দারিদ্র্য নির্মূল/বিমোচন কৌশল দলিল' প্রণয়ন এ জন্যও দরকার যে সরকারের তথাকথিত 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র' রচিত হয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ[১৯]-এর কনসেশনাল ঋণ পাবার পূর্বশর্ত হিসেবে যা এ দেশের 'মাটি থেকে উত্থিত' (home grown) উন্নয়ন নীতি-কৌশলের রূপরেখা নয়। এদেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব 'দারিদ্র্য বিমোচন নীতি-কৌশল দলিল' প্রণয়ন কোনো জোর জবরদস্তির বিষয় নয়– এটা দেশের

মানুষের সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করার নীতি-কৌশল হিসেবেই ভাবতে হবে। ভাবনা যদি তাই-ই হয় তাহলে নিজস্ব অর্থে পদ্মাসেতু বিনির্মাণে বাধা কোথায়[১০]; বাধা কোথায় কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে; বাধা কোথায় সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনঃগঠনে-পুনঃচালুকরণে; বাধা কোথায় সবার জন্য সরকারিভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ অন্তত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে? আমার ধারণায় এসবে মূল বাধা হল আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক rent seeker গোষ্ঠীর সম-স্বার্থ; আমাদের পরনির্ভরশীলতা ওই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের শক্তি বৃদ্ধি করে, আর উল্টোটা তাদের অস্তিত্বের উপর হুমকি যে কারণেই তারা প্রায়শই একটি কৌশল অবলম্বন করেন যার নাম FUD (fear বা ভীতি; uncertainty বা অনিশ্চয়তা; doubt বা সন্দেহ)।

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচন লক্ষ্যে 'উন্নয়ন'-এর রূপরেখা ও কৌশলাদি কেমন হবে বিষয়টি সত্যিকার অর্থে এখনও পর্যন্ত আমাদের বেশ অজানা। শুধু দারিদ্র্যের মর্মবস্তুর নিরিখেই নয়, দারিদ্র্য-বিমোচন লক্ষ্যের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কেমন হতে পারে, এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল বলে আমি মনে করি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিষয়ক কোনো জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) অস্তিত্ব এ দেশে আছে কি'না, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান। তবে নিরাশ নই আশাবাদী, কারণ এসব নিয়ে চিন্তা-পুনঃচিন্তার পরিবেশটা অন্তত সৃষ্টি হয়েছে।

চার.
বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন-উদ্দিষ্ট rent seeking-সহ দুর্বৃত্তায়নই দারিদ্র্যের উৎস

আমার দৃঢ় বিশ্বাস– এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসংগত তেমন কোনো কারণ নেই যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তৃতি, মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা এখন যা এবং যে দিকে এগুচ্ছে, প্রবণতার চাকাটি তার উল্টো দিকে আনতে হবে। আর সেটাই হবে আমাদের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশক। স্বাধীনতার পরে বিশেষত ১৯৭৫-পরবর্তী বিগত প্রায় চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর অধিক হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন (production and reproduction of poverty-disparity-inequality) হয়েছে। দারিদ্র্যের উৎস– বৈষম্য ও অসমতার বিকাশ হয়েছে অবারিত। বৈষম্য সৃষ্টির উৎসসমূহে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি– সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এ লুণ্ঠনকারীরাই হলেন rent seekers। যারা আসলে সম্পদ সৃষ্টি করেন না; তারা সরকার ও ক্ষমতার রাজনীতি ব্যবহার করে অন্যের সম্পদ হরণ করেন (ইতোমধ্যে বিষয়টি শেকড়ে rent seeking অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। এ লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হল কালো টাকা, জবরদখল (ভূমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু), সন্ত্রাস, পেশি-শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি অনিয়ম, অযৌক্তিক পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন কোটা, উপহার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তির অপব্যবহার, একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি, কু-আইন, সু-আইন বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-

নিপীড়ন ইত্যাদি। পুঁজিবাদ বিকাশে লুণ্ঠন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে কিন্তু এদেশে উল্লিখিত আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া জাতীয় পুঁজি বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে– তা না হলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি বন্ধ হবে কেন? কেন বন্ধ হয়েছে মৌলিক ভারী শিল্প? কেন রাষ্ট্রীয় উৎপাদনি প্রতিষ্ঠান পানির দরে বিক্রি হয়ে যায়? কেন বিরাষ্ট্রীয়করণকে সর্বরোগের নিরাময় বলা হয়? কারা এসব প্রেসক্রিপশন দেন? কেনই-বা নির্বিচারে তাদের কথা শুনতে আমরা বাধ্য হই?

স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৫-পরবর্তী অর্থনীতির হরিলুট (অর্থাৎ rent seeking)– বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করেছে এবং তা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদে' (criminalization trap) পড়েছে এবং তা থেকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচিত হবে না। কারণ বাস্তব অবস্থাটা আসলে বাজার-রাজনীতি-সরকারের সাথে দুর্বৃত্ত– rent seekers-দের এক অশুভ স্বার্থ-সম্মিলনের প্রতিফল মাত্র। দুর্বৃত্তায়নের দৃশ্যমান বিষয়টি নিম্নরূপ:

১. গত চল্লিশ বছরে সরকারিভাবে যে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে, তার ৭৫ ভাগ লুণ্ঠন করেছে অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীন দরিদ্রের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বৃত্ত-লুটেরাদের সাথে বাজার-অর্থনীতি-রাজনীতি-সরকার-এর সমস্বার্থের সম্মিলনই এ অবস্থার স্রষ্টা। এ সমীকরণের বাইরের অন্যান্য অনেক উপাদানই বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবক হতে পারে তবে নিয়ামক নয়।

২. অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে। দুর্বৃত্তায়নের এ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এখন নবসংযোজন হয়েছে গণমাধ্যম দখল।

৩. ক্ষমতাবানেরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন। এ বিত্তের প্রধান উৎস rent seeking (যা আগে ও পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এ পুঁজি শুধু অনুৎপাদনশীলই নয়, তা 'সৃষ্ট'ও নয় (not created)–এ বিত্ত হরণকৃত। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে এর তেমন আগ্রহ নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে শুধু সেক্ষেত্রে যেখানে আরো বেশি rent seeking হতে পারে অথবা rent seeking সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য বিপত্তি এড়ানো যায়।

৪. ক্ষমতাবানেরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে এখন ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয়, আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে জিডিপির ৪০-৮৫ শতাংশের সমপরিমাণ হবে কালো টাকার পরিমাণ (অর্থাৎ মোট ৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত)। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতিতে

জড়িত। এরাই বছরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন; এরাই অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি করেছেন যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন অসম্ভব। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড দুরূহ করছেন। এরাই সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টি করছেন ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও অসমতা।

৫. দেখা গেছে দুর্বৃত্ত-বেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যত-না মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে লুণ্ঠনের খাতকে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা সম্ভব, তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে অপ্রয়োজনীয় অনেক খাতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আর যাই হোক দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট নয়। এখানেও ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির রাজনৈতিক অর্থনীতি দৃশ্যমান।

৬. ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে যা উত্তরোত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য-বৈষম্য বৃদ্ধি করছে (যার সবগুলো সংবিধানের ১১, ২৬-২৯, ৩১-৩২, ৩৫-৪১, ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদসমূহের পরিপন্থী)। এসবই ঘটছে rent seeker-দের সাথে ক্ষমতার রাজনীতি ও সরকারের অশুভ স্বার্থ-সম্মিলনের কারণে। এসবের পুঞ্জিভূত রূপটি এমন–

যেখানে নির্বাচন মানেই বড় মাপের আর্থিক বিনিয়োগ এবং কালোটাকার প্রতিযোগিতা; যেখানে সন্ত্রাস-সহিংসতা অনিবার্য ও নৈমিত্তিক বিষয়; যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবমাননা সাধারণ নিয়ম; যেখানে সরকারি গণমাধ্যম মানেই স্তুতি প্রচারের যন্ত্র; যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি নেহায়েতই টোকেনইজম (স্লোগান); যেখানে সুশাসন বিষয়টি অতিমাত্রায় উচ্চারিত কিন্তু প্রকৃতই মূল্যহীন; যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেহায়েতই কাগুজে; যেখানে মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনাকেন্দ্রিক ব্যবসা সবচে' লাভজনক; যেখানে গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ অন্যায় দেখলেও একধরনের 'নীরবে সহ্য করার সংস্কৃতিতে' (culture of silence) অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক-না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর ধনীদের বেড়েছে– ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের এ-কথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। আমার হিসাবে গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আগেই বলেছি বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

গত চার দশকে এ দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক বিকাশের মূল প্রবণতা হল: ২০ লক্ষ[২১] দুর্বৃত্ত (প্রধানত rent seekers) ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে।

ক্ষমতাধর সংখ্যাস্বল্প দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দু'টি ধারা স্পষ্টতই বিরাজ করছে। Rent seeker-দের নিয়ামক ভূমিকার পরিণাম হিসেবে গত চার দশকের আর্থ-সামাজিক 'উন্নয়নের' খেরোখাতা (balance sheet) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও মানবউন্নয়ন-বিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য-সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; বাজার অর্থনীতির অন্তর্নিহিত দর্শন ও প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। 'উন্নয়নের' খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হত, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভালো হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে।

গত চার দশকে কিছু মানুষ সম্পদ সৃষ্টি না করেই অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন (আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন); সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় (rent seeking) অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা-বৈষম্য-অসমতা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। সেই সাথে বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র্য-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা; বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষীর সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রাদায়িক মানসকাঠামো– এককথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি।

অর্থাৎ rent seeker-দের সাথে তাদের অধীনস্থ রাজনীতি ও সরকার শুধুমাত্র সমাজে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাই বৃদ্ধি করেনি সেইসাথে জ্ঞানজগৎসহ সাংস্কৃতিক জগতের সাম্প্রদায়িকীকরণে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। এতক্ষণ যা বললাম সেসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩,০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫,০০০ টাকা। মনে রাখা খুবই জরুরি যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (যার মোট সংখ্যা হবে ৮০ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ৫৫,০০০-এর বেশি, যার মধ্যে ৭৩

শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১,৪০০ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা পাশ করার পর তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ।[২২] শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। আর rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতিকে নিয়ামক ভূমিকায় রেখে ওই প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মকাণ্ড টিও সম্ভব নয় কারণ ওদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের সম্মিলনটি দুর্ভেদ্য এবং শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ rent seeker-দের উদ্দেশ্য সফল করার মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে।

Rent seeking সৃষ্ট আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও বৈষম্য-অসমতার গতি-প্রবণতা প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ উপসংহারে উপনীত হবার আগে বলা প্রয়োজন যে দারিদ্র্যের কয়েকটি নতুন মাত্রা সম্পর্কে এদেশে খুব কমই ভাবা হয়। এসব নতুন রূপের মধ্যে অন্যতম শিশু-দারিদ্র্য, যুব-দারিদ্র্য, প্রবীণ-দারিদ্র্য। এসব নিয়ে এদেশে এখনও পর্যন্ত তেমন কার্যকর কোনো ভাবনা-চিন্তা করা হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশে শিশু দারিদ্র্যের মাত্রা, গভীরতা ও তীব্রতা সামগ্রিক দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি[২৩]। যুবকদের বিশাল অংশ–স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে– বেকার। আর যুব-বেকারত্ব সৃষ্টি করছে বিশাল এক বাহিনী যা ব্যবহার করছেন সব ধরনের rent seeker-রা, কালোটাকার মালিক, রাজনীতিবিদ, সরকার এবং ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গিরা[২৪]। যুবদারিদ্র্য-উদ্ভূত নিরাশা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ধরনের নবতর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অস্থিরতা। যুবদারিদ্র্য নিয়ে বাণিজ্য এখন অনেকের জন্য বেশ লাভজনক। গণজাগরণ মঞ্চের ঐতিহাসিক যুব জাগরণের পরেও কি যুবদারিদ্র্য বিষয়ে আমরা নিশ্চুপ থাকব? বিষয়টি নিয়ে স্ব-স্বার্থেই rent seeker-দের ভাবতে হবে। দারিদ্র্যের নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও (যাদের বয়স ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশি)। একদিকে গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া (অধিকহারে একক পরিবার সৃষ্টি) আর অন্যদিকে প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের অনিশ্চয়তার ফলে ক্রমবর্ধমান হারে সৃষ্টি হচ্ছে বয়স্ক-দারিদ্র্য[২৫]। মনে রাখা জরুরি যে আজকের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রবীণেরা ২০ বছর পরে জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশে উন্নীত হবেন। কে ভাবছে তাদের কথা? আমাদের দারিদ্র্যাবস্থা নিরূপণে দারিদ্র্যের এ তিনটি নতুন রূপ– শিশু দারিদ্র্য, যুবদারিদ্র্য ও বয়স্ক দারিদ্র্য— নিশ্চিতভাবেই উপেক্ষিত। এসব নিয়ে হয়তো-বা দু'একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো-বা আরও প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। হয়তো-বা আরো এগিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি অথবা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় জীবনচক্র সহায়তা তত্ত্ব বাস্তবায়নের প্রয়াস নেয়া হবে। কিন্তু শিশু, যুব ও বয়স্ক-দারিদ্র্য সৃষ্টির উৎসে হাত দেয়া হবে না। কারণ উৎসে হাত দিতে হলে শেষ পর্যন্ত rent seeker গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সুতরাং এতক্ষণের বিশ্লেষণ থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়া (rent seeker-দের কাজই এটা) অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিতে পালন

করছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। কাঠামোগত এসব জিইয়ে রেখে দারিদ্র্য হ্রাস (উচ্ছেদের কথা আপাতত ভুললেও চলবে) আদৌ সম্ভব নয়।

পাঁচ.
দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে শক্তিশালী মাধ্যম:
Rent seeker-দের সংগঠিত মূল্য ও বাজার-সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট

এদেশে সরকার পরিতোষিত একচেটিয়া বাজার সুবিধা ও সংগঠিত মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনে অনেক বছর ধরেই জোর ভূমিকা রাখছে। Rent seeker-রাই এ সিন্ডিকেটের স্রষ্টা। Rent seeker-দের স্বার্থে একচেটিয়া বাজার ও মূল্য সন্ত্রাস অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে। এসব পন্থা-পদ্ধতির অন্যতম হল:

রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি কারো কাছে (rent seeker-দের কাছে) কমদামে বিক্রি করে তাদেরই উৎপাদিত পণ্য বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেনা (privatization, divest and government procurement); সরকারি ক্রয়নীতির আইন-কানুন এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে rent seeker-রা উপরি সুবিধা পেতে পারে; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ (জ্বালানি-গ্যাস-কয়লা ইত্যাদি)-এ একচেটিয়া ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান; লুণ্ঠনমূলক মূল্য নির্ধারণে (predatory pricing) সহায়তা করা যেখানে কোনো ফার্ম তার প্রতিযোগীদের বাজার থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রথমে পণ্যের মূল্য কম রাখে আর প্রতিযোগীরা উচ্ছেদ হয়ে যাবার পরে সুযোগ বুঝে পণ্য-মূল্য বাড়িয়ে বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করে– বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তাদেরকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের কোটা প্রদান; কর-শুল্কসহ বাজারের বিভিন্ন আইন-কানুন-বিধি-বিধান এমনভাবে সাজানো ও প্রয়োগ করা যাতে rent seeker-রা উপরি পেতে পারেন (regulatory capture); ব্যাংকিংখাতে প্রকল্পঋণ থেকে শুরু করে এলটিআর (লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমদানি অর্থায়ন), ক্যাশ ক্রেডিট, পিএডি সুবিধা, পুনঃতফসিলিকরণ, ঋণের অবলোপনসহ খেলাপি ঋণসমূহে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে rent seeking উদ্বুদ্ধ করা যেখানে ব্যবস্থাপকসহ শক্তিধর বোর্ড-সদস্যরাও সুবিধা পেয়ে থাকেন; আমদানি-বাণিজ্যে ওভার-ইনভয়েসিং আর রপ্তানি-বাণিজ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করে rent seeker-দের আরো সম্পদশালী হবার সুযোগ প্রদান; কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে উচ্চ অঙ্কের কমিশন প্রদান (ঘুষ-দুর্নীতির রূপ); ধনী-বান্ধব সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা– কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই; বাজেটে ধনী-বান্ধব কর-শুল্কহার নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসআরও জারি করে rent seeker-দের পক্ষে আরো বেশি সুবিধা প্রদান; বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে অযথা মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান; পণ্যের বেআইনি মজুদ; পুঁজিবাজারে অস্বচ্ছ খেলা; সমরাস্ত্র ক্রয়ে অস্বচ্ছতা; বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় সংশ্লিষ্ট rent seeking গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী ব্যক্তিদের

নিয়োগ; গণমাধ্যম ও টেলিকম সংস্থাসমূহকে এমনভাবে সাজানো যা rent seeker-দের স্বার্থানুকূল হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজার ও দৃশ্যমান বাজারব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে মূল্যসন্ত্রাস নিয়মে রূপান্তরিত হয় এবং rent seeker-রাই এ কাজটি করে অথবা তাদের স্বার্থেই করা হয় যেখানে সরকার ও রাজনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।[২৬] এসবই হল উঁচুতলার কয়েকজনের কাছে নিচতলার মানুষের সম্পদ-সম্পত্তি নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয়ার পথ-পদ্ধতি (অন্যান্য অনেক পদ্ধতির কথা ইতোমধ্যেই বলেছি– পরেও বলব)।

প্রকৃত বাজারের তথ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ যে দামে মানুষ দ্রব্য/পণ্য কেনেন– খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত উভয়ই) 'সংগঠিত মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট' যে পরিমাণ অর্থ লুট করেছে তা সম্পর্কে আমার হিসাবটি নিম্নরূপ: 'সংগঠিত মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট'– নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন পন্থায় কৃত্রিমভাবে (artificially, এসব পথ-পদ্ধতি উপরে উল্লেখ করেছি) বাড়িয়ে গত ৭ বছর আগের সরকারের প্রায় ৫ বছরে এ দেশের জনগণের কাছ থেকে মোট ২৮৬,১১০ কোটি টাকা লুট করেছে (উল্লেখ্য আমার এ হিসাবের মধ্যে অনেক খাত-ক্ষেত্র বাদ আছে)। এ সিন্ডিকেট এখনও পুর্ণমাত্রায় বহাল আছে কারণ rent seeking বহাল আছে। উল্লিখিত মোট লুটের মধ্যে ১৯৩,৮১৭ কোটি টাকা (৬৮%) লুট করেছে খাদ্য-খাতে আর বাদ বাকি ৯২,২৯৩ কোটি টাকা (৩২%) লুট করেছে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে। মোট লুটের ৭২ ভাগ হয়েছে গ্রামে আর ২৮ ভাগ হয়েছে শহরে। এ লুটের শিকার হয়েছেন ১ কোটি ৮২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার (৯ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ), ৪৮ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার (২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ), আর ৩০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার (১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ)। একচেটিয়া ব্যবসা ও মূল্যসন্ত্রাসের এ প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এজেন্ট হচ্ছে– মুক্তবাজার, সরকার ও রাজনীতি।

বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট-এর প্রত্যক্ষ শিকার ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষ– যারা দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত। 'বাজার ও মূল্য সন্ত্রাসের' কারণে দরিদ্র মানুষকে পরিবার চালাতে গিয়ে হয় খাদ্যভোগ কমাতে হয়, অথবা পুষ্টিহীন হতে হয়, অথবা খাদ্য-বহির্ভূত খাতে (বিশেষ করে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও শিক্ষায়) ব্যয় কমাতে হয়, অথবা অতীতের সঞ্চয় ভেঙে ফেলতে হয়, অথবা দুর্দশাগ্রস্ত হবার কারণে সম্পদ (যা-ই ছিল) বেচতে হয় (distress sale)– অর্থাৎ খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবন-উপকরণের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে দরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। অনেকটাই অনুরূপ অবস্থা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে। আর মধ্য-মধ্যবিত্ত পরিবার– যাদের অনেকেই শিক্ষিত কিন্তু বেকার-এর অবস্থা দ্রুত অধোগতির দিকে নেমে যায়। অতএব, 'বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাসের' এ প্রক্রিয়ায় ১৪ কোটি মানুষের (দেশের ৯৩% মানুষ) দারিদ্র্য-দুর্দশা-অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়: দরিদ্র হয় দরিদ্রতর; নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ দরিদ্র মানুষের দলে যোগ দিতে বাধ্য হন; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ অবশ্যই নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যেতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় তথাকথিত 'ম্যাক্রো ইকনমিক স্ট্যাবিলিটি' স্রেফ বুদ্ধিবৃত্তিক মার-প্যাঁচ মাত্র।

যেখানে ম্যাক্রো-মাইক্রো অমিল-বেমিল (mismatch) বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আসলে বিদ্যমান কাঠামোতে যেখানে rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে স্ট্যাবিলিটি বাড়ে উঁচুতলায় আর স্ট্যাবিলিটি কমে নিচতলায়। অথবা বলা চলে সমাজের নিচতলার স্ট্যাবিলিটি কমিয়ে উঁচুতলায় স্ট্যাবিলিটি বাড়ানো হয়। এখানে জলের উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হবার ঠিক উল্টো বিধি কাজ করে– সম্পদ নিচতলা থেকে উঁচুতলায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়।

তথ্যভিত্তিক আমার হিসাব এ দেশে দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতি-সন্ত্রাসতত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করে–এ বিষয়ে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আর অন্যদিকে লুটের এসব হিসাবপত্তর এ-ও নির্দেশ করে যে rent seeker-রা প্রচুর কালোটাকার মালিক হয়েছে যার একাংশ তারা লুটপাটতন্ত্র জিইয়ে রাখতে ব্যয় করবে। আবার এ কথাও সত্য যে এত লুট যারা করল– মানুষের ন্যায়-অধিকার বাস্তবায়িত হবার প্রক্রিয়া শুরু হলে তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? একটা সম্ভাব্য উত্তর– না তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না; আর একটা সম্ভাব্য উত্তর– এ ধরনের অবস্থা থেকেই কিন্তু হুগো শ্যাভেজের মতো নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক পর্যায়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংঘর্ষ অনিবার্য হতেই পারে।

একচেটিয়া বাজার আর সংগঠিত সিন্ডিকেটের এসব মূল্যসন্ত্রাসীরা বৃহৎ পর্দার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ঘনিষ্ঠ সহচর মাত্র। সংগঠিত সিন্ডিকেটভিত্তিক এসব মূল্যসন্ত্রাসীরা শুধু চালের মূল্য নিয়েই সন্ত্রাস করে না, এ সন্ত্রাস পিঁয়াজ-রসুন-আলু-ডাল-তেল-গুঁড়োদুধ-বাস ভাড়া-গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ-বীজ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত, যার প্রধান শিকার নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ। এ প্রক্রিয়ায় rent seeking উদ্ভূত বাজার ও মূল্যসন্ত্রাস আসলে অর্থনীতিতে নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না বিপরীতে সম্পদ ক্ষয় ও বিনষ্ট করে। বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাস নিয়ে যা বললাম তার পাশাপাশি ভুললে চলবে না যে দেশে ইতোমধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতির এক শক্ত ভিত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেইসাথে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব যে 'আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি' চালু করেছে তা জীবনের নিরাপত্তা হ্রাসসহ মজুতদারি-কালোবাজারি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ করছে। নতুন এ অবস্থাটা বাজার ও মূল্যসন্ত্রাস বৃদ্ধির সহায়ক যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ায়। সুতরাং বাজারসন্ত্রাস ও মূল্য-সন্ত্রাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যতদিন থাকবে ততোদিন জীবনধারণ-উপকরণের মূল্য বাড়বে এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়বে– এ বিষয়ে সন্দেহের যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। একদিকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-সৃষ্ট বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাস আর অন্যদিকে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাস বৃদ্ধি– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা পুনরুৎপাদনের এসব সমীকরণ গভীর ভাবনার বিষয়।

ছয়.

'দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায়' কিন্তু দুর্নীতি হয় কেন? rent seeking-ই দুর্নীতির প্রধান উৎস

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো গভীর ভাবনা নেই বললেই চলে। দুর্নীতি কী; দুর্নীতির সংজ্ঞাটা দিচ্ছে কে; কারা কেন দুর্নীতি

করেন; পেটি দুর্নীতি আর মহাদুর্নীতি এক কি'না; সমাজ-অর্থনীতিতে এসবের অভিঘাত ও ক্ষতিমাত্রা এক কি'না; দুর্নীতির সাথে পরজীবী-বিত্তশালী শ্রেণির (অর্থাৎ rent seeker) সম্পর্ক কী– এসব চিন্তায় দৈন্য আছে। তবে সহজ যুক্তির কথা হল– যদি বিত্ত 'সৃষ্টি' না করে বিত্তবান হওয়া যায় তাহলে সে পথ নয় কেন? এটাই দুর্নীতি, এটাই rent seeking-এর অন্যতম রূপ। আমরা এখন শুনতে এবং বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে দুর্নীতি দারিদ্র্য বাড়ায় এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। কিন্তু এসব বলে দারিদ্র্যের মূল কারণে না গিয়ে দুর্নীতিকে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার (অপ) প্রয়াস আছে। আমি মনে করি এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন জরুরি– তা হলো দুর্নীতি কে বা কারা করেন, কোন গোষ্ঠী করেন? দেশে বছরে যে ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হয় তাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের আদৌ কোনো ভাগ আছে কি? দরিদ্র মানুষ কি দুর্নীতি করেন? যদি না করেন তাহলে কারা করেন তা উচ্চকণ্ঠে জানান দেয়া দরকার। আর এ কথাটি এখন বলা যেতে পারে যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতিবাজ শ্রেণি-গোষ্ঠীর হাত থেকে[২৭] কখনো দুর্নীতি করেননি অর্থাৎ শ্রমজীবী-দরিদ্র মানুষের হাতে ছেড়ে দিলেই তো দুর্নীতি-উদ্ভূত দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান হয়ে যায়। উচ্চস্বরে এ কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? নাকি এ বক্তব্য কল্পকথা (ইউটোপিয়া)? পাশাপাশি একথাও তো সত্য যে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জাল-জালিয়াতি না করে কোথায় শিল্পায়ন হয়েছে? আর শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান কিভাবে হবে? কিভাবে বাড়বে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি? আমার এ যুক্তি দুর্নীতির পক্ষের যুক্তি নয়– এ যুক্তি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে (যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয়) শিল্পায়নের পক্ষে দুর্নীতি হ্রাস কৌশল বিনির্মাণের যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আগেই বলেছি দুর্নীতিরও একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ আছে যা নিয়ে গুরুত্ববহ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতির সংজ্ঞা সবাই জানেন অথবা দুর্নীতি কি সবাই বোঝেন– এটা ধরে নিয়েই আমার মূল তত্ত্বানুন্ধান মাথায় রেখে দু'একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি মনে করছি। আমি এ দেশে দু'ধরনের দুর্নীতি দেখি: *পেটি দুর্নীতি* (যা ছোট দুর্নীতি) আর *মহাদুর্নীতি* (বড় দুর্নীতি)। প্রথমে আসা যাক পেটি দুর্নীতির প্রসঙ্গে। একজন রিক্শাচালক ১০ টাকার ভাড়া ২০ টাকা নিলে আমরা ধরেই নিই যে তিনি (রিক্শাচালক) দুর্নীতি করলেন (ভদ্রলোক হলে বলবেন– ব্যাটা ঠকাল)। আমার প্রশ্ন রিক্শাভাড়াটা যে ২০ টাকা নয় ১০ টাকা হবে– এটা কে নির্ধারণ করল? বলবেন 'বাজার' বা এডাম স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)। কিন্তু বাজার যখন rent seeker– পরজীবী বিত্তশালী শ্রেণির কথায় ওঠা-বসা করে তখন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কে, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন সিস্টেম তার পেশাগত ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল যে তাকে রিক্শা চালিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে? অর্থাৎ কোথাও কোনো ধরনের বড় গলদ আছে? পেটি দুর্নীতির মাত্রা-রূপ অনেক। আরো একটা উদাহরণ দিই। একজন স্বল্প বেতনভুক্ত অফিসপিয়ন ফাইল এগিয়ে ৫০ টাকা নিলেন। এটা কি দুর্নীতি? নাকি পেটের দায়ে কোনোমতে সংসার পরিচালনের জন্য ব্যয়সংকুলানে আয়ের এক পদ্ধতি (যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে ওই ব্যক্তিটিও মানসিক স্বস্তিতে নেই)।

এসব আদৌ rent seeking নয়। মহাদুর্নীতির তুলনায় এসব পেটি দুর্নীতির পরিণাম সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনে তেমন কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে না। আসলে এসব পেটি দুর্নীতিকে উদ্বুদ্ধ করে বড় দুর্নীতিবাজরাই যারা প্রকৃত rent seeker। এ সিস্টেমও তারাই সৃষ্টি করেছেন– দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে বড় মাপের জাতীয় বিধ্বংসী দুর্নীতিবাজরা উপরতলার পরজীবী-বিত্তবান rent seeker– এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ অন্যের বিত্ত-সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখলসহ আত্মসাৎই তাদের মূল পেশা-নেশা; লোভের লাভ এখানে বড় কথা। এসব rent seeker-রা কখনও উচ্চকণ্ঠে বলবেন না 'দুর্নীতি দূর হোক' আর সেটা rent seeker হবার কারণেই। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের অনুপার্জিত-হরণকৃত বিত্তের সিস্টেমটিই ভেঙে পড়বে আর সেই সাথে বিত্তের বৃহৎ অংশ কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতির মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং 'দুর্নীতি' নিয়ে গড় কথা বলে লাভ নেই; একথা বলেও লাভ নেই যে এ দেশে দুর্নীতি এখন horizontal ও vertical উভয়ই, অতএব অবস্থা খারাপ। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত্তি-কারণ কাঠামোটা ভেঙেই দেখুন-না দুর্নীতি কোথায় যায়!

সাত.

দারিদ্র্য হ্রাস 'নীতি-কৌশলের দারিদ্র্য'; rent seeker ধনী নিয়ে গবেষণা জরুরি

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আবাসনের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি পরিবারের (অর্থাৎ মোট ১৫ কোটির মধ্যে ৫ কোটি মানুষের) নিজ মালিকানাধীন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এরা বাস করেন গ্রামে, শহরের বস্তিতে (অনেকেই ভাসমান), শিল্প এলাকায়, চরাঞ্চলে, শহরতলিতে ইত্যাদি। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিরসনে এসব মানুষের আবাসনের দারিদ্র্য যথাসম্ভব দ্রুত দূর করার কথা ভাবতে হবে। আবার সেই সাথে এ কথাও মনে রাখা জরুরি যে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ২০০৬-২০০৭ নাগাদ প্রায় সবারই নিজস্ব আবাসনের ব্যবস্থা হল ঠিক তার পরপরই ২০০৮ সালের দিকে rent seeking সিস্টেমের সাব-প্রাইম মর্টগেজের ঠেলায় নিচতলার কোটি কোটি মানুষ বাসস্থানহীন হয়ে পড়ল। অনেকেই চাকরিও হারালেন। ফলে একদিকে মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট হল আর অন্যদিকে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আগের তুলনায় বেড়ে গেল।[২৮]

দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা যে স্কুলে যেতে পারে না অথবা স্কুলে গেলেও কপালে জোটে অতি নিম্নমানের শিক্ষা অথবা শিক্ষাশেষের আগেই স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়– এ দারিদ্র্যের কী হবে? ভয়াবহ হলেও সত্য যে এদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র; মাদ্রাসাছাত্রদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান; মাদ্রাসা পাশকরা ছাত্রদের ৭৫ ভাগই বেকার থাকে– শিক্ষার এ দারিদ্র্যের কী হবে? শিক্ষা তো সাংবিধানিকভাবেই মানব-অধিকার– মানুষ তো জন্মসূত্রে এ অধিকার পায়। কিন্তু এত ঢাক-ঢোল পেটানোর পরে যখন বলা হয় যে বাংলাদেশে এখন প্রায় সবাই স্কুলে যায় তখন দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের কয়জন উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন? শুধু তাই-ই নয় দরিদ্র পরিবারের সৌভাগ্যবান কয়েকজন যারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ

পেয়ে থাকেন তারা সাধ্যাতীত কত ব্যয় করেন, কতধরনের প্রতিকূলতা পার হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমানের উচ্চশিক্ষা পান, পরবর্তী পর্যায়ে আরো কত ধরনের প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একটা চাকরি পান এবং তার পরে কোথায় কোন দুর্গম এলাকায় পোস্টিং পান– এ নিয়ে কে ভাবছেন? অবস্থা যা তাতে এভাবে সরাসরি এসব প্রশ্ন করাটা অনেকেই আমার আদবের অভাব মনে করতে পারেন। কিন্তু কথাটা তো সত্য। শ্রমজীবী-দরিদ্র পরিবারের কোনো একজন সদস্য-সদস্যার যদি এমন কোনো অসুখ হয় যখন অপারেশন করা এবং/অথবা ওষুধ কিনতে অনেক অর্থের প্রয়োজন তখন আসলে অবস্থাটা কী হয়? প্রথমেই যা করতে হয় তা হল পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং/অথবা সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ (যদি থেকে থাকে) একনিমেষে বিক্রি করতে হয় (যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন "দুর্দশাগ্রস্ততার কারণে সম্পদ বিক্রি", distress sale)। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার-দেনা করতে হয়। এ হচ্ছে অনেকটা "নদীভাঙ্গনে– একরাতে সব কিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার মত"। এরপর ওই মেহনতি মানুষটির কাজ থাকলেই কী না থাকলেই কী। 'স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি' যদি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংবিধানের এ বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়নে সরকার কী করছে/করে? ব্যাপারটি বেশ সোজাসাপ্টা। তা হল এ রকম যে যতদিন rent seeking পরজীবী বিত্তবান কালো টাকার মালিকেরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে ততোদিন এসবে কার্যকর তেমন কিছু হবে না। তারাই মালিক হবেন সেসব হাসপাতাল ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারের যেখানে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ মানুষ অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধ্য হবেন। কারণ এখানেও কাজ করে rent seeker-দের বাজার-সন্ত্রাস, যে সন্ত্রাসে সরকার ও রাজনীতি rent seeker-দের অধীনস্থ সহযোগী। তাহলে তথাকথিত উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল, আর ৬-৭ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে কী হবে? দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অথবা পরিবর্তনের কথা না ভেবে অর্থনীতির ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেই-বা কী? কার লাভ তাতে?

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে rent seeker-দের যে নিয়ামক ভূমিকা আর তার সাথে রাজনীতি ও সরকারের যে স্বার্থের আঁতাত এসবের কারণে আমার মনে হয় আমাদের নির্মোহভাবে জানা প্রয়োজন এদেশের মানুষ কেন ভিক্ষুক হয় (?); মানুষ কেন নিঃস্ব হয় (?); মানুষ কেন রিক্শা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ি চালায় (?); শিশুরা কেন কাওরানবাজারে টুকরির মধ্যে ঘুমায় (?); শিশুরা কেন রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যেতে বাধ্য হয় (?); তরতাজা যুবকরা কেন বেকার থাকে (?); মহিলারা কেন ইট ভাঙে (?); প্রবীণ জনগোষ্ঠী কেন এত দুর্দশায় ভোগেন (?) ইত্যাদি। আমার গবেষণায় আমি দেখেছি যে সখ করে কেউই ভিক্ষুক হয় না– আজকের পুরুষ ভিক্ষুকটি প্রথমে ছিলেন গ্রামের কৃষক অথবা দিনমজুর অথবা শিল্প-কারখানার শ্রমিক, তারপর শ্রম-ক্ষমতা হারিয়ে চালিয়েছেন রিক্শা, তারপরে হয়েছেন অসুস্থ, আর তারপরেই ভিক্ষুক, আর এখন অসুখ বেড়ে তিনি অকালমৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন। আর আজকের মহিলা ভিক্ষুকটি হয় ওই পুরুষ ভিক্ষুকের স্ত্রী অথবা গ্রাম থেকে আসা নিঃস্ব একজন মানুষ যিনি ঝি-এর কাজ করেছেন, তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছেন, আর এখন অসুস্থতা বেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এসব অকালমৃত্যুর দায়দায়িত্ব কার? এসব নিয়ে আমাদের পবিত্র সংবিধান কী

বলছে? এসব মানুষ নিয়ে আমাদের সরকারি 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল' কি কার্যকর কিছু ভাবছে? আসলে ভাবছে না। সম্ভবত rent seeking উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভাববারও কথা নয়। 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলেরই' এ এক মহাদারিদ্র্য। আমার মনে হয় কিছু মানুষ কেন, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় অঢেল সম্পদের মালিক হন তা-ও আবার সম্পদ সৃষ্টি না করে– তা জানলে দারিদ্র্য-বৈষম্যের কারণও অনেকদূর জানা যাবে। আসলে দারিদ্র্য নিয়ে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করছেন তাদের এখন rent seeker 'ধনী' নিয়ে গবেষণা জরুরি।

আট.

ধর্মভিত্তিক উগ্রতা ও মৌলবাদ: দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেখানে প্রধান কারণ

আগেই বলেছি যে কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা-উত্তর চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন-অসাম্প্রদায়িক মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে যেটা আগেই বলেছি যে গত চার দশকের বিকাশের ধারা ১৫ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে: প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যা-স্বল্প ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ২০ লক্ষ (যাদের বড় অংশই প্রকৃত পরজীবী rent seekers); আর দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাঁচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ২০ লক্ষ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশালসংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা অধিকার হিসেবে সমসুযোগ সৃষ্টি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, ক্ষমতাবান rent seekers-দের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অসমতার ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুবক-তরুণ) বা গোষ্ঠী 'মুক্তির পথে' সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেন? একই কথা তার জন্যেও প্রযোজ্য যিনি ভিন্ন ধর্মের বা বর্ণের মানুষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে বঞ্চনা-বৈষম্যসহ বর্ণবাদের অন্তর্নিহিত বিষয়

উপলব্ধি করে ধর্ম-ভিত্তিক জঙ্গি বোমারুতে রূপান্তরিত হন।

সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণে আমি ইতোমধ্যে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে আমাদের দেশে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত প্রায় ৭ দশকের (ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) rent seekers সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির লক্ষ্যে মানবকল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে; আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে[২৯]। আর এক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ধর্মভিত্তিক rent seeking আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শিক রাজনীতি-সরকার ও রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বার্থের ঐক্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরেফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালোটাকার স্বার্থবাহী সংসদ যারা নিজেরাই rent seeker অথবা তাদের প্রতিনিধি। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। যদিও কিছুটা পুনরাবৃত্তি হবে তথাপি আমাদের দেশে rent seeking-উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কয়েকটি নিদের্শক উল্লেখ করা প্রয়োজন: গত চার দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ২ লক্ষ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালোটাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জিভূত পরিমাণ হবে ৬-৮ লক্ষ কোটি টাকা), এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এরাই বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত, এরাই প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি, এরাই সবধরনের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাসজমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই সরকারের কাছে ৯ শত বিঘা জমির অনুমোদন নিয়ে ১০টি হাউজিং প্রকল্পের নামে ৩০ হাজার বিঘা জমি বিক্রি করার সুযোগ পায়; এরাই ড্যাপ জালিয়াতির মাধ্যমে ৫০ হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোনো সরকারি ক্রয়ে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) এবং/অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এবং/অথবা প্রকল্পে এদেরকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। এসব স্রেফ rent seeking। Rent seeking উদ্ভূত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যে রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করেছে তার বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী: অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয়

বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ২ কোটি টাকা থেকে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকারের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিস করেন (ব্যবসায়ী'রা ছিল ১৯৫৪-এর জাতীয় সংসদে ৪ শতাংশ আর এখনকার সংসদে ৮৪ শতাংশ, অবশ্য 'ব্যবসাটা' যে কী তা নির্বাচন কমিশনও সঠিক জানে না)। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই– এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।[৩০]

Rent seeking-উদ্ভূত প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন/হারিয়েছেন, আর মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির ধারা সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি/হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, চোখের সামনেই rent seeker-দের ঔদ্ধত্য দেখতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তিনির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তিনির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষিভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। আর সেটা ব্যবহার করতে তাদেরকেও অর্থনীতির rent seeking পদ্ধতিসহ সমস্বার্থের রাজনীতি, সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাদের মতো করে সাজাতে হচ্ছে।

ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত প্রয়োজন। আর এ প্রক্রিয়ায় ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে সেগুলো সবই প্রক্রিয়াগত ও মর্মগতভাবেই rent seeker-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যার মধ্যে ১২টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঔষধশিল্প ও স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাভাই-জাতীয় প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম, এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি)- এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেইসাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই-জাতীয় প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের

চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তাদের আছে। এখানে বলে রাখা জরুরি যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে' রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে তারা তাদের মতো করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট[৩১]। এ থেকে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগের অন্যতম উৎস হল ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা-অদৃষ্টবাদ। এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা 'সৃজনশীল' এবং 'আধুনিকতা'র ধারক-বাহকও।

এখানে উল্লেখ সমীচীন যে rent seeking-উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেমন মানুষের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি এ আবেগানুভূতি ব্যবহার করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে তারও ভিত্তি ওই rent seeking যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে যে মৌলবাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারও ভিত্তি যে rent seeking তার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমত মৌলবাদের অর্থনীতির মূল খাত-ক্ষেত্রগুলোই এমন যেখানে তুলনামূলক সহজেই rent seeking কর্মকাণ্ড পরিচালন সম্ভব। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম হল আর্থিক খাতের ব্যাংকিং, বীমা, লিজিং কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঔষধশিল্প ও ডায়াগোনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি-দালান-রিয়েল এস্টেট, অতি মুনাফাকারী প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন। দ্বিতীয়ত ধর্মের নামে হিসেব-পত্তর পদ্ধতি শরিয়াহ ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নানান ফাঁকি-জুকি যা rent seeking-এর নামান্তর মাত্রই শুধু নয় যা অতিরিক্ত rent seeking-এ সহায়ক। তৃতীয়ত তথাকথিত শরিয়াহ্-র নামে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনীতি ও সরকারকে ব্যবহার করে এমনসব কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে rent seeking-এর মধ্যেই পড়ে। চতুর্থত মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টির ফলে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কে এমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম যখন দেশে হরতাল-অবরোধে অর্থায়ন করে তারা বাজার-অর্থনীতির কালোবাজারি-মজুদদারি উস্কে দিয়ে বাজারসন্ত্রাসী ও মূল্যসন্ত্রাসী rent seeker-দের সহায়তা করে।

এখন আসা যাক মৌলবাদের অর্থনীতির কিছু হিসাবপত্তরে। বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ২,০০০ কোটি টাকা (২৫০ মিলিয়ন ডলার): এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি যেগুলো rent seeking-এর অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮ শতাংশ; ঔষধশিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ;

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ; সংবাদমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ; আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ। নিট মুনাফার এ প্যাটার্ন বেশ অনুমাননির্ভর হলেও যথেষ্ট দিকনির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেইসাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নিট মুনাফার যে ধারা দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথেও যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে ইতোমধ্যেই rent seeking নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যেহেতু প্রধানত rent seeking-উদ্ভূত এবং যেহেতু অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি rent seeking-এর শক্তিশালী প্রভাবক সেহেতু আরো কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণে বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এরকম: সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় কারণ তারা ইসলামের মূলমন্ত্র পরিত্যাগ করে 'অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া'-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে 'রাজনৈতিক মতাদর্শে' রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। অর্থাৎ মূলধারার rent seeking-এর মধ্যে ধর্ম-ব্যবহারভিত্তিক rent seeking শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম (অথবা এ সম্ভাবনার মাত্রা অত্যুচ্চ)।

যেহেতু বিষয়টি rent seeking-সংশ্লিষ্ট এবং একই সাথে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াস সেহেতু আরো একধাপ এগিয়ে সমাধান-সংশ্লিষ্ট দু'একটি বিষয় উল্লেখ জরুরি। মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিকাশমান ভিত্তিতে আমাদের দেশে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত নিশ্চিত যে "*এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে*"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে, আর তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্পমেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যে ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙে ফেলা যাবে না। আর ভিত্তিটি নিঃসন্দেহে দেশের ভিতরের (internal factors) দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ বহিঃস্থ উপাদান (external factors) সংশ্লিষ্ট। বাস্তবে যা সম্ভব তা হল '*ক্ষতি হ্রাসের কৌশল*' (damage minimizing strategy) দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল' হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা: (১) ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন– যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার– তাদের বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে এ বছরই ২০১৪ সালের মধ্যে)[৩২]। (২) জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা

আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা। (৩) জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ বন্ধ করা। (৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামাত-জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন ইত্যাদি। (৫) জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। (৬) বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, অসচ্ছল জীবন-যাপন করছেন, এবং পরবর্তীকালে যারা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ববরণসহ আহত হয়েছেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেয়া, সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা। (৭) জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। (৮) জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সাথে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৯) সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া এবং সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা। (১০) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা, এবং (১১) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে সিরিয়াস প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই জঙ্গিনির্মূল প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। আশু ও স্বল্পমেয়াদি এ কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি– তা হল দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই। এখানে যৌক্তিক প্রশ্ন একটাই– তা হল rent seeking কাঠামো যেখানে নিয়ামক আর তার সাথে প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বলতে কোন রাজনীতি বুঝব? আমি এ রাজনীতি বলতে rent seeking কাঠামোমুক্ত জনকল্যাণের রাজনীতি বুঝি যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিলোপে সহায়ক হবে। মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালীদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন এদেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র না হতে পারে; আর সে লক্ষ্যে মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত ১৯৭২-এর সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে, যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী rent seeking-উদ্ভূত এসব সুযোগের অভাবই দারিদ্র্য-

বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে হতাশা-নিরাশার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

নয়.

'সুশাসন'– অতি উচ্চারিত প্রপঞ্চ; 'সুশাসন' না'কি সর্বরোগের নিরাময়?

Rent seeking যখন সুশাসনে বাধা

ইদানীং খুব জোরেশোরে বলা হচ্ছে সুশাসন (good administration সহ good governance অর্থে) নিশ্চিত করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশ নিশ্চিত হয়ে যাবে; হ্রাস পাবে দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা। কিন্তু এমন হওয়া কি অস্বাভাবিক বা অবাস্তব যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি স্তরে-পর্যায়ে সুশাসন (অর্থ যাই হোক-না কেন) নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি dependent আর independent variable (চলক) সংশ্লিষ্ট। অন্য কথায় কারণ-পরিণাম সংশ্লিষ্ট। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়টি সম্ভবত এরকম যে সুশাসন যেমন উন্নয়নের পূর্বশর্ত তেমনি উন্নয়ন-বিকাশ সুশাসন-এর কার্যকর চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার মূল কারণ 'rent seeking' সিস্টেম জিইয়ে রেখে সুশাসন কিভাবে নিশ্চিত হবে? Rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের সমস্বার্থের ঐক্য জিইয়ে রেখে সুশাসন সম্ভব কি? সুশাসন বিষয়ে ভাবনার বিষয় হল শাসক হিসেবে আপনি কি শাসন করছেন সংবিধানের মূল বিধান 'জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক' মান্য করে; আপনি কি শাসন করছেন সংবিধানের বিধান মেনে যে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান, মানুষের সমমর্যাদাসহ সমসুযোগের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে না'কি rent seeker-দের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে? শাসক হিসেবে আপনার তো হবার কথা প্রজাতন্ত্রের সেবক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের মালিক– জনগণের সেবক। সেক্ষেত্রে দেখার বিষয় শাসক হিসেবে আপনি আসলে কী করছেন? 'দুর্নীতির' ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রশ্নাদি ও যুক্তির কথা আগেই উত্থাপন করেছি। সুশাসন অর্থাৎ good governance– এ প্রপঞ্চে আমার একটু অসুবিধা হয় এ জন্য যে তাহলে মেনে নিতে হয় যে governance এখন bad, না হলে 'good'-এর প্রসঙ্গ কেন? আমার ধারণায় 'bad' governance (কু-শাসন) বলে কিছু নেই, যা আছে তা হল 'governance' as a process, এবং যা কোনো স্থির-অনড় (static) ধারণা নয় ক্রম বিকাশমান, চলমান (dynamic) ধারণা। এ কথা বলছি এ জন্য যে যারা 'governed' হচ্ছেন তারা 'badly governed' হচ্ছেন বললে অবশ্যই চিন্তা-দুশ্চিন্তা প্রয়োজন। দুশ্চিন্তা বাড়ে তখনই যখন যারা শাসন (govern) করছেন তারা rent seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা। আর বাইরের কেউ এসে তার দৃষ্টিতে সবকিছু 'bad' বললে আমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়ে। আমার দুশ্চিন্তা বাড়ে যখন ওরা ইরাকের তেলসম্পদ দখলের লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদেরই সৃষ্ট সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্যে বলে 'Saddam is a bad dictator'– তাহলে 'dictator- good' হতে পারে? সমস্যা semantics-এর নয়, সমস্যা সম্ভবত আরো অনেক গভীরে। যারা দুনিয়ার জল-সম্পদ,

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আকাশ-মহাকাশ সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ একক মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের 'good-bad governance' এর সনদ প্রদান যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক, যে উদ্দেশ্যের সাথে আমার নিজের উন্নয়ন-ভাবনা মেলে না, মেলে না তাদের মতের governance সংশ্লিষ্ট ভাবনার সাথে আমার মত। আমার মতে আসল ব্যাপারটা হল একমেরুর বিশ্বায়নের যুগে 'global rent seeking' গোষ্ঠী সৃষ্টির মহোৎসব। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এদের সাথে আমার ধারণা মেলে না এ কারণেও যে তারা বলল অমুক রাষ্ট্র অকার্যকর (failed state) অথচ 'অকার্যকর' করল তারাই, অথবা স্ব-স্বার্থের প্রতিকূলতার কারণে তারাই তকমা লাগিয়ে দিল 'অকার্যকর' রাষ্ট্রের। সুশাসন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে এ নিয়ে যারা ভাবছেন তাদের অনুরোধ করব বিষয়টি নিয়ে সমগ্রতাসহ নোয়াম চমস্কির নির্মোহ-জ্ঞানদীপ্ত বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে যেখানে তিনি বৈশ্বিক শাসন-অপশাসনের সাথে rent seeker-দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন (অবশ্য এসব অপ্রিয় সত্য বলার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Establisment-এর কাছে তিনি ভয়ঙ্কর অপ্রিয়)।[৩৩] Normative অর্থে আসলে discipline নির্বিশেষে সবাই সম্ভবত শেষ পর্যন্ত ভাবতে চান গণকল্যাণ-গণসমৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি-বৈশিষ্ট্য-চরিত্র নিয়ে। আর এ অর্থে governance অথবা 'ভালো শাসন' (সু-শাসন) বিষয়টি সবারই ভাবনার লসাগু- 'common denominator' হতে পারে। আর জনগণের কল্যাণ-সমৃদ্ধি যদি কাম্য হয় সেক্ষেত্রে কী দেখলে বুঝব অর্থনৈতিক সুশাসন পিছিয়ে আছে অথবা এগিয়ে আছে? প্রচলিত ধারার অধিকাংশ গবেষকই মানদণ্ড হিসেবে এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় এবং/অথবা প্রবৃদ্ধির কথা বলেন। মাথাপিছু আয় বাড়লেই যে সুশাসন বিদ্যমান আমি এমনটি মনে করি না। এক্ষেত্রে সুশাসন কার্যকর বলে আমি তখনই মনে করব যখন দেখব যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বণ্টন-বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ আমার কাছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি যতটা- না সুশাসনের পরিমাপক তারচে' বেশি সঠিক পরিমাপক হলো বণ্টন-ব্যবস্থা বা বণ্টন ন্যায্যতা (distributive justice)। কারণ যে কোনো দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উত্তরোত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত রেখেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সম্ভব; মাথাপিছু আয় গড়ের ব্যাপার আর গড়ের মধ্যে ঢাকা পড়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থা। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী যদি ক্রমাগতভাবে দরিদ্র-বঞ্চিত থাকে এবং ক্রমাগত বৈষম্য ও অসাম্যের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সুশাসন অনুপস্থিত একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়; আরো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যখন উন্নয়নের খেরোখাতা বিশ্লেষণে দেখি জনগণের সংখ্যা-স্বল্প একটি অংশ সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা না রেখেই বিভিন্নভাবে অঢেল সম্পদের মালিক হচ্ছেন আর সম্পদ সৃষ্টিকারী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু অংশ তুলনামূলক পিছিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সুশাসনের মানদণ্ডগুলো কাজ করছে না অথবা অকার্যকর। আর এসবের সম্ভাব্য প্রধান কারণ হল সংখ্যা-স্বল্প স্বার্থগোষ্ঠীর অর্থাৎ rent seeker-দের সাথে শাসক-এজেন্টদের স্বার্থের অশুভ ঐক্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-বিকাশে সুশাসন নিয়ে ভাবনার আরো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগত কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম দিক হল:

বণ্টন-ন্যায্যতাসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন (*এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না– তা দিয়ে সুশাসন পরিমাপ করা জরুরি*); শিল্পায়ন: অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ আত্ম-কর্মসংস্থান; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার (*ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরিখে সুশাসন পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ড*); মজুরি ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (*সুশাসনের ভালো পরিমাপক*); অধিকতর ফলপ্রদ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, উৎপাদনশীল কৃষি; জনসংখ্যার জনশক্তিতে রূপান্তর-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি জ্ঞানসহ (*মানব উন্নয়নে সুশাসন পরিমাপক*); নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি (*সুশাসন পরিমাপনের অধিকার-ভিত্তিক ও লিঙ্গ-ভিত্তিক পরিমাপক*); জনকল্যাণকামী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (*জনগণের সুস্থ আয়ু-বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); সুসংগঠিত সামাজিক ইন্সুরেন্স সিস্টেম– সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, জনস্বাস্থ্য বীমা, শস্য বীমা ইত্যাদি (*জনকল্যাণ ও বৈষম্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট সুশাসন পরিমাপক*); উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ (*জন-সমৃদ্ধির নিরিখে সুশাসন পরিমাপনের অন্যতম নির্দেশক*); রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখীনতা (*সুশাসন পরিমাপনের সম্ভবত সবচে' কার্যকর পদ্ধতি*); এবং তথ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোত্তম সম্প্রসারিত ব্যবহার (*সুশাসন পরিমাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি*)।

যা বললাম এগুলো নেহায়েত 'ভালো কাজের' বা 'উপযোগী কাজের' তালিকা মাত্র নয়। এ সবই সেসব ক্ষেত্র যেগুলোকে বলা যেতে পারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বৃহৎবর্গের সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের খাত-ক্ষেত্র। আর আমাদের দেশের বাস্তবতা হল এসব খাত-ক্ষেত্রে সুশাসন প্রক্রিয়া পিছিয়ে আছে। শাসনপ্রক্রিয়া যখন rent seeker-দের স্বার্থ বাস্তবায়নে ব্যস্ত তখন তাই-ই হবার কথা। কিন্তু এগুনো দরকার। আর এগুচ্ছে কি'না তা বুঝা সম্ভব এসবের বাস্তব প্রক্রিয়া দিয়েই। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এসব চ্যালেঞ্জ আমার মতে মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিষয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আগে যা প্রয়োজন তা হল 'দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন' (home grown development philosophy) বিনির্মাণ। ধার করা কোনো দর্শন নয়; আবার ধ্রুপদী বা চিরায়ত দর্শন বিবর্জিত বিষয়ও নয়।

বিষয়টি রাজনৈতিক। বিষয়টি নেতৃত্বের– সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের যারা জনগণের অপার শক্তিতে আস্থা-বিশ্বাস রাখবেন; যারা যুক্তি ও বাস্তবতার বাইরে চিন্তা করবেন না; যারা সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করতে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক, যেখানে 3C Paradigm গুরুত্বপূর্ণ: Concern, Commitment, and Competence। এক্ষেত্রে সম্ভবত উল্লেখ করা সঙ্গতিপূর্ণ হবে যে ১৯৫০-এর দশকের দরিদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর কিভাবে আজকের আধুনিক সিঙ্গাপুরে রূপান্তরিত হল? এ প্রসঙ্গে আধুনিক সিঙ্গাপুরের বিনির্মাতা লি কুয়ান ইউ প্রণিধানযোগ্য যা বলেছেন তা হল– "*আমাদের সাফল্যের পিছনে যদি একক কোনো ফর্মুলা কাজ করে থাকে তবে সেটি হল: আমরা সবসময় গভীরে গিয়ে স্টাডি করার ও উপলব্ধির চেষ্টা করেছি অভিপ্রেত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হয়, কিংবা আরো ভালো করে বাস্তবায়ন করা যায়। আমি কখনও কোনো তত্ত্বের দাস হইনি।*

আমাকে পথ দেখিয়েছে যুক্তি (reasoning) ও বাস্তবতা (reality)। ...একটা অন্যায্য (unfair) ও অন্যায় (unjust) সমাজকে পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের মনের গভীরে প্রোথিত।... আমি বিশেষজ্ঞ ও আধা-বিশেষজ্ঞদের বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাডেমিকদের সমালোচনা ও উপদেশ এড়িয়ে চলতে শিখেছিলাম। সমাজকে কিভাবে এগুতে হবে বিশেষত দারিদ্র্য কিভাবে কমবে আর সমৃদ্ধি বাড়বে– এ নিয়ে তাদের সবারই মাথায় থাকে এক সুনির্দিষ্ট আগাম-তত্ত্ব। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি– সঠিক কাজটি করতে, রাজনৈতিকভাবে সঠিক কাজটি নয় (tried to be correct, not politically correct)"[৩৪]। সিঙ্গাপুরের সাফল্যের এসব ফর্মুলার কথা বলে লি কুয়ান ইউ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন– সভ্যতার ইতিহাস দেখায় যে অতীতে দ্বীপ-রাষ্ট্র টেকেনি ধ্বংস হয়ে গেছে; টিকবে কি সিঙ্গাপুর? তার নিজের উত্তর– সম্ভবত টিকবে। আর তার কারণ হিসেবে তিনি বলছেন *"পৃথিবীর নতুন বিভাজনটা হবে তাদের মধ্যে– যাদের জ্ঞান (knowledge অর্থে) আছে আর যাদের জ্ঞান নেই তা দিয়ে। আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষণ-অভিজ্ঞান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং জ্ঞান-ভিত্তিক পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হতে হবে। ...এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থ না হবার সম্ভাবনাটাই বেশি যদি আমরা ওইসব মৌলনীতি মেনে চলি যা আমাদের প্রগতিতে সহায়ক হয়েছে: প্রগতির ফলাফল ভাগাভাগির মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধন- ঐক্য-সংহতি নিশ্চিত করা, সবার জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করা, এবং মেধা-স্বীকৃতির লালনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ যোগ্য পুরুষ ও নারীকে যোগ্য স্থানে স্থাপন করা বিশেষত সরকারের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে"* (উৎস: প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬৩)। সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা ১০০ ভাগ অনুসরণ করতে হবে– আমি এ কথা বলছি না। তবে সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন-অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষণীয় বিষয়টি হল এরকম: ধার করা তত্ত্ব দিয়ে উন্নয়ন হবে না– উন্নয়ন তত্ত্ব হতে হবে দেশজ, হতে হবে তা নিজ দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ; উন্নয়নে অন্যায় ও অন্যায্য সমাজের ধনাত্মক রূপান্তর হতে হবে; উন্নয়নে দারিদ্র্য দূর ও বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি হতে হবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; উন্নয়নে সামাজিক ও জাতিগত মেলবন্ধন-ঐক্য-সংহতি নিশ্চিত করতে হবে; উন্নয়ন-উদ্দিষ্ট প্রকৃত জন-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে; আর এসব পরিচালনে চালকের আসনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদে থাকতে হবে সুদূর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-সমৃদ্ধ সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব (যা সুশাসন নিশ্চিতের অন্যতম প্রধান শর্ত)। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক জটিল (complex অর্থে) এবং শেষ বিচারে ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতির বিষয় নয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়। বিষয়টি স্পষ্টকরণে দুটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

প্রথম উদাহরণ: আমরা প্রায়শই সঠিকভাবেই বলে থাকি যে উন্নয়ন হল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত-বহিঃস্থদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় (অর্থাৎ inclusion of the excluded)। ধরুন উন্নয়নের এ রূপ বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে গ্রামের দরিদ্র

ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে খাস-জমি বিতরণ করা হবে (এ কর্মসূচি কিন্তু সরকারের উন্নয়ন নীতিকৌশলে আছে)। ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে ওই খাসজমি বিতরণও করা হলো (ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিসহ)। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে দেখা গেল যে খাস জমিরমালিক ওই ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের ৬০ শতাংশই অতীতের তুলনায় আরো নিঃস্ব হয়ে গেল। কারণ তিনি হয় জমির দখল পেলেন না অথবা ফসল কাটার সময় স্থানীয় মাতব্বর গোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হলেন এবং শেষ পর্যন্ত থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাচারি করে ওই জমির বাইরে তার নিজ মালিকানায় যে দু'টি গরু ছিল অথবা অন্য কিছু সম্পদ ছিল তা-ও বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। এটাকে বলা হয় 'বিরূপ অন্তর্ভুক্তি' বা adverse inclusion, আর এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তির জন্য যারা দায়ী তাদের ১০০ ভাগই rent seeker-দের বিভিন্ন গোষ্ঠী[৩৫]। এ বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটত না যদি অবস্থাটা এমন হত যে ওই কৃষকের জমি ধরে রাখার জন্য অনুকূল প্রশাসনিক-আইনি-বিচারিক-রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান থাকত, যদি ওই কৃষকটি অন্তত ৫ বছর ধরে ভর্তুকিমূল্যে কৃষিজ উপকরণ (সার, সেচ, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি) পেতেন, আর সেইসাথে পেতেন স্বল্প সুদে কৃষিঋণ ইত্যাদি। কিন্তু এসবের অনুপস্থিতিতে কৃষককে জমি দেবার পরেও তিনি নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য। সুশাসনের এ চ্যালেঞ্জ সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনীতির। আরো জটিল প্রশ্ন হল কাঠামোগত বিষয়, তা হল– মুক্তবাজার অর্থনীতি যা কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয় এবং দুর্বৃত্তায়িত rent seeker-দের অধীনস্থ সরকার ও রাজনীতি– এ ধরনের কাঠামোতে কি আমরা ভাবতে পারি যে ওই বিরূপ অন্তর্ভুক্তি ঘটবে না। এখানেই আমার মতে দেশের মাটি উত্থিত বা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) বিনির্মাণ ভাবনার অন্যতম যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ: এ উদাহরণটি তুলণামূলক সহজবোধ্য এবং অধিকাংশ মানুষের নিত্যদিনের জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট। ধরুন একজন দরিদ্র মেহনতি মানুষ অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আয় বাড়ল ১০ শতাংশ আর জীবনধারণের উপকরণের মূল্য বাড়ল ১৫ শতাংশ। নিঃসন্দেহে ওই মানুষটির জীবন-জীবিকায় টানাপোড়েন বেড়ে যাবে। ধরে নিচ্ছি রাষ্ট্র চাইবে ওই মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পাক। এক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে? হয় আয় ঠিক রেখে দ্রব্যমূল্য (জীবনধারণের অন্যান্য সকল উপকরণের মূল্যসহ) কমাতে হবে অথবা আয় বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে তুলনামূলক বাড়াতে হবে অথবা কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানোসহ অন্য কোনো ভারসাম্যকরণ নীতি-কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার ফলে মানুষের জীবন-মান প্রকৃত অর্থেই উন্নততর হয়। Rent seekers অধ্যুষিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কি এসব করার সক্ষমতা রাখে অথবা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক দর্শন কি এসবের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? আদৌ নয়। অতএব মানুষের আয় ও জীবন ধারণ উপকরণের মূল্যসংশ্লিষ্ট এ বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বলে মনে হলেও আসলে তা গভীরভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। এক্ষেত্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কাজটি আসলেই দেশের মাটি উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়। যে দর্শনের আওতায় rent seeker-দের সাথে

রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থ ভাঙতেই হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার আর একটি দিক হল individual human factor এবং ওই human being -এর অর্থনৈতিক জীবন। প্রসঙ্গটি যে মানুষ তা বাস্তবায়ন করবেন তার মনোজাগতিক দারিদ্র্য অথবা মননের দারিদ্র্য (mindset poverty) দূরীকরণ সংশ্লিষ্ট। নীতিনির্ধারণী পর্যায় হোক, নির্বাহী বিভাগ হোক, হোক বিচার বিভাগ, অথবা হোক তা বাস্তবায়ন পর্যায়ের ব্যক্তি– মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে আমরা কি পারব ব্যক্তিপর্যায়ে শুধুমাত্র নৈতিক প্রণোদনা (moral incentive) দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাঙ্ক্ষিত কাজটি সুসম্পন্ন করতে? নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ তবে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনা (material incentive) সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইতোমধ্যে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে ব্যক্তিপর্যায়ে বস্তুগত-আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষককে অভুক্ত অথবা আধাভুক্ত রেখে মানসম্পন্ন শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে না; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বল্প বেতন-ভাতা দিয়ে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; বিচারককে পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে সু-বিচার আশা করা ঠিক হবে না; প্রকৃত ব্যবসায়ীকে নিরন্তর ঘুষ-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করানো হলে সে ব্যবসার নামে অন্য অনেক কিছু করবে; কৃষককে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না দিলে অথবা কৃষি-মজুরকে স্বল্প মজুরি দিয়ে অভুক্ত রাখলে সে ফলপ্রদ শ্রম দিতে অপারগ হবে; শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দিলে সে ক্ষেপে গিয়ে যা করবে তা অন্যায় বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন এক ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক প্রণোদনার ভারসাম্য যা সুশাসন নিশ্চিত করবে এবং যা সুশাসন-উদ্ভূতও বটে। আর এসবই সম্ভব– এসব অসম্ভব কোনো প্রস্তাবনা নয়। আর এসব বাস্তবায়িত হলে সুশাসনের মাধ্যমে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র কাম্য-কাঙ্ক্ষিত রূপে বিকশিত হবে। এ বাস্তবায়ন আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে– তা মনে করলে ভুল হবে। বিষয়টি নেহায়েত অর্থনীতির বিষয় নয়, বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক। আর রাজনৈতিক-অর্থনীতির নিরিখে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্ভবত প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে দেশের মাটি থেকে উত্থিত-স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন (home grown development philosophy) বিনির্মাণ ও তা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থাকে rent seeker-দের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের– গণকল্যাণকামী রাজনীতির; সংবিধান ও ন্যায়বিধান সমুন্নত রাখার রাজনীতির।

দশ.

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনে বিশ্বায়নের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে? বৈশ্বিক rent seekers, বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকট: আমাদের উন্নয়নে নতুন ভাবনার সুযোগ

বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আর বৈশ্বিক rent seeking এসবের সাথে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো কার্যকারণ সম্পর্কে আছে কি'না? প্রশ্নটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত যৌক্তিক। প্রথমেই বলা উচিত হবে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দু'টো ধারা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ "globaphiles"-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আর দ্বিতীয় পক্ষ "globaphobes"

(globalization-এর কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে)–দের অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক গ্রুপ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা সেহেতু বিশ্বায়ন কিভাবে সবার জন্য বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপকারী হতে পারে তা ভাবা দরকার। অনেকের মধ্যে এ গ্রুপে দৃঢ় অবস্থান নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের। তিনি যা বলছেন তা এরকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; বিশ্বায়ন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে; বিশ্বায়ন-এর ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে; বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক (symbol) হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে উন্নত বিশ্বের শিল্পপণ্য উন্নয়নশীল দেশে অবাধে ঢুকবে অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সুতা-কৃষিজাত) অবাধে উন্নত বিশ্বে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud)। এসব কারণেই স্টিগলিজ বলছেন বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তা পরিবর্তিত না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেইসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে "institute a more humane process of globalization"-এর কথা)।[৩৬] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন "বিশ্বায়ন ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে।[৩৭]

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ বিশ্বায়ন নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। "দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক"(!)– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখন এসব নিয়ে মূলত দাতাদের পয়সায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বেশ বিদেশ যাচ্ছেন। দেশের দরিদ্র মানুষদের স্বার্থ উদ্ধারে দেশের ভিতরে কাজের চেয়ে বিদেশমুখিতা ইদানীং বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব করে কী লাভ/কার লাভ– বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য; তবে আগেই বলেছি 'বাজার দরিদ্রবান্ধব নয়' আর তা-ও যদি rent seeker-পরজীবীদের আদেশ-নির্দেশে তা চলতে বাধ্য হয়। অবাধ বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যেখানে অসম প্রতিযোগিতা মুখ্য বিষয়, non-level playing field) প্রায়শই শুনি যে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে 'অবাধে' অন্যদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির সুযোগ দিলে এ দেশের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির কথা বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন দেখি প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরতাজা একজন যুবক জমি-জমা-সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২ বছরের চুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে রাত-দিন পরিশ্রম করে

২ বছরে মোট ১০ লক্ষ টাকা (এটা আনুমানিক গড়; অনেকের ক্ষেত্রেই ৫-৭ লক্ষ টাকা) আয় করেন তখন দারিদ্র্য দূর হল কোথায়? একটি সহজ হিসাব দিই। যা থেকে অন্তত অনুমান করা সম্ভব হবে যে সম্পূর্ণ বিষয়টি আদৌ তত সরল-সোজাসাপ্টা নয়। আমাদের ওই যুবকটির বিনিয়োগ ধরলাম ৩ লক্ষ টাকা ২ বছরের জন্য এবং বিনিয়োগের প্রধান উৎস গ্রামে তার পরিবারের যতটুকু জমি ছিল সেটা বিক্রি করা (নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্তের আর কিছু থাকার কথা নয়)। যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে আধা-দক্ষ অথবা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করে দিনরাত পরিশ্রম করে ২ বছরে মোট আয় করলেন ১০ লাখ টাকা অর্থাৎ ২ বছরে নিট প্রাপ্তি (১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে ৩ লক্ষ টাকা) ৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা। ধরলাম থাকা-খাওয়া-পোশাক পরিচ্ছদ-পরিবহন-বিনোদন বাবদ তার মাসে গড় ব্যয় ১৪ হাজার টাকা। তাহলে তার মাসিক নিট সঞ্চয় হতে পারে বড়জোর (৩০,০০০ টাকা বিনিয়োগে বিয়োগ ১৪,০০০ টাকা নিট সঞ্চয়) ১৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ ২ বছরে নিট সঞ্চয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। সহজ এই পাটিগণিত থেকে কেউ বলতে পারেন যে ২ বছরে ওই যুবকের নিট লাভ ১ লক্ষ টাকা (৪ লক্ষ টাকা নিট সঞ্চয় বিয়োগ বিনিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা)। আসলে এটা বোকার পাটিগণিত। প্রকৃত অর্থে ওই যুবকের তথাকথিত 'অবাধ' শ্রমের চলাচলের ফল সম্পূর্ণ উল্টো এবং মারাত্মক ভয়াবহ। কারণ মাঝখান দিয়ে যা যা ঘটে গেল তা এরকম:

প্রথমত, ২ বছর আগে ওই যুবকটি তার পরিবারের যে শেষসম্বল জমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হল ২ বছর পরে তার বাজারমূল্য নিশ্চয়ই ১.৫-২ গুণ বেড়েছে অর্থাৎ ৩ লক্ষ টাকায় বিক্রিত জমির ২ বছর পরের বাজারমূল্য হবে ৪.৫ লক্ষ টাকা থেকে ৬ লক্ষ টাকা। যা ২ বছরে তার নিট সঞ্চয় এর থেকে কম (অথবা ধরুন সমান)।

দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার পক্ষে ওই জমির পুনঃক্রয় অথবা সমপরিমাণ জমি ক্রয় সম্ভব নয় (এর কারণ পরের পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তৃতীয়ত, তার মাসিক নিট সঞ্চয় ১৬ হাজার টাকার সম্ভবত প্রায় পুরোটাই তাকে দেশে পাঠাতে হয়েছে (যাকে বড়াই করে আমরা রেমিটেন্স আয় বলি) মূলত পারিবারিক পরিভোগ ব্যয় মিটানোর জন্য যা নতুন কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না (হতে পারে পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয় মানব পুঁজি গঠনে সহায়ক হয়েছে)। অনেক ক্ষেত্রেই এ অঙ্কের একাংশ ধার-দেনা পরিশোধে ব্যয় করতে হয় (যদি বিদেশ যাবার আগে দেনা থাকে)।

চতুর্থত, পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কষ্ট-মূল্য কত? এ কষ্ট-মূল্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করলে অবস্থা আরো অমানবিক ও ভয়াবহ হতে বাধ্য। এসবে সামাজিক ক্ষতির মান-পরিমাণ কত?

পঞ্চমত, আমাদের দেশের অর্থনীতি ওই যুবকটির শ্রম-সেবা থেকে বঞ্চিত হল। সেটারই-বা অর্থ ও সামাজিক মূল্য কত? (অনেকেই হাহুতাশ করে বলবেন– বেচারা বেকার বিদেশে গিয়ে ভালোই করেছে)।

ষষ্ঠত, বিদেশ যাবার আগে দেশগ্রামে যার কাছে জমি বিক্রি করল ক্রেতাটি নিঃসন্দেহে একজন rent seeker। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী সম্পদ অর্থাৎ কৃষিজমি অধিকহারে পুঞ্জিভূত হল গ্রামীণ rent seeker-এর হাতে, যিনি অধিকতর জমি মালিকানার rent seeker হবার কারণে ক্ষমতাকাঠামোতে (অর্থাৎ রাজনীতি ও সরকারে) আগের চেয়ে বেশি দাপটবান হলেন। যেটা গ্রামীণ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিতে যোগ হল।

সপ্তমত, মধ্যপ্রাচ্যের মালিকটি স্বল্প মজুরির শ্রমে যা বানানোর বানিয়ে ফেললেন এবং এ প্রক্রিয়ায় মালিক যেহেতু সম্পদ সৃষ্টিতে নিজে শ্রম দেননি সেহেতু তিনিও শুধু rent seeker নন সেই সাথে উত্তরোত্তর আরো বড় মাপের rent seeker-এ পরিণত হলেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে rent seeker-রাই শক্তিশালী হল আর একই সাথে আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়তে থাকল।

আসলে এসব করে যা হল তাকে এভাবে বলা চলে "আমাদের ওই যুবকটি মধ্যপ্রাচ্যে ৩ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করল যার রিটার্ন আসলে নেগেটিভ" অর্থাৎ "মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করলাম যার নেট রিটার্ন পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য"। এ তো সম্পদ হাতছাড়া হবার এক নতুন পদ্ধতি মাত্র (net drain of resources)। এটা 'zero sum game' তো নয়ই বরঞ্চ 'negative sum game' (বিষয়টি আগে ব্যাখ্যা করেছি)। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের পদ্ধতি হিসেবে বিদেশে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে, উচ্চ মজুরি নিয়ে, কর্ম পরিবেশ নিয়ে, দরকষাকষির অধিকার নিয়ে, দেশে ফেরত আসার পরে কর্মসংস্থান নিয়ে, আর ভাবতে হবে এ প্রক্রিয়া যেন rent seeking-কে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে তার পথ-পদ্ধতি নিয়ে। সরকারকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এ খাত থেকে সরকার বছরে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা পাচ্ছেন (যা একক খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন)। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে আমরা কি এ বিবেচনা মাথায় রাখতে পারি যে এখন থেকে ২০ বছর পরে ইউরোপে ২ কোটি বিদেশি দক্ষ শ্রমশক্তি দরকার হবে; স্বদেশের উন্নয়নের জন্য মানবশক্তি পরিকল্পনা জরুরি; প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি পরিকল্পিতভাবে বিদেশে পাঠালে অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে; আর দাতাদের অর্থে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রিক সভা-সমিতিতে অযথা বিদেশ না গেলে কী ক্ষতি, কার ক্ষতি (?)।

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারীকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয় সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন-গুরুরা এ প্রশ্নটি ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৬]। পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প ট্যারিফের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার

শর্তে অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্মপরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলব, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাব– অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্মপরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আসলেই নেই বললেই চলে। এখন আসা যাক ওই প্রশ্নে যা ধনীদেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সহজ: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কী হবে? কেমন রূপ নেবে? সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তাই-ই যদি হয় তা হলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে: তোমাদের মজুরি ভালো দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভালো স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি নেয়াই হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন বর্তমান বিশ্বটা এরকম নয়, এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের rent seeker ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭)।

বিশ্বায়ন যেখানে বাস্তবতা সেখানে বৈশ্বিক-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞান ও সে অনুযায়ী নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিপ্রবাহ আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয় অন্যদের comparative-disadvantage (তুলনামূলক অসুবিধে)-গুলো বুঝা দরকার এবং সেসবে আমাদের comparative advantage (তুলনামূলক সুবিধে) থাকলে তা বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়া দরকার। আর এ কর্মকাণ্ড টি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট; সচেতন পরিকল্পনা-নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট। এবং এ কাজটি কোনো অর্থেই rent seeker রাজনীতি ও সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়।

বেশ জোর দিয়েই এখন বলা যায় যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলছে টালমাটাল অবস্থা; 'বাণিজ্য চক্রে' (business cycle) মন্দাবস্থা প্রলম্বিত হচ্ছে; ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ সহজ নয়। বিশ্ব অর্থনীতি ২০০৮-০৯-এর বৈশ্বিক মন্দার পর থেকে মন্দা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই– অনেকের মতে– আরো বড় মাপের, গভীর এবং সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদের মন্দার দিকে যাচ্ছে। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহারকারী ১৭টি দেশ নিয়ে যে ইউরোজোন তা আবারও মন্দার দিকে ধাবমান। ইউরোপের সার্বভৌম ঋণ সংকট (sovereign debt crisis) বিশ্বঅর্থনীতির স্থিতিশীলতার বড় বাধা। গ্রিস থেকে সংকট শুরু হয়ে অর্থাৎ 'প্রান্তস্থ সার্বভৌম' (peripheral sovereign) থেকে এখন তা কেন্দ্রের দিকে (অর্থাৎ core countries) যেমন জার্মানি ও ফ্রান্সের দিকে ধাবমান। বৈশ্বিক অর্থনীতির আর্থিক সংকট, মন্থর গতি, আর ইউরোপের ঋণসংকট– সব মিলিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যের গতি মন্থর হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২০০৮-০৯ -এর মন্দা থেকে এখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। পারছে না। কবে নাগাদ পারবে তা-ও অজানা। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ব্যয় কমছে, প্রবৃদ্ধি কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে চাহিদার সংকোচন। এসব অর্থনীতি

যেহেতু আমাদের প্রধান রপ্তানিবাজার সেহেতু সংগত কারণেই আমাদের রপ্তানিকারকেরা উদ্বিগ্ন অর্থাৎ ভবিষ্যতে রপ্তানিবাজারের বৈচিত্র্য এবং একই সাথে নতুন গন্তব্য নিয়ে ভাবতে হবে। অতএব যা দাঁড়াচ্ছে তা হল একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপে চাহিদা-সংকোচনের অভিঘাত নিয়ে ভাবতে হবে, আবার একই সাথে আমাদের দেশের ১৫ কোটি মানুষের অভ্যন্তরীণ বাজার (domestic market) কী ভাবে আরো বিকশিত করা যায়– সেটা আরো বেশি ভাবতে হবে। কারণ আমরা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করার কথা ভাবছি। অন্যদিকে অগ্রসর উদীয়মান অর্থনীতি অর্থাৎ BRICS– ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা– যারা কয়েক বছর সজোরে ছুটছিল তাদের ছোটার গতি কমে যাচ্ছে। সবারই প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। অর্থাৎ আপাতত BRICS-এর বাজার ধরা কঠিন। পাশাপাশি বিশ্ববাজারে বিভিন্ন কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের দামে অস্থিরতা (volatility) দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়া নিয়ে নতুন উদ্বেগ। যুক্তরাষ্ট্রের খরা খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়াবে। অনেকের মতে বিশ্ব ২০০৭-০৮ -এর মতো একটা খাদ্যসংকটের দিকে এগুচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। 'মধ্যপ্রাচ্যের বসন্ত' এখন অনেকের জন্যই মরা কার্তিক। লিবিয়া ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ – জনশক্তি রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইরানের নিউক্লিয়ার সংকট-উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবরোধ-এর প্রভাবও নেতিবাচক। সব মিলিয়ে বিশ্বঅর্থনীতিতে বড় মাপের অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা, টানাপোড়েন অবস্থা প্রক্ষেপণ করা যায়। যা আপাতত আশা সঞ্চারকারী কোনো বার্তা দেয় না।

এই-ই যখন বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট তখন আমাদের যা করতে হবে তা হল বুঝতে হবে চিরাচরিত-প্রচলিত (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ওই পথে হেঁটে লাভ হবে না। আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো (যা পরের অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে) rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সেদেশে দারিদ্র-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে। সুতরাং সবকিছু বিবেচনায় আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদেরকে *নতুন ভাবনা* ভাবতে হবে। *নতুন ভাবনার* ক্ষেত্র হতে পারে নিম্নরূপ (অন্যান্য অনেক রূপের মধ্যে):[৩৯]

১. আমাদের ভাবতে হবে সম্পদের নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে; সম্পদ সৃষ্টি, পুনঃসৃষ্টি ও ব্যবহারের নতুন ভাবনা ভাবতে হবে। সম্পদ বলতে আমি বুঝাচ্ছি মানবসম্পদ (১৫ কোটি মানুষ যা অদূর ভবিষ্যতে ২০ কোটিতে দাঁড়াবে– এ 'সংখ্যাকে' সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে), প্রাকৃতিক সম্পদ (অর্থাৎ মাটির উপরের ও তলার সম্পদ, পানির মধ্যে এবং পানির নিচের সম্পদ, আকাশ-বাতাস-মহাকাশ সম্পদ), ভৌতসম্পদ (অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের অবকাঠামো)।

২. মানুষ যেহেতু খাদ্য-খাবার খাবেই, যেহেতু খাদ্যচাহিদা বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে/বাড়বে, এবং যেহেতু কৃষিতে আমাদের নিরঙ্কুশ তুলনামূলক সুবিধে (absolute comparative advantage) আছে, সেহেতু নতুন ভাবনা দরকার কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পবিকাশ নিয়ে– যাতে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টিচাহিদা

মেটানোর পাশাপাশি আমরা যেন খাদ্য নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারি। এক্ষেত্রে নতুন ভাবনা ভাবতে হবে আমাদের জমি-জলা-জঙ্গল-জনমানুষ নিয়ে আর সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে। জমি-জলা-জঙ্গল ভাবনাটি হবে মৌলিক কৃষি-ভূমি সংস্কারের ভাবনা যা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা অনেক হ্রাস পাবে।

৩. নতুন করে ভাবতে হবে অন্যদের তুলনামূলক অসুবিধেগুলো বিবেচনায় এনে আমাদের তুলনামূলক সুবিধেগুলো কিভাবে টেকসইভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় নেয়া যায় সে সম্পর্কে।
৪. ভাবতে হবে শ্রমশক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি নিয়ে।

৫. ভাবতে হবে প্রাকৃতিক তন্তু পাট-অর্থনীতির বিকাশ নিয়ে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির সংকটকালীন গতিপ্রবাহসহ বিশ্বায়নের যে চিত্র উত্থাপন করলাম সেসবের ভিত্তিতে এ কথা বলা সম্ভব যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাসের এবং সত্যিকার মানব-উন্নয়ন নিশ্চিত করার সম্ভাবনা আমাদের অঢেল। প্রয়োজন দেশজ উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন, ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং এসবের নির্মোহ বাস্তবায়ন। বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক।

এগার.
মানুষে-মানুষে অসাম্য কেন হয়, কিভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা

মানুষে-মানুষে অসমতা-অসাম্য (inequality অর্থে) কেন হয়, কিভাবে হয়, আর তার পরিণাম কি হয়। এতক্ষণ সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে আমি আমাদের দেশের কথা বললাম– যে দেশটিকে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দরিদ্র ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু একই প্রশ্ন যদি পৃথিবীর সবচে' ধনী, সবচে' ক্ষমতাধর বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে কারণ-পরিণামসহ সমগ্র চিত্রটি কেমন হবে? বিষয়টি জানা জরুরি। অনেক কারণেই। তবে এক্ষেত্রে আমার মতে প্রধান কারণ হল এই যে এমন প্রয়াস নেয়া উচিত হবে না যা তথাকথিত উন্নয়নের নামে বৈষম্য-অসমতা সংশ্লিষ্ট একই ফল প্রসব করবে– ফলের সাইজ যাই হোক-না কেন। এ কোনো কাম্য অবস্থা হতে পারে না। আর এ বিষয়ে আমি অন্যান্যদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি মাত্রায় ব্যবহার করব সদ্যপ্রকাশিত নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের গবেষণাগ্রন্থে[৪০] প্রদেয় বক্তব্য-বিশ্লেষণ। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন "সারা পৃথিবীতেই এখন প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় হল ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity)" (পৃ. ix)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিউ জরিপে ৮৭ শতাংশ মানুষ বলেছেন "আমাদের সমাজকে সেটাই করতে হবে যার ফলে প্রতিটি মানুষ যেন তার বিকাশের-উন্নতির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান" (পৃ. xi)। এরপর আরো সিরিয়াস কথা যা তিনি বললেন তা হল

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ধনী মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ সমগ্র দেশের মোট পুঞ্জিভূত বিত্তের (wealth অর্থে) ৬৭ শতাংশের মালিক (পৃ. xi)। আর জেফরি স্যাকস বলছেন "আজকের আমেরিকার সর্বোচ্চ ধনী, যারা জনসংখ্যার ১ শতাংশ তাদের মোট নেট ওয়ার্থ-এর পরিমাণ জনসংখ্যার নিচতলায় অবস্থিত ৯০ শতাংশের মোট নেট ওয়ার্থের চেয়ে বেশি; এবং সর্বোচ্চ আয়কারী ১ শতাংশের ট্যাকস-পূর্ব আয় নিচের ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি।[৪১] একই ধরনের বক্তব্য নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রগম্যানেরও।[৪২] আর নোয়াম চমস্কি বলছেন "আয়, সম্পত্তি, পুঁজি, শিক্ষা ব্যয়, দারিদ্র্যের মাত্রা– এসব মানদণ্ডেই পশ্চিমা বিশ্বে সর্বোচ্চ সামাজিক বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে"। [৪৩]

স্টিগলিজ দেখিয়েছেন আমেরিকায় আয় ও বিত্তে (wealth অর্থে)-র মানদণ্ডে অসমতা-বৈষম্য সবচে' বেশি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যখাতে উন্নতির ফলে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ২ বছর, কিন্তু একই সময়ে দরিদ্র মানুষের গড় আয়ু বাড়েনি, আর দরিদ্র নারীদের গড় আয়ু আসলে কমেছে" (পৃ. xiii)।

মার্কিন সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতার প্রতিবাদে "ওয়াল স্ট্রিট দখল করো" (Occupy Wall Street) আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের শ্লোগান ছিল "We are the 99 percent"। এ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে ক্রমবর্ধমান এ অসমতা-বৈষম্য উপলব্ধি করে স্টিগলিজ একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম "Of the 1%, for the 1%, by the 1%"। আর ওয়াল স্ট্রিট দখল করো আন্দোলনকে তিনি "সামাজিক সংহতি থেকে শ্রেণি-যুদ্ধ" হিসেবে অভিহিত করেন (পৃ. xlvi)। স্টিগলিজ মূল কথা যা বলেছেন তা এরকম (মোটামুটি তার ইংরেজির ভাষান্তর): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বাড়ছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক সিস্টেম বিত্তকাঠামোর উপরতলার ১ শতাংশ ধনীদের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে (পৃ. xxxix); দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিনি ওই প্রতিবাদ সমর্থন করেছে (পৃ. xliv); এমনকি আন্দোলনকারীদের জনসভায় বাধাদানকারী পুলিশরাও আন্দোলনকারীদেরকেই সমর্থন করেছে (পৃ. xliv)। আর সামাজিক সংহতির শ্রেণিযুদ্ধে রূপান্তরের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টিগলিজ বলছেন "বহুবছর ধরে আমাদের দেশে সমাজের উঁচুতলার সাথে নিচতলার এক ধরনের চুক্তি ছিল, চুক্তিটা এরকম: (উঁচুতলা বলছে) আমরা তোমাদের কাজ-কর্মসংস্থান দেব এবং সমৃদ্ধি (prosperity অর্থে) দেব, আর বিনিময়ে তোমরা (নিচতলার মানুষেরা) আমাদের সুযোগ করে দেবে যেন আমরা আমাদের *বোনাসটা* নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারি। ধনীদের সাথে জনগণের ব্যাপকাংশের এই চুক্তিটি সবসময়ই ছিল ভঙ্গুর-নড়বড়ে। উঁচুতলার ধনীরা– যারা দেশের মাত্র ১ শতাংশ মানুষ– সবসময়ই যথারীতি তাদের বোনাস নিয়ে হাঁটা দিয়েছে আর বিনিময়ে ৯৯ শতাংশ মানুষকে উপহার দিয়েছে দুশ্চিন্তা আর নিরাপত্তাহীনতা। দেশের প্রবৃদ্ধি থেকে বেশির ভাগ মানুষ উপকৃত হয়নি" (পৃ. xlvi- xlvii)।

জোসেফ স্টিগলিজ-এর ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসটা এরকম: ধনীরা আরো ধনী হচ্ছেন, ধনীদের মধ্যে যারা সবচে' ধনী তারা আরো বেশি ধনী হচ্ছেন,

গরিবরা আরো গরিব হচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে, আর মধ্যবিত্তরা ফাঁপা অবস্থায় কাটাচ্ছেন-সংকুচিত হচ্ছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয় হয় অপরিবর্তিত আছে অথবা কমছে, এবং তাদের সাথে ধনীদের ব্যবধান প্রকৃত অর্থেই বাড়ছে (পৃ. ৯)। এ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্টিগলিজ অন্যত্র বলেছেন "আমেরিকানরা সবসময় শ্রেণি-বিশ্লেষণ (class analysis অর্থে) এড়িয়ে বলতে চেয়েছে আমরা মধ্যবিত্ত" (পৃ. xlvi); "কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নিচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে উঠবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা পুরাতন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ" (পৃ. xlvi)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিত্ত-বণ্টনে (wealth distribution) অসমতা আয়ের অসমতার চেয়ে বেশি। সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক (পৃ. ২)। ২০০২-২০০৭ সময়কালে ওই ১ শতাংশ বিত্তশালীদের মালিকানায় ছিল মোট জাতীয় আয়ের ৬৫ শতাংশ (৬০ বছর আগে যেটা ছিল ১২ শতাংশ, পৃ. ৫), আর একই সময়ে জাতীয় আয়ে নিচেরতলার মানুষের হিস্যা অনেক কমেছে। প্রশ্ন হল ধনীরা যদি আরো ধনী হত আর সেইসাথে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হত তা হলে ভালো হত, কিন্তু তা হয়নি– বলছেন স্টিগলিজ (পৃ. ৩)। এসবের ফল কী হয়েছে? তিনি বলছেন: দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা এবং শিক্ষা ও সামাজিকসহ অন্যান্য খাতে দীর্ঘদিন স্বল্পমাত্রার সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের ফল হয়েছে যথেষ্ট অশুভ। যেমন বেড়েছে অপরাধের মাত্রা; জনসংখ্যার বেশ বড় অংশের কারাবাস (২৩ লক্ষ মানুষ জেলখানায় আছেন); পৃথিবীর সর্বোচ্চ কারাবাস হার (প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন জেলখানায়); এমনকি কোনো কোনো রাজ্যে জেলখানার বাজেট ওই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মিলিত বাজেটের চেয়ে বেশি। প্রধানত ক্রমবর্ধমান অসমতার কারণে জেলখানার এ ব্যয় হয়তো অপরাধ দমনের কাজে লাগে এবং তা মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) হিসেবে দেখানো হয় কিন্তু তা কোনো অর্থেই মার্কিনিদের জীবনসমৃদ্ধির লক্ষণ নয় (পৃ. ১৯)।

এসবে বাজার অর্থনীতির দোষ কোথায়? স্টিগলিজই বলছেন "বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোনো নৈতিক চরিত্র। .... বাজার একদিকে পারে বিত্ত-সম্পদ কিছু মানুষের হাতে তুলে দিতে, আর সেই সাথে পারে পরিবেশগত বিপর্যয়ের দায়ভার জনগণের কাঁধে তুলে দিতে এবং মেহনতি মানুষ ও ভোক্তাদের প্রতারিত করতে। সম্ভবত এসব কারণেই বাজারের উপর রাষ্ট্রের কাট-ছাঁট-নিয়ন্ত্রণ-এর প্রশ্ন এসে যায়। তারপরেও বাজার অর্থনীতি– এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য"– বলছেন স্টিগলিজ (পৃ. xlii-xliii)।

আসলে ধনীদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টির উৎস আরো গভীরে প্রোথিত এবং বাজার একমাত্র উৎস নয়, এর সাথে আছে সমস্বার্থের রাজনীতি ও সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে উপরের তলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে বিত্ত-বৈভব পুঞ্জিভূত হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে একচেটিয়া মুনাফা (যেখানে সরকার ও রাজনীতির ভূমিকাই মুখ্য), আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অত্যুচ্চ বেতন-ভাতাসহ 'rent seeking'

(অনুপার্জিত আয় অথবা ভোগদখলকৃত সম্পত্তির আয় ইত্যাদি)-এর বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে। আর এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে নোয়াম চমস্কি বলছেন "ওয়াশিংটনে ২০০০-২০০৫-এ পাঁচ বছরে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। আর তাদের ক্লায়েন্টপ্রতি চার্জ বেড়েছে দ্বিগুণ। ওয়াশিংটনে রেজিস্টার্ড লবিস্টদের সংখ্যা ৩৪,৭৫০ জন যাদের কাজ ফেডারেল সরকারের ব্যয়ের বড় অংশ লুণ্ঠনে rent seek-দের সহায়তা করা[৪৪]। অর্থাৎ 'rent seeking' এখানে মুখ্য বিষয় (যে বিষয়ে প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বৃদ্ধিতে সরকার আর রাজনীতির প্রভাবকি ভূমিকাটা কী? যুক্তরাষ্ট্রে উঁচুতলার ১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ উঁচুতলার ০.১ শতাংশের হয়েছে অত্যুচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং একই সাথে নিচতলায় দারিদ্র্য বৃদ্ধি। এসবই হয়েছে আমেরিকার সরকারি নীতির কারণেই যার মধ্যে আছে স্বল্প-প্রগ্রেসিভ কর পদ্ধতি; দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ও সামাজিক সুরক্ষা; এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি যেখানে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জন নির্ভর করে তার পিতা-মাতা-অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক সামর্থ্যের উপর; ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বল ভূমিকা এবং ব্যাংকসহ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় অতি ভূমিকার উপর বিশেষত প্রেসিডেন্ট রেগানের সময় সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা উঠিয়ে নেবার পরে (অর্থাৎ deregulation-এর পরে; পৃ. xxxii; বিষয়টি পল ক্রগম্যানও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন; দেখুন প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫)। অর্থাৎ ব্যাপারটি এরকম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা ক্রমবর্ধমান। কারণটি জোসেফ স্টিগলিজ আরো যেভাবে বলেছেন তা হল: পুঁজিবাদ যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা দিতে পারেনি, আর যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে– অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব, এবং (সবচে' গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়াবস্থা যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না। ... এসবের দায় দায়িত্ব রাজনীতির এবং সরকারের। রাজনীতি বাজারের চেহারা এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছে যা নিচের তলার মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে উপরেরতলার স্বার্থ রক্ষা করবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারকে ব্যবহার করে তদনুযায়ী আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করবে।[৪৫]... আমাদের বাজেট, মুদ্রানীতি, এমনকি বিচারালয়কেও এমনভাবে চালিত করবে যার ফলে সমাজে অসমতা শুধু চিরস্থায়ী হবে না তা বাড়তেই থাকবে (পৃ. l)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে উপযোগী হবে বিধায় মূল কথাটি আবারো বলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য-অসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে; মনুষ্যসৃষ্ট। বাজারশক্তি এসবে ভূমিকা রেখেছে, তবে বাজার একা নয়। অসমতার উচ্চমাত্রা যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে বাজারের সেই শক্তিকে গড়ে দিয়েছে সরকারি নীতি-দর্শন (government policies)। মূল বিষয় হল– সরকার কী করেছে

এবং সরকার কী করেনি? সরকার আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে– এসবে স্বার্থ দেখেছে উপরতলার ধনিক ১ শতাংশের। আর এসব আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে উপরতলার ওই ১ শতাংশ ধনীরাই মনোনীত করেছেন তাদের

স্বার্থবাহী এজেন্টদের। এর সাথে আছে এমন এক রাজনৈতিক সিস্টেম যেখানে ওই ১ শতাংশের আছে অসীম ক্ষমতা-প্রভাব। ওই রাজনৈতিক সিস্টেমই বাতলে দেয় কী করে, কোন পথ-পদ্ধতিতে নিচতলার মানুষের টাকা-পয়সা-সম্পদ-সম্পত্তি উপহার হিসেবে নির্বিঘ্নে উপরতলায় পৌঁছে যাবে– যাকে বলে rent seeking অর্থাৎ সম্পদ *সৃষ্টির* পুরস্কার হিসেবে নয় বিত্ত-সম্পদের বড় শেয়ার জোরদখল করে আরো ধনী হওয়া" (পৃ. ৩৫-৩৮)।

তাহলে নিস্তার কোথায়? এক্ষেত্রে নোবেলবিজয়ী জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যানসহ অনেকেই একই রকম আশা-নিরাশার কথাও বলছেন। দুইহাত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে স্টিগলিজ বলছেন: "সমতা সৃষ্টির সুযোগের অভাবের অত্যুচ্চ মাত্রা দেখে মনে হয় ভবিষ্যত অন্ধকার; আবার অন্যদিকে দেখি আর্থ-সামাজিক নীতি-দর্শনে অর্থনীতির সাথে রাজনীতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus অর্থে) অঙ্গাঙ্গি– সে কারণেই প্রশ্ন– জনকল্যাণকামী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিনির্মাণ ও তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি'না?... এ কথা তো যুক্তিসঙ্গত যে বৈষম্য-অসমতা যদি দূর করা যায় এবং সেইসাথে সুযোগের সমতা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তো আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, গণতন্ত্র সবই উপকৃত হবে" (পৃ. xxxiv)। বসবাস আর বেড়ে ওঠা তাদের পুঁজিবাদী সমাজে– সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তারা দেখেন না (সম্ভবত দেখার সময়ও হয়নি)। সে কারণেই এত বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণের পরে শেষ কথা বলেছেন এমন: সেসব নীতি-কৌশল (policy অর্থে) অবশ্যই আছে যা বাস্তবায়ন করতে পারলে একই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাম্য/সমতা (equality অর্থে) অর্জন সম্ভব। তবে বিষয়টি অর্থনীতির নয় রাজনীতির (পৃ. xxix)। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরতলার ১ শতাংশের সাথে সরকার ও রাজনীতির যে অভিন্ন অশুভ স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা (nexus of common interest) সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তভাবে দানা বেধেছে– নিচতলার মানুষের স্বার্থ সমুন্নত করতে তা কিভাবে ভাঙবেন? সে রাজনীতির রূপ-বৈশিষ্ট্য কী হবে যা দিয়ে ওই স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা জনস্বার্থে ভেঙে বিনির্মাণ করবেন মানুষে-মানুষে সমতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ এবং নিশ্চিত করবেন বিত্ত-সম্পদে সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির পথ? আমার ধারণা এ প্রশ্নের উত্তর জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যান, জেফরি স্যাকসসহ পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের কাছে নেই অথবা থাকলেও বলছেন না অথবা মনে করছেন এখনও তা বলার সময় হয়নি। আমাদের ভাবনা আমাদেরকেই ভাবতে হবে– যেখানে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞান আর অভিজ্ঞতাসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগবে।

বার.

Rent seeking-এর দুর্বৃত্তায়ন বেষ্টিত কাঠামোতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা থেকে উত্তরণ: বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক

রাজনীতিতে নির্ধারক হবে কালোটাকার মালিক rent seeker দুর্বৃত্তরা আর সরকারে গিয়ে তারা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করবে— এ বিশ্বাসের যুক্তি কোথায়? আর সে কারণেই প্রচলিত রাজনীতিবিদরা সরকারে ও সরকারের বাইরে দারিদ্র্য নিয়ে ব্যবসা করবেন— যা তারা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য হাজারো চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প (project) গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কখনও, কোনও অবস্থাতেই এমন কর্মসূচি (programme) নেয়া হবে না, যেখানে বাজেটের প্রধান অংশ বরাদ্দ করে প্রকৃত দারিদ্র্যের সকল নির্দেশক (indicator অর্থে) ভিত্তিক সময় বেঁধে দিয়ে কর্মকাণ্ড সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে; যেখানে ব্যর্থতার শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। এগুলো হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ও বৈষম্য সৃষ্টির সব পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। বসের চেয়ারের পিছনে যতদিন তোয়ালে থাকবে ততদিন ঔপনিবেশিক মানসিকতাও যাবে না, আর সেটা অটুট থাকলে দারিদ্র্য প্রকল্প লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই চিরকাল বহাল থাকবে। চেয়ারের মানুষটির দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ফ্ল্যাটের মালিক না হতে পারার দারিদ্র্য কি ভাবে দূর হবে? আমার মাটির তলার-উপরের সম্পদ অন্যের হাতে– rent seeker-দের হাতে নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করতে না পারার দারিদ্র্য কিভাবে দূর হবে? বৈশ্বিক rent seeker ও তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ওকালতি-দালালি-লবি না করার ক্ষতি কিভাবে পুষাবেন?

ছোট মনে বড় কাজ করা সম্ভব নয়; আর আমরা যারা rent seeker কালোটাকার প্রভুদের মধ্যবিত্ত ভক্ত, তারা মনের দিক থেকে যথেষ্ট মাত্রায় অনাবাসী। আমরা যত-না ইহকালে বাস করি, ততোধিক পরকালে। আর ইহকালে পশ্চিমা পাসপোর্ট প্রাপ্তির মূর্খতা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জেঁকে বসেছে। গোলকায়নের গোলকধাঁধায় আমি তো বিশ্বনাগরিক (তৃতীয় শ্রেণির হলেও)– আমার দেশপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম জরুরি। সুতরাং, সম্ভবত আরও একবার ভালো করে ভাবতে হবে। ভাবনাকে জাতীয় চিন্তায় রূপ দিতে হবে। দুর্বৃত্তবেষ্টিত যে সমাজ-অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করেছি, সে কাঠামোতে আদৌ দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব কি'না, ভেবে দেখতে হবে। ভাবতে হবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রসঙ্গটি; গভীরভাবে ভাবতে হবে মধ্যবিত্তের মানসিক-কাঠামোর রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। "মুক্তবাজার– দরিদ্র-বান্ধব নয়"। মুক্তবাজার এখন দুর্বৃত্তবেষ্টিত rent seeker-দের অধীনস্থ সত্তা। আর তাদেরই অধীন হল রাজনীতি ও সরকার। সেইসঙ্গে বিশ্বায়নের তোড়ে মুক্তবাজার ততোধিক দরিদ্র-বিরোধী; বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেছে বৈশ্বিক rent seeker-এর এক গোষ্ঠী– যারা দুনিয়ার সকল সম্পদ– জ্বালানি, খনিজ, জল, আকাশ, মহাকাশের উপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অবস্থায় আমাদের ভাবতে হবে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। এমন নীতি-কৌশল যা প্রয়োগ করলে যথাদ্রুত সম্ভব দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উচ্ছেদ হবে।

আপাতত একটি শেষ প্রশ্ন– পৃথিবীর কোথাও বিদেশি পরামর্শ ও ঋণে দারিদ্র্য বিমোচিত হয়েছে কি? এদেশের গ্রামে জন্মে এদেশের মাটিতে মানুষ হয়ে আমাদের দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের চেহারা আমরাই যদি না বুঝি তাহলে ভিনদেশি সাহেবরা তা কিভাবে আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবেন? এটা আমার কাছে একদিকে যেমন দুর্বোধ্য, অন্যদিকে অত্যন্ত অপমানজনক। আমাদের ইতোপূর্বে প্রণীত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) কনসেশনাল ঋণ সুবিধে পাবার শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ মোতাবেক রচিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন– যে দেশের কৃষক দেশকে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারে, যে দেশের শ্রমিক দেশের মধ্যেই স্বল্পতম মজুরির বিনিময়ে (যা অন্যায্য) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড করতে পারে, যে দেশের শ্রমিক বিদেশে রাত-দিন পরিশ্রম করে বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে পারে, যে দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জন্মরহস্য আবিষ্কার করতে পারে, যে দেশের রসায়ন বিজ্ঞানী খাবার পানিকে আর্সেনিক বিষমুক্তকরণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রযুক্তির নোবেল পুরস্কার পেতে পারে– সে দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে বিদেশি দাতাদের প্রয়োজন কেন? আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস উদ্দিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন নীতি-দর্শন আমাদেরই প্রণয়ন করতে হবে এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে আমরা আমাদের সংবিধান মেনে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও হ্রাসে দেশোপযোগী নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। সেই সঙ্গে আমি এ-ও মনে করি যে, ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রণীত বিশ্বব্যাংকের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (নামকরণটি বেশ নিরপেক্ষ গোছের কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলক) আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি একধরনের অস্বীকৃতি। আমার জানামতে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বেশ কিছু দেশ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়নে অস্বীকার করেছে। কেউ বলেছে, তাদের সংবিধান আছে এবং তার বিধানের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ হচ্ছে/হবে; কেউ বলেছে, সংবিধান মেনে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটাই তাদের উন্নয়ন কৌশল। আমরা কেন পারছি না? আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পারি। এ লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবনা নিম্নলিখিত ১৩-দফা এজেন্ডা বিচার-বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক এবং তা বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ ১৩-দফা এজেন্ডাকে বিচ্ছিন্ন দফা হিসেবে নয় দেখতে হবে সমন্বিত সমগ্রতা (holistic) হিসেবে। সেই সাথে বাস্তবায়ন হতে হবে একই সাথে, তবে প্রত্যেক দফা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার (prioritization) ও পর্যায়ক্রম (sequencing) বিবেচনায় আনতে হবে। আমার প্রস্তাবিত ১৩-দফা এজেন্ডা নিম্নরূপ:

১. বণ্টন-ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
২. অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি;
৩. অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা;
৪. শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের

মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব;
৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার;
৬. নারীর ক্ষমতায়ন (অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক);
৭. বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান;
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার;
৯. জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর (মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড , ইত্যাদি);
১০. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত (শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ);
১১. সুসংগঠিত সামাজিক ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম (সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার– সেফটি নেট থেকে শস্যবীমা পর্যন্ত);
১২. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং
১৩. রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ (উন্নয়ন হবে আন্দোলন)।

আমি মনে করি, জনগণের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে। আর দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতাসহ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বলতে আমরা কী বুঝব এবং সেগুলো রাষ্ট্র ও সরকার কিভাবে নিশ্চিত করবে তা তো সংবিধানেই আছে। মানুষ হিসেবে দরিদ্র মানুষ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার সমঅংশীদার। আমাদের সংবিধান বিয়াল্লিশ বছর আগে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার যে দিকদর্শন দিয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা নিয়ে আর কোনো বক্তৃতা দরকার হবে না। মনে রাখা জরুরি যে এ দেশের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা প্রধানত মনুষ্যসৃষ্ট–ভূমিকম্প বা অলৌকিক কোনো কিছু এখানে দারিদ্র্যের কারণ নয়। সুতরাং শেষ কথা, মানুষ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র হতে না পারে, সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান। সুতরাং বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির পথ বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে সমস্যাটি কোথায়?

আজকের লোকবক্তৃতার মূল অভীষ্ট নির্ধারণে বলেছিলাম যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিশ্লেষণপূর্বক "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব" (unified political economic theory) বিনির্মাণ করা যায় কি'না? আমার ধারণা ইতোমধ্যে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বটি হতে পারে এমন: ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে জনসংখ্যার একাংশ– উপরের তলার মানুষেরা বিত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে নয় অন্যের বিত্ত হরণের (rent seeking) বিভিন্ন পন্থায় বিত্তশালী হন এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক দুর্ভেদ্য অশুভ সম-স্বার্থ সম্মিলন (nexus of common interest) ঘটে; এ সম-স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা একদিকে rent seeker-বিত্তবানদের বিত্ত বাড়াতে থাকে আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান এ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূর করা সম্ভব যদি সম-স্বার্থের ত্রিভূজ (বিত্তশালী rent seeker,

সরকার, রাজনীতি)-টি ভেঙে ফেলা যায়; যদি ঐ ত্রিভুজ ভেঙে বিত্তশালী rent seeker-দের প্রচলিত রাজনীতি ও সরকারের বাইরে রাখা যায়; যদি জনকল্যাণকামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে রাজনীতি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার উৎসমুখ বন্ধ করে দেবে। বিষয়টি শেষ বিচারে রাজনৈতিক সিস্টেমের পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য-উৎস

আবুল বারকাত, ১৯৮৫, 'বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য'। আবু মাহমুদ রচিত *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা*, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১, অক্টোবর ১৯৮৫, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

Abul Barkat et al., 2001. *Political Economy of Khas Land in Bangladesh.* Dhaka: Association for Land Reform and Development.

আবুল বারকাত, ২০০৪, 'বাংলাদেশে যুব দারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', এডিএসসি আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১২ আগস্ট ২০০৪।

Abul Barkat, 2005. Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005.

Abul Barkat, 2005. Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

আবুল বারকাত, ২০০৬, 'একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী, ১৫ জুলাই ২০০৬।

Abul Barkat, 2009. Global Study on Child Poverty and Disparities: *National Report Bangladesh,* UNICEF, Bangladesh.

Abul Barkat et al., 2011. *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh; Genesis, Growth, and Impact.* Dhaka: Ramon Publishers.

আবুল বারকাত, ২০১১, এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা ও ভাবনার দারিদ্র্য', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। ঢাকা: ৮ অক্টোবর ২০১১।

আবুল বারকাত, ২০১২, 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন (২০০১-২০১৩)।

আবুল বারকাত, ২০১২, শাহএএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট', বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ২৭ জানুয়ারি ২০১২, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

আবুল বারকাত, ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

আবুল বারকাত. ২০১২. 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ', ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

Abul Barkat et al., 2013. Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level. Help Age International, Dhaka and Human Development Research Centre.

আবুল বারকাত, ২০১৩, 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি', *বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া"* শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

আবুল বারকাত, ২০১৪, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি: কাঠামোগত বিষয়াদি ও উত্তরণ সম্ভাবনা', রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

আবুল বারকাত, ২০১৪, 'বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি', ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বক্তৃতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

Amartya Sen, 1999. *Development as Freedom.* Alfred A. Knopf, Inc.

Chang Ha-Joon & Ilene Grabel, 2005. *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual.* Zed Books Ltd.

Jeffrey Sachs, 2012. *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall.* Vintage Books, London.

Giddens Anthony, 2003. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives.* Routledge, N.Y.

Lee Kuan Yew, 2000. *From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000.* Marshall Cavendish Editions.

Noam Chomsky, 2003. *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance.* Penguin Books.

Noam Chomsky, 2005. *Imperial Ambitions.* Penguin Books.

Noam Chomsky, 2006. *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy.* Penguin Books.

Noam Chomsky, 2007. *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.*Viva Books Private Limited.

Paul Krugman, 2013. *End This Depression Now*. W.W. Norton & Company Ltd.

শাহ এএমএস কিবরিয়া, ২০০৭, 'দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ', *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২০০৭।

Stiglitz, Joseph. E, 2002. *Globalization and Its Discontents.* Penguin Books.

Stiglitz Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*. Penguin Books.

[১] সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এ পর্যন্ত ৫-ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা (socio-economic formation) দেখেছি: (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তি (productive force) এর দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হল উৎপাদনের উপায়ের (means of production– যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর মালিকানার ধরন (হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সার্বজনীন ইত্যাদি), আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হল শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হল (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫. *বিশ্ববীক্ষার বিষয়*: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. পনেরো-একুশ)

[২] বিষয়টি বুঝাতে জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জীবনসমৃদ্ধি ঘটেছে অন্য সবার ক্ষতির বিনিময়ে" (দেখুন: নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ Stiglitz, Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, p. 41)। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অনুচ্ছেদসহ *মানুষে-মানুষে অসাম্য কেন হয়* অনুচ্ছেদে।

[৩] Derivates সম্পর্কে বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট বলেছেন "Financial weapons of mass destruction" (উদ্ধৃত হয়েছে Stiglitz Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, pp. 97, 424). সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: (নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ) Paul Krugman, 2013. *End This Depression Now*, pp. 75-82. Chang Ha- Joon & Ilene Grabel, 2005. *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*, pp. 33-36.

[৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. *End This Depression Now*, pp. 85-90.

[৫] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, p. 61.

[৬] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, pp. 61-62.

[৭] এ দেশের জনসংখ্যা এখন ১৫ কোটির বেশি হতে পারে। হিসাবের সুবিধার্থে ১৫ কোটি বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়। মোট জনস্যখ্যা ১৫ কোটির বেশি হলে সে অনুযায়ী অন্যান্য হিসাবপত্তর পরিবর্তিত হবে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ যেহেতু প্রধানত গুণগত বিষয় সেহেতু সাধারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের একটু-আধটু পরিবর্তনের ফল মূল বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রাখবে।

[৮] Poverty-Distress-Deprivation-Disparity-Inequality অর্থে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ বক্তৃতায় আমি এসব কিছু বুঝাতে 'দারিদ্র্য' প্রত্যয় বা প্রপঞ্চটি (category) মোটামুটি অন্য চারটি প্রপঞ্চের সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছি যদিও প্রত্যয়/প্রপঞ্চসমূহ আন্তঃসম্পর্কিত এবং হুবহু সমার্থক নয়। অবশ্য প্রযোজ্য অনেক ক্ষেত্রেই ধারণার বিভ্রান্তি নিরসনে বঞ্চনা, বৈষম্য, অসমতা (অসাম্য) প্রপঞ্চসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

[৯] এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অতীতে অনেক লিখেছি ও বলেছি। যে সবের মধ্যে আছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিভিন্ন আয়োজন (২০০১-২০১৩), এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালা-২০১১, শাহএএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা স্মারক বক্তৃতা-২০১৪।

[১০] বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে পরবর্তী *মানুষে-মানুষে অসাম্য কেন হয়* অনুচ্ছেদে।

[১১] অথবা ইতোমধ্যে যে প্রক্রিয়াকে rent seeking-এর আওতায় বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন পরজীবী শ্রেণি, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, লুটেরা, অনুপার্জিত আয়কারী, দখল-জবরদখলকারী, আত্মসাৎকারী ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি।

[১২] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, পৃ. ১৩-১৬।

[১৩] এসব super-duper-elite-দের বিত্ত-সম্পদের উৎস, প্রবৃদ্ধির হার এবং সংশ্লিষ্ট বৈষম্য-অসমতা নিয়ে পল ক্রুগম্যানের বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. *End This Depression Now*, pp. 71-90, 109-129.

[১৪] Stiglitz, Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, p. xlvi.

[১৫] বিস্তরিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৪. *বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের রাজনৈতিক অর্থনীতি*।

[১৬] তবে এখন থেকে দু'বছর আগেও আমিই বলেছিলাম সবকিছু যেভাবে চলছে তাতে মৌলিক চাহিদা পদ্ধতিতে জাতীয় ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে সময় লাগবে ২০০-৩০০ বছর। বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২, "বাংলাদেশে দারিদ্র চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট", শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা ২০১২, পৃ. ১১; আবুল

বারকাত, ২০০৬, "একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি", পৃ. ৬, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী, ১৫ জুলাই ২০০৬।

[১৭] এ বণ্টন-বৈষম্যটি এমনই যে যে যতবেশি পরিশ্রম করবেন তিনি তত দরিদ্র হবেন, আর বিপরীতে সম্পদ সৃষ্টিতে কোনোরকম ভূমিকা না রেখেই কেউ কেউ বিত্তবান-সম্পদশালী হয়ে যাবেন (অর্থাৎ rent seeker); এ বৈষম্যটি এমনই যা সবার জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির বিপরীতে কাজ করে যা বৈষম্য আরো বাড়ায়; এ বণ্টন-বৈষম্যটি এমনই যে কৃষক আলু উৎপাদন করবেন এবং তা রাস্তায় ফেলে দেবেন; গৃহস্থ দুধেল গাই পুষবেন আর দুধ পানিতে অথবা রাস্তায় ঢেলে ফেলবেন; বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য কমবে কিন্তু আমাদের এখানে দাম বাড়বে ইত্যাদি। বিষয়টি পরে '*মূল্য সিন্ডিকেট ও বাজারসন্ত্রাস*' অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে।

[১৮] বিস্তারিত দেখুন: Amartya Sen, 1999. *Development As Freedom*, pp. 10, 38-40.

[১৯] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা IMF-কে আমরা সবাই অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবেই জানি। কিন্তু IMF নিয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ-এর একটি ছোট্ট বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন 'The IMF is a political institution' (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2002. *Globalization and Its Discontents*, pp. 166-179)।

[২০] বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১২। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

[২১] উল্লেখ্য যে ২০১০ সালের হিসাবে দেখানো হয়েছে এ দেশে ধনীদের (উচ্চ শ্রেণির) সংখ্যা ৪১ লক্ষ। আর এখানে বলছি ২০ লক্ষ। দু'টোই ঠিক। কারণ সব ধনীই দূর্বৃত্ত নন তবে সব দুর্বৃত্তই ধনী। আবার বিশ্লেষণে একথাও বলেছি যে ধনিক শ্রেণির ১০ শতাংশ (২০ শতাংশও হতে পারে) 'সুপার ধনী' যারা সবাই rent seeker এবং রাজনীতি ও সরকার তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন; এ এক অশুভ সমস্বার্থ গোষ্ঠী। অর্থাৎ ১৫ কোটি মানুষের দেশে সুপার ধনীর সংখ্যা হতে পারে ৪ থেকে ৮ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ পরিবার (খানা) (যেখানে বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটির কিছু বেশি)।

[২২] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2011. *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact*, pp. 257-268.

[২৩] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat, 2009. Global Study on Child Poverty and Disparities: *National Report Bangladesh*, pp. 5-18. এই গবেষণায় শিশুদারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহার করা হয়েছে খাদ্য ভোগ, মৌলিক চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখা। আর শিশুবঞ্চনা পরিমাপে মোট ৭টি নির্দেশক ব্যবহার হয়েছে: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, তথ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, এবং আবাসন।

[২৪] যুব-দারিদ্র্য ও যুব-বেকারত্ব-এর কারণ-পরিণাম সম্পর্কসহ সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৪, *'বাংলাদেশে যুব দারিদ্র্য: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'*, পৃ. ২০-২৫।

[২৫] বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2013. *Impact of Social and Income Security for Older People at Household Level*, pp. I-VI, 1-16,

[২৬] Rent seeker-দের বাজারসন্ত্রাস ও মূল্যসন্ত্রাস প্রক্রিয়ায় শুধু যে সরকার ও রাজনীতিই সহায়তা করে তাই-ই নয়– এসবে অর্থনীতিবিদদেরও ভূমিকা কম নয়। বিষয়টি নোয়াম চমস্কি এভাবে উত্থাপন করেছেন: অর্থনীতিবিদেরা ফলপ্রদতা (efficiency) ও উৎপাদনশীলতা (productivity)-র বিভিন্ন পরিমাপ করেন। কিন্তু যে ব্যয় জোর করে ভোক্তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় সেটাও তো প্রকৃত ব্যয়েরই অংশ। অর্থনীতিবিদেরা কিন্তু তা পরিমাপ করেন না। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতাদর্শিক নীতিটাই এমন যে হিসাবপত্তর হবে শুধুমাত্র সেসব ব্যয় যেগুলো ধনী ও কর্পোরেশনের স্বার্থে পরিমাপ করা দরকার (দেখুন: Noam Chomsky, 2005. *Imperial Ambitions*, p. 194).

[২৭] সরকার যে নিজেই দুর্নীতিবাজ এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন: "দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি কারণ যারা সরকারে থাকেন, তারাই দুর্নীতি করেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এটা সব সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" দেখুন: শাহ এএমএস কিবরিয়া, ২০০৭, "দুর্নীতি দমন কমিশন: গোড়ায় গলদ", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০০৭, পৃ. ৩৫৮।

[২৮] মানুষের এহেন দুর্দশা প্রসঙ্গে মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফরি স্যাকস তার বিশ্লেষণে লিখেছেন "The 2008 financial meltdown also deepened the financial distress of millions of Americans who kept their jobs but lost their homes and savings. The fall in housing prices beginning in 2006 spelled the end of a couple of decades in which middle-class households treated their homes as ATM machines, drawing on the ostensible value of the home through home equity loans. With the collapse of the housing bubble, millions of households found that their homes were now worthless than their mortgages, leading them to default on them mortgage payments, ...This widespread financial distress is the end stage of a generation-long decline in Americans' propensity to save". দেখুন: Jeffrey Sachs, 2012. *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall*, p. 16.

[২৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৩, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, পৃ. ৫৭-৮৬, ঢাকা: ৪-৫ অক্টোবর ২০১৩।

[৩০] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat, 2005. Criminalization of Politics in Bangladesh, SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005. Abul Barkat, 2005, Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh, Lecture organized by Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

[৩১] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মত সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে। মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করে। হিন্দু জঙ্গিরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (বিস্তারিত দেখুন: Giddens Anthony, 2003. *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives,* pp. 50-51)। মিসরের আরব বসন্ত আন্দোলনে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সদস্যরা ব্যাপকহারে এসএমএস, ফেইসবুক, ই-মেইল, টুইটারসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে/করছে। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ মৌলবাদী শক্তি ব্লগসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

[৩২] মনে রাখা জরুরি যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে rent seeker-রা সম্পদ সৃষ্টি করে না, সম্পদ হ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। আর একই কাঠামোতে যখন ধর্মভিত্তিক জঙ্গি rent seeker আবির্ভূত হয় তখন সম্ভাব্য ক্ষতি-ধ্বংস মাত্রা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এসবের অনেক উদাহরণ এখন দেশে-বিদেশে দৃশ্যমান।

[৩৩] বিস্তারিত দেখুন: Noam Chomsky, 2003. *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance,* pp. 37-42. Noam Chomsky, 2005. *Imperial Ambitions,* pp. 1-17, 68-81. Noam Chomsky, 2006. *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy,* pp. 3-38, 129-143, 163-165. Noam Chomsky, 2007. *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World,* pp. 19-21, 31-37, 160-165.

[৩৪] ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের। দেখুন: Lee Kuan Yew, 2000. *From Third World to First, The Singapore Story*: 1965-2000, pp. 758-759.

[৩৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: Abul Barkat et al., 2001. *Political Economy of Khas Land in Bangladesh*, pp. 131-151.

[৩৬] বিস্তারিত দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2002. *Globalization and Its Discontents*, pp. 244-252.

[৩৭] Noam Chomsky, 2003. *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, p. 230.

[৩৮] Stiglitz, Joseph. E, 2013. *The Price of Inequality*, pp. 6-7.

[৩৯] দেখুন: আবুল বারকাত। ২০১২। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১২-তে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ঢাকা: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

[৪০] অনুচ্ছেদের বক্তব্য-বিশ্লেষণ বেশির ভাগই নেয়া হয়েছে জোসেফ স্টিগলিজের ২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পৃষ্ঠা নম্বর ওই গ্রন্থের। দেখুন: Stiglitz, Joseph. E, 2013. *The Price of Inequalty*.

[৪১] বিস্তারিত দেখুন: Jeffrey Sachs, 2012. *The Price of Civilization: Reawakening Virture and Prosperity after the Economic Fall*, pp. 22-23.

[৪২] বিস্তারিত দেখুন: Paul Krugman, 2013. *End This Depression Now*, pp. 74-82.

[৪৩] Noam Chomsky, 2003. *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*, p. 159.

[৪৪] দেখুন: Noam Chomsky, 2006. *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy*, p. 236.

[৪৫] আমার মতে Rent Seeker-দের পক্ষে আইন-কানুন-বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকার ও রাজনীতি এমন ভূমিকা পালন করে যে সুযোগ ব্যবহার করে মোটামুটি বিনাশ্রমে অথবা সম্পদ 'সৃষ্টি' না করে rent seeker-রা তিনটি সুবিধা পেয়ে যায়: (১) যে মুরগি ডিম পাড়ে তার মালিক হওয়া যায়, (২) ডিমও খাওয়া যায়, (৩) প্রয়োজনে ডিমপাড়া মুরগিটিই ভক্ষণ করে ফেলা যায়।

A Method of Colonization

.....

ZafrullahChowdhury

Bangladesh, we say, has suffered from wars, poverty, overpopulation, and natural calamities. Now we are coming to see that it has suffered as much if not more deeply, from 'invested aid', or, aid given to primarily benefit the wealthy country. Let us look specifically at what has been developing in the area of medical research.

In 1905, Frederick T. Gates, main administrator of the Rockefeller assets, and a former Baptist minister, informed Rockefeller that "Quite apart from the question of persons converted, the more commercial results of missionary effort to our land is worth a thousand fold every year of what is spent on missions ....our export trade is growing by leaps and bounds. Such growth would have been utterly impossible but for the commercial conquest of foreign lands under the lead of missionary endeavour. What a boon to home industry and manufacture."[1]

Medicine : Force for Colonization

But it did not take long for these concerned imperialists to see that medicine could accomplish even more for them than the missionary. Throughout the underdeveloped areas of the world, the great philanthropic foundations became aware that "medicine was an almost irresistible force in the colonization of non-industrialized countries."[2] But this medical care must remain in their control if it was to continue primarily for their benefit. In the Rockefeller international health programs, it was assured that "the entire control of all the money would be held by our people and not the natives."[3] In pre-Mao China, the Peking Union Medical College which had been removed from the control of missionaries and placed under the direction of the Rockefeller Foundation "was conducted entirely by their own staff from New York and a local office in Peking."[4]

The endeavour met with marked success. It was William R. Welch, the first dean of the Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, who lauded American medical scientists for their part in their country's "efforts to colonize and to reclaim for civilization, vast tropical regions."[5]

A New Imperialism

Now a new age has set out to 'reclaim' a new republic, Bangladesh. In the past, as now, the glutted American market cried out for colonies to consume its goods. The medical research situation in the United States today, contains the same urgency to find regions for expansion.

First, the US professional in the area of medical research, finds himself in a highly competitive system. Experience, not easily obtained at home, is required to gain positions, promotions, etc., and often just to "stay afloat" in his professional field.

Second, universities in the States are presently in dire need of funds, and increased prestige. Research works offers the opportunity for both.

And third, the large drug companies seeking to increase their profits are out to expand the market.

Bangladesh, because of the difficulties that it has faced in health and population, offers unlimited opportunities to each of the three groups described above.

The Third World As Laboratory

The procedure is somewhat standardized. The large university offers job opportunities and attractive side benefits to young professionals, and approaches the underdeveloped, overpopulated country with a plan related to health, nutrition, and family planning, financed in large part, if not entirely, by the United States. Government officials from the host country, while maintaining their government offices, are employed by the US university project, in limited number. This gives the project, the necessary 'in' with the local government, while at the same time not being required to sacrifice any real control. No national is trained to the point where he could assume responsibility for the project, independent of the foreign power.

The project gains in stature and fame. Studies are made and published reports are given, statistics are compiled, with the local population all the while furnishing an excellent laboratory for ambitious young foreigners and the prestige and fund-conscious university.

Avoiding Solutions

What are the benefits accruing to the underdeveloped host nations? In the line of scientists trained to carry on the work, it is nil. Further, the preponderance of foreign research stultifies any growth of local efforts, making a monopoly of health science. The population is used, while effective solutions to the problems of health and family planning are subtly avoided. This avoiding the real solution is an art that American medical researchers are often forced to practice in the US. Incredible sums of money are spent seeking cures for such killers as hypertension and cancer, cures which the scientist knows must be avoided, for, in the US as here, discovering the real solution would lead to a radical change of the life style and economic system, and place in a rather uncomfortable position, the men who control research.

Johns Hopkins Again

This past year, the deanship of the John Hopkins School of Hygiene and Public Health was offered to a medical man with a missionary background who refused it, opting instead for the office in Dhaka, (something that could eventually lead to more than a deanship. From here he will help to engineer a new plan for the old imperialism.)

Recently, he and some former members of the Cholera Research Laboratory (CRL) staff, presented the Government of Bangladesh with a proposal for what the authors call an International Institute for Health, Population, and Nutrition Research. The Government has been asked to consider the proposal in light of the fact that funds for the Cholera Research Laboratory will no longer be forthcoming. A subtle but nonetheless insidious pressure. And it might be noted that one expatriate will receive over the next 6 months, 1.5 million Taka from the Ford Foundation for the work of arranging with the government the drawing up and finalizing of the proposal's official and legal aspects, without delay.

It was Ford Foundation which also, in 1974, sponsored a 'trip abroad' for a former minister of health and family planning, who did not agree with the 'advice of the experts' to split the ministry. The Foundation still continues this same procedure.

The proposal for the Institute is a clear example of national interests in the areas of health, population, and social services being absorbed into the control of a foreign state. Let us look more closely at the proposal itself, which step by step illustrates how the institute, primarily planned for the benefit of US researchers, will cripple any attempt on

the national level for an effective, independent health and family planning programme. Bangladesh will serve as a laboratory whose population may or may not benefit from the experiments. And all will be done in collaboration with, under the management of, through funds and personnel in the control of the US.

In The Interests of USA

The proposal contains the following quote : "Establishment of a training program for young investigators from developed countries such as the US will require development of direct institutional ties with US or other university and training institutions. These ties should be encouraged in order that young scientists from the developed countries can gain the skills and the expertise necessary to address health, population, and nutrition problems in the developing world."[6]

It is not experienced scientists who are being sent to offer expertise. It is young men, needing experience, and who, if they follow the pattern of the Cholera Research Laboratory scientists, will only be speaking English when they address the health problems of the developing world.

The proposal goes on to say that, "The key to the development of the proposed research program will be the recruiting of expatriate scientific manpower to conduct the research program."[7] and that "This research program does not envision the requirement for expanding the local technical and supporting staff."[8] It then notes that "There are very few other Bangladeshi professionals that can be recruited in the requisite careers."[9] It fails to further elaborate that there are three Bengali scientists at the lab who were trained elsewhere before the inception of CRL. However, the quotes do indicate quite clearly what has happened in regard to the CRL training of Bangladesh scientists, and what will happen with the new proposal. In both instances– nothing. If during the 1960's alone over 100 US scientists were trained at the CRL, why, after the 16 years of its existence are there no Bengalis trained for the required positions. Certainly not because capable people can't be found. The intent of the lab had never been to train Bengali scientists. And neither it is the intent of the new proposal. The new proposal intends to maintain the hospital and field work as these are areas where the Bengali staff can be absorbed and they need not infringe on the scientific end.[10]

However, there is one special post for a senior Bengali administrative official, who will be "fully responsible for all of the administrative activities associated with local operations in

Bangladesh." This can be seen from a few perspectives, but mainly it will serve to keep government officials at arms length. Having such an official on the payrole who will not have to answer to other Bengali official in regard to the laboratory, will create the desired situation for unfettered, unchecked research. But why a senior official? In the youth-worshipping US it is not the senior man who holds the responsible position, or is given the real work. More often he is given the door. Why will Bangladesh get the senior? Such a position is designed as bait for the government official or his friends who are on the verge of retirement, and will spot in the proposal, if not the opportunity for an effective post, at least for a flattering one. Of course the seniorty will offer some weight with the government.

But weight with government will come from other areas too. The proposal tells us "Unrestricted funds must be available, so that the scientific staff can be recruited from any nation where they may be available."[11] The program is envisioned as operating with "multiple sources of funding from a variety of international agencies and governments."[12] With over 50% of the funds, all of which will be controlled by the 'international' board, coming from the US. This is real power and weight with any government. Further, the proposal reads that "Crucial to the successful operation of the lab is adequate administrative back up support in the US for management, procurement, shipping of supplies, and equipment, as well as of management activities related to the expatriate staff."[13] Procurement, shipping, supplies, equipment, the new market for American products and inappropriate technologies, is opened up. And the US will manage all, even the activities of the expatriate staff.

Why Bangladesh?

".... in conjunction with studies of immunological responses to naturally acquired infection", the proposal tells us, "there will be a program of studies of the human response to artificial immunization by a variety of routes." The study has begun with animals in the U.S. The next step will be the human population of Bangladesh.[14]

Why is it that Americans, so fond of the "sacred rights of individuals" see only masses when they are looking east? Bangladesh, too, is a country whose people have individual longings and fears, and even individual rights.

Once the individual is lost sight of medical research becomes pointless. There is no one to serve, only the ego addressing the statistics.

Further, once the individual is lost sight of, scientific truth cannot be maintained. Perhaps we should have know it all along, but now the 'proposal' spells it out for us. The purpose of the Cholera Hospital was not primarily to serve individuals, but rather for the support it gave to the job.[15] As for the field surveillance operation in Matlab, "it is absolutely fundamental to the entire epidemiological reseach programme as well as to all population related studies."[16] Does it matter that it might have possibly been an opportunity to help people?

And then one comes across such a statement as the following, in the proposed program. "Improving the nutritional status of lactating women will lead to shortening of the period of amenorrhea resulting in birth at shorter intervals. This would not only be detrinental to the welfare of the infant, but would also lead to rising birth rates and more rapid population growth.[17] Chronic malnutrition may be effective in suppressing fertility by prolonging the duration of lactational amenorrhea ...."[18] What is the author trying to convince us of? That was should strive to maintain a malnourished Bangladesh? It is hardly sick people, or hungry people, or people, that is the concern here. It is such things as "an understanding of the biological and social changes affecting human reproduction performance during times of famine."[19] Research and study, nothing beyond. The plans and the experts who deluged the country after the war of liberation did nothing to prevent the famine in 1974, but then, perhaps the aim was only to understand the biological change talking place in the inhabitants.

Unapplied Research

The older cholera vaccine has proven virtually ineffective in preventing the disease. A later experiment with a cholera toxoid vaccine has proved equally ineffective. Now a study is being conducted that will further observe the two ineffective vaccines! 50% of all deaths in the nation are due to diahoreal disease. Over 60% in the case of children. The major achievement of CRL is simplified oral therapy, but this remains unavailable, throughout most of Bangladesh, to patients in serious condition. Intravenous fluids for cholera were introduced in the 1830's but remain unavailable to rural Bangladesh even today. An editorial in the November 27, 1976 issue of LANCET, an international medical journal, points out how the record of cholera research has been marred by this failure to apply the same. It has also been noted that villages whose water is contaminated by material from Matlab Cholera hospital have attack rates for cholera and diahoreal disease that is 20 times

higher than the average. It illustrates the efficiency of research, that can create and perpetuate endemic area in which to observe the ineffective vaccines.

And all of this accomplished on an annual budget of 1.7 million dollars. One million going toward financing the home leaves, vacations, education, recreation, elaborate homes and furnishings, etc., of seven expatriate staff while the treatment of diahoreal patients and a Bengail staff of 770, share the remainder. The new proposal calling for 25 million in the next few years, with an additional 12 expatriate staff, and no more Bengalis,– but for the senior official, is a budget obviously designed to alter the life style, but only in the direction of added luxury.

Because of the framework of the proposal and existing institutional links with Ford Foundation, World Bank, and USAID, all research in areas covered by the Institute have to pass through the program. Monopoly is the result. A monopoly of science stifling any growth of the Bangladesh scientific institutions. And the institute is not primarily, nor secondarily concerned with training Bengali scientists.

The large amount of foreign funds remaining in the full control of foreign groups will serve, consciously or unconsciously, as a pressure on government and state institutions. The result is freedom in Bangladesh for American research universities. And freedom in Bangladesh for American exporters of medicine and medical equipment, who may be researching new products for undesirable side-effects.

The following is an example of what can happen, except that it will be more difficult to challenge abuses of the Institute as it will have been granted prior controls.

The Johns Hopkins Fertility Research Project in Bangladesh found in one of their own studies done in Matlab on the use of the injectable contraceptive, Depoprovera, that is disturbed menstruation radically, and lessened lactation. In another area of Bangladesh, the only other study done in the country on Depoprovera, this one on a much larger scale, came up with the same indications in regard to menstruation and lactation. However, the Johns Hopkins Project, after changing the authorship of this larger study, deleted facts pertinent to the point of decreased lactation among Bengali women, and vaguely sited studies from “other countries” to tell us that they do not report a decrease in lactation, but rather “an increase.”[20] In this instance we risk making a failure of a very promising method of contraception, the Depoprovera injection, by a too hurried approach, without the proper back-up services and follow-up.

Another instance of researchers and advisors acting with apparent disregard for the people and the environment is the (World Bank) idea of putting a laproscope, a highly sensitive, sophisticated instrument requiring both electricity and gas in order to function, into every Rural Health Center (RHC) in Bangladesh. Even every hospital in Britain does not have a laproscope.

We must become aware of the fact that medical researchers are 'experts' operating primarily for their own interests.

The Experts

Recently in Dhaka airport, I met an acquaintance who said to me in the course of our brief discussion that he had counted 72 experts in Dhaka on that one day alone. And yourself, I asked '73', he admitted. It will be an uphill road, overcoming this favourable bias toward the wisdom of the west. For a long time to come we will continue to credit foreign expertise unquestioningly with any knowledge it may lay claim to.

Who are these experts that come from thousands of miles away with the perfect plan for a village they have never seen, and a culture they have never lived. One such expert on smallpox eradication qualified as a motor mechanic. But then, he was a foreigner.

Our "western trained medical profession sanitary inspectors originating in the British Empire, the malaria program established by WHO. ... the Rural Health Centres devised by western public health experts, and most recently, the family planning programs",[21] all are forms of expatriate expertise that have left the health and family planning system of Bangladesh crippled, confused and utterly dependent.

The present split of the health and family planning ministries is the result of 'expert advice' from World Bank and USAID planners who felt the population problem would be effectively met in this manner. Now we have the doctors being hired for family planning work and paid 30% higher than the health ministry doctor who is working in the same rural area within another narrow field. One can foresee the difficulties that will arise here without too much imagination. We will have family planning offices in each union, and a sub-center in each union, and offices for the health ministry. There are 92 maternity centres with twelve rooms each, and 205 Rural Health Centres (RHC). In another five years there is to be another 150 RHC's, but these, with their 30 rooms each cannot be used for the family planning work. Nor can the Lady Health Visitors (LHV), who are working in the Maternity Centres

and are designated as family planning workers, be able to count on the doctors of the RHC for the back-up and support needed if their work is to be effective.

The family planning ministry envisions one worker per 5000 people, an impossible task for someone with one month training and no support or guidance in the field. If the government had continued with its original integrated scheme, it would be in a far more effective position to deliver health and family planning services.

It is accepted that Bangladesh needs barefoot doctors, people trained in the village to meet the needs of the villagers, but the World Health Organization experts proposed an elaborates 3-yr. program to produce medical assistants. This training will take place in the towns and most of the students will have a background of 12 years formal education. In one centre visited, 65 out of 80 enrolled had had twelve years or more educational background, and nearly all felt that the course itself should be four years or more if the program was going to equip them to "better serve the people". Serve, no doubt in Dhaka, or Libya as experience attests. But the expert advisors of WHO refuse to see any other way.

These are the experts. They have been with us, as was noted earlier, for some time. Will we sell ourselves out to unconditionally now? There are real experts, however, and there is such a thing as appropriate aid. And neither it is impossible to discern the real from the 'invested aid'. Does the plan provide for local responsibility in the foreseeable future? Does it reach the real problems with realistic solutions? Is it honest in assessing its weaknesses as well as its strengths? The Companyganj Integrated Health Project in Noakhali is an example of appropriate aid. Now, under Bengali leadership which has been capably trained to assume the responsibility, it is meeting real health needs in a practical way.

The nutrition and women's programmes of UNICEF were also attempts in the right direction.

And as we acknowledge the truly beneficial and helpful work of certain foreign assistance, neither can we fail to accept the fact of our own weaknesses, which surely exist. Yet we do not want to compound and nourish these weaknesses by importing others.

Death Blow to Bangladesh Health Care

But 'inappropriate' aid is concerned with its own purposes. The proposed institute will give researchers free rein to use the people of Bangladesh and the institutions of Bangladesh to further the purposes

that suit them. And it may well be the death blow to our own health system, whether scientific research or delivery of services.

In a review of a book edited by the man now employed to draw up the contract for this new international proposal, we can see that this is no spur of the moment inspiration, but something a long time germinating. Referring to the editor's plan for an international group designed to meet disasters, Malcolm Segall of the Institute of Development Studies at Sussex University in Englang remarks, All the material resources are in the hands of 'prospective donor group' and the international body, and the national coordinating body is entirely at the mercy of inappropriate foreign technology, being guided by 'management experts' (we know where from), 'data processing equipment' (we know where from), and even computers stationed abroad. A better prescription for dependency could hardly be imagined.

One day we hope that true internationalism will be a reality. But the 'internationalism' of this book, of the US Agency for International Development, the World Bank, and, in important respects, of some of the United Nations technical agencies, hides imperialism. It takes as given that the rich capitalist states are rich and the poor peoples of the world are poor and the relief must come from the former to the latter with the paternalistic help of the former's 'technical advisors'.[22]

The proposal threatens the sovereignty of Bangladesh. It perpetuates the image of starving baby syndrome and basket case Bangladesh, to attract funds for foreign researchers. It disregards the fact that there is talent and ability in Bangladesh, and there is a dignity both among our professionals who will no longer tolerate being treated like school boys, and among our people in general who will not much longer tolerate being treated as mere statistics at the cost of their better health.

[Published in 13th & 14th January, 1977 issues of the daily BANGLADESH TIMES, Dhaka, Bangladesh.]

Footnotes

1. F. T. Gates to J. D. Rockefeller, Dec. 12, 1910. (Record Group 2), Rockefeller Family Archives.
2. E. Richard Brown, Ph.D, "Public Health in Imperialism : Early Rockefeller Programs at Home and Abroad".
3. J. H. White to W. Rose, Aug. 14, 1915, and W. Rose to J. H. White, Aug. 17, 1915, International Health Commission files, Rockefeller Foundation.

4. E. Richard Brown, Ph.D, *Public Health in Imperialism*.
5. W. H. Welch, "The Benefits of the Endowment of Medical Research". In addresses Delivered at the opening of the Laboratories in New York City, May 11, 1906.
6. W. H. Mosley, Proposal for a Five-Year Research Program for the Cholera Research Laboratory, Dhaka, Bangladesh, April, 1976 (p. 61).
7. As Above, p.62.
8. As above.
9. As above.
10. As above, p. 10.
11. As above, p. 62.
12. As above, p. 58.
13. As above, p. 63.
14. As above, p. 28.
15. As above, p. 64.
16. As above.
17. As above, p. 43.
18. As above, p. 50.
19. As above, p. 38.
20. "Contraceptive Use of Medroxyprogesterone Acetate (Depoprovera) In Rural Bangladesh" (Falsified paper on study results).
21. Colin Me Cord, *What's the Use of a Demonstration Project*, 1976.
22. Malcolm Segall, Review Articles, *International Journal of Health Services*, Vol. 5, No. 3, 1975.

References

Brown, E Richard, Ph.D., "Public Health in Imperialism : Early Rockefeller Programs at Home and Abroad" Paper delivered at the 103rd annual meeting of the American Public Health Asso., in Chicago, Illinois, November 20, 1975. (Accepted for publication in the American Journal of Public Health).

Chen, Lincoln C., (Ed.) *Disaster in Bangladesh : Health Crises in a Developing Nation*, Oxford University Press, New York, 1973.

Gates, F. T., to J. D. Rockefeller, Dec. 12, 1910, Record Group 2, Rockefeller Family archives.

LANCET, Editorial, November 27, 1976.

Mc Cord, Dr. Colin, *What's the Use of a Demonstration Project*, The Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, Dept. of International Health, Baltimore, Md. Mosely, W. H., Proposal for a Five-Year Research Program for the Cholera Research Laboratory, Dhaka, Bangladesh, April, 1976.
Segall, Malcolm, Review Articles, *International Journal of Health Services*, Vol. 5, No. 3, 1975.
Welch, W. H. "The Benefits of the Endowment of Medical Research", In Addresses Delivered at the opening of the Laboratories in New York City, May 11, 1906.
White, J. H. to W. Rose, August 14, 1915, and W. Rose to J. H. White, August 17, 1915, International Health Commission files, Rockefeller Foundation.

মৌলিক নাটকের সংকট ও রূপান্ড়রিত নাটকের সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত কোর্টমার্শাল

কা মা ল উ দ্দি ন ক বি র

সার্ধশত রবীন্দ্রনাথ উদ্‌যাপনের রেশ এখনো আছে, আমাদের নাট্যপ্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রপ্রণতি বা রবীন্দ্রস্মরণের সূচি এবার ভরে উঠেছিল তাঁর কথা-কবিতা-গান-নাচ ও নাটকের বিচিত্র আসরে। তবে আর-সব আয়োজন ছাপিয়ে এবার আমাদের সামনে বিশেষ দর্শনীয়ভাবে উঠে এসেছে একগুচ্ছ রবীন্দ্রনাটক। এতদিন যা ছিল বিশেষ কিংবা বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের বিষয়, তা যেন এক সার্বজনীন রূপ পেল এই উৎসবে। রবীন্দ্রনাট্যের এই ব্যাপক সমাহারে এবং আরও আগে থেকেই কেবল 'নাটক' নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস নিয়ে বিক্ষিপ্ত নাট্যঅভিজ্ঞতা হয়ে আসছে অনেকদিন। যদিও রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা, পূর্বাপর নাট্যধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাট্যের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা,

তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও গঠনকৌশলের পর্যায়ক্রমিক রূপান্ড়র, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাট্যের বিষয় ও আঙ্গিকের প্রধান অভিমুখ আমরা এতদিন খুবএকটা আমলে আনিনি বললে চলে। তাই এবারকার ১৫০তম রবীন্দ্রজয়ন্ড়ীর আয়োজনে একসঙ্গে এতগুলো রবীন্দ্রনাটক মঞ্চায়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে কয়েকটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে। যেমন, সরকারি অনুদানই কি রবীন্দ্রনাটক মঞ্চায়নের প্রধান নিয়ামক? রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চায়ন-অযোগ্য বা দুঃসাধ্য এই বিবেচনা কি মুখ্য ছিল এতদিন? বা এইসকল নাটকের প্রাসঙ্গিকতা বা সমকালীন তাৎপর্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল ব্যস্ড়সমস্ড় নাট্যজনের মনে? এই এই প্রশ্নের নানারকম বিশ্লেষণ হতেই পারে।

আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে যাবার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত প্রশ্নের সারিতে আরেকটি প্রশ্ন যুক্ত করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি, অর্থাৎ যে 'মৌলিক নাটকের সংকট' ধারণাকে ভিত্তি করে আজকের সেমিনারের প্রস্ড়াবনাটি সামনে এল– সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই এত এত নাট্যকৃতিকে কোন বিবেচনায় রাখা হয়েছে? এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের জানা আছে যে, তাঁর বেশকিছু নাট্যরচনা ঠিক নাটক পদবাচ্য নয়, মঞ্চে এর সাবলীল অভিনয় দুঃসাধ্য– এ-জাতীয় মন্ড়ব্য অনেকদিন ধরে চালু থাকলেও, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাটককে মৌলিক-অমৌলিক তকমা লাগানোর প্রয়াস ছিল না বললেই চলে। তবে, সার্ধশত জন্মবর্ষে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের মন-মননের যাবতীয় সংকীর্ণতা, নীচতাকে অনেকটা দূরীভূত করে, বিশেষত নাট্যঅনুরাগীদের মনে আশাজাগানিয়া শান্ড় সুন্দর ছন্দ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন।

নানারকম রাজনৈতিক, সামাজিক অনাচার তথা সর্বগ্রাসী বাজারি তা"বে মারের পর মার খাওয়া এবং পাল্টা মার দিতে চাওয়া হাত নিশপিশ করা বিধ্বস্ড়-পঙ্গু-অথর্ব এই আমাদের মুক্তির দিশারূপেই প্রতিভাত হয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর সেই কথা : 'মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাটককে কোনো মুখস্থ ছকবাঁধা (ব্লকিং) পদ্ধতিতে, সমাজ স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের মানচিত্রকে আমলে না নিয়ে কেবল বাহারি মঞ্চায়ন দিয়ে অনুধাবন ও উপস্থাপন সম্ভব নয়– সেই বোধ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। *মুক্তধারা* নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে' কথাটিকে কেবল কথার-কথা, কিংবা জটিল কথা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা মনে করে সম্পাদনার কাঁচিতে কেটে ফেলে না দিয়ে এখন আমরা অল্প আয়াসেই কথাটির মর্মোদ্ধার করে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথ থেকেই– 'বাণী তব ধায় অনন্ড় গগনে লোকে লোকে, / তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা ॥ / সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার, / নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্ড়িধারা ॥' প্রসঙ্গান্ড়রে যাবার আগে, দেশে রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চায়ন সম্পর্কিত একটি বিশেষজ্ঞ মত উল্লেখ করে নিতে পারি। এখানকার রবীন্দ্রপ্রযোজনাসমূহ চিন্ড়ায় ও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ থেকে যোজন যোজন দূরেই অবস্থান করছে– মোদ্দা কথায় এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন মাননীয় গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ, রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষে ছায়ানট আয়োজিত বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালার এক আসরে।

'মৌলিক নাটকের সংকট'– এই ধারণা বা সিদ্ধান্তটি কিন্তু একান্তই সংকীর্ণ এক গণ্ডি অর্থাৎ নাগরিক পরিমণ্ডল থেকে উদ্ভূত। ১৯৭২ সালে কলকাতা নগরীর নাট্যজনেরা উদ্‌যাপন করেছেন বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি (১৮৭২-১৯৭২) উৎসব। উৎসব সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে স্মারকগ্রন্থ *শতবর্ষে নাট্যশালা*। সম্পাদনায় ছিলেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. অজিত কুমার ঘোষ। আমরা দেখি বাংলা সাধারণ নাট্যশালার যাত্রা শুরু হয়েছে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' নাটকটি মঞ্চায়নের মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটার তথা পেশাদারি মঞ্চচর্চার সূচনা হয়। উক্ত স্মারকগ্রন্থের সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে বিশিষ্ট নাট্যবিদগণের রচনায় এই সাধারণ নাট্যশালার বয়ানতো করেছেনই, এমনকি তাঁরা প্রায় সকলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রথম বাংলা নাটক হিসেবে ১৭৯৫ সালের রুশদেশীয় পর্যটক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ নির্মিত *কাল্পনিক সংবদল্য*-কে।

চমকপ্রদ বিষয় এই যে, *শতবর্ষে নাট্যশালা* স্মারকগ্রন্থে প্রখ্যাত নাট্যজন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার শিরোনাম- *নাটক: মৌলিক ও বিদেশি*। এই রচনাতে আমাদের আলোচ্য মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটক-ধারণার একটি মৌলিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন 'ব্যবসায়ী থিয়েটারের একশ বছরের ইতিহাস' হিসেবে। তিনি তাঁর রচনার প্রথমেই জানিয়ে দেন ওই শতবর্ষের নাট্যইতিহাসে 'যে নাটক অভিনীত হয়েছে তার অধিকাংশই সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞাতসারে বিদেশি নাটক থেকে নেওয়া'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর রচনায় মৌলিক নাটকের জায়গায় রবীন্দ্রনাটকের উল্লেখ করে সে নাটক প্রযোজনায় অনাগ্রহ দেখে খেদোক্তি করেছেন: 'থিয়েটার থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিনির্ভর নাটকগুলিকে বাদ দিয়েছিলাম, এতদিন পরে তার কিছু কিছু সফল প্রযোজনা হচ্ছে। সে ঘাটতি বুঝতে পারার ফলেও বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণ প্রযোজনার দিকে একটা সচেতন ঝোঁক আজকের থিয়েটারে রয়ে গিয়েছে। এ চর্চা সিঁড়ি তৈরির চেয়ে বেশি কিছু নয়। তবু প্রযোজকেরা আর-একটু সতর্ক, রুচিশীল এবং অবক্ষয়বিরোধী হলে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিদেশি নাট্যচর্চা করলে এর ফল সত্যি সত্যি স্থায়ী ও দৃঢ় হতে পারে এবং যথার্থ অর্থে মৌলিক নাটকের প্রতি নাট্যকার প্রযোজক ও দর্শকের বোধ জাগতে পারে।'

তাহলে সহজ প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে, আজ এই এতদিনে আমাদের নাট্যকার প্রযোজক ও দর্শকের বোধ কতখানি জেগেছে মৌলিক নাটকের প্রতি? বা কাকে বলছি আমরা মৌলিক নাটক? এই প্রশ্নের উত্তর তবে কি আর-এক প্রশ্ন– যা কিছু বিদেশি নাটক থেকে নয় তা-ই কেবল মৌলিক নাটক? অর্থাৎ যা কিছু দেশি তাই মৌলিক। অথচ আমরা দেখব, মৌলিক-অমৌলিক কেবল নয়, সমগ্র নাটক ধারণাটি নিয়েই রয়েছে আমাদের মূল সংকট। এবং এই সংকটের ইতিহাস বেশিদিনের পুরনো নয়, উপনিবেশিক শাসনকালই হল এর মোক্ষমকাল। যখন কিনা বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য কোনোরূপ আমলে না নিয়ে, ধার করা এক ধারণার বশবর্তী হয়ে কেবল নাগরিক পরিমণ্ডলে তৈরি হতে থাকে বাংলা নাট্যবৃত্তান্ত।

তার মানে, বাংলা নাটকের এই সংকট মূলত ছিন্নমূলীয় সংকট। হাজার বছরের 'বুদ্ধ নাটক' কিংবা অপরাপর গীত-বাদ্য-নৃত্য ও কথাবহুল আখ্যান বা গীতরঙ্গসমূহের ব্যাপক প্রামাণিক উপস্থিতি সত্ত্বেও কেবল সাহেবি বুদ্ধি দ্বারা তাড়িত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী এক ভ্রান্তির বেড়াজালে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। যে কারণে রুশীয় লিয়েবেদেফকে তকমা দেওয়া হয় 'বাংলা নাটকের জনক' বলে, বাংলা সাধারণ নাট্যশালা চালু হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে, এবং অঙ্গন-গৃহাঙ্গন ও নাটমন্দিরসহ নানা মঞ্চের নাম ও স্মৃতি ভুলিয়ে, ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম মঞ্চকে একমাত্র নাট্যমঞ্চরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সাহেবি বুদ্ধিজাত সেই ভ্রান্তির অদ্ভুত বিলাসরূপে আমরা দেখি আমাদের প্রতিটি উপজেলা সদরে মিলনায়তনগুলোতে সাইক্লোরামা, উইংসবহুল এক-একটি প্রসেনিয়াম মঞ্চ। কোনো বিস্ময় প্রকাশ তো দূরের কথা, মামুলি কোনো প্রশ্ন পর্যন্ড় আমরা করি না যে, হাজার বছর ধরে চর্চিত হয়ে আসা মন্দির বা গৃহপ্রাঙ্গণের নাট্য আয়তন কিংবা যাত্রামঞ্চের আদলে কোনো মঞ্চ এখনো কেন গড়ে ওঠে না এই আমাদের 'আধুনিক' জীবনে! বিকৃষ্ট্র, চতুর‌্যস্র, ত্র্যস্র (আয়তাকার, বর্গাকার, ত্রিভুজাকার) নামে অভিনব মঞ্চআঙ্গিকের প্রণেতা ভরত মুনি সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন কেবল নাট্যকলা শ্রেণিকক্ষে ও উদ্যমী কতিপয় নাট্যজনের কাছে। আমাদের সামগ্রিক নাট্যভাবনায় কোনো ঢেউ তোলে না গোটা বিশ্বনাট্য অঙ্গনের অনন্য ব্যতিক্রমী পুরোধা ভরত মুনি রচিত গ্রন্থ *নাট্যশাস্ত্র।* অথচ *নাট্যশাস্ত্রের* সমান্ড়রালে আর কোনো গ্রন্থের নাম কি আমরা উলেণ্টখ করতে পারি? সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসূত্রকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে তাবৎ নাট্যশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশের কথা বলতে গিয়েই এখনও আমরা গড়গড় করে আওড়াতে থাকি গ্রিসের কৃষিদেবতা দিওনাইসাস্ ও তাঁর উৎসবকেন্দ্রিক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কথা। অথচ সেই ইউরোপীয় সাহেবদের বদৌলতেই আমাদের জনপদের কৃষিদেবতা বা মহামিথ চরিত্র শিব-এর নামও আমরা উল্লেখ করি না। যদিও দেখি, যাবতীয় আগ্রাসন সত্ত্বেও শিব মহাদেব এখনও বাংলার বৃহত্তর জনজীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন- চৈত্রসংক্রান্ড়িসহ নানা কৃতকাণ্ডে। এসবের মধ্যেই অভিনয় বলি, নাটক বলি যাবতীয় শিল্পসূত্র ইচ্ছা করলেই পাঠ ও অনুধাবন করা সম্ভব।

দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই ইচ্ছাশক্তিই বর্তমানে অবলুপ্ত। নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসন্ধানে অনাগ্রহের বিষয়টি বিদেশাগত সাহেবরা যে কত কৌশলে এ-দেশবাসীর মনে বপন করেছিল তা ভাবলে অবাক না-হয়ে উপায় থাকে না। ইস্ট ইন্ডিয়া ব্যবসা কোম্পানির রাজ্যশাসন তথা লুটপাটের প্রধান হাতিয়ার হিসেবেই যে ভারতবাসীর মনে দাস-মনোভাব বা হীনতাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়টি আজকের দিনের নানা বিশ্লেষণে উঠে আসা শুরু করেছে। সাহেবদের এক বিশেষ প্ররোচনায় "সৃষ্টি হয়েছিল এক কাল্পনিক 'আর্য' জাতি, যারা নাকি ভেড়া চরাতে চরাতে ইউরোপ থেকে এখানে এসে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি করেছিল। এজন্যই নাকি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষাগুলোর এত মিল!" (*আর্য রহস্য*– সুহৃদকুমার ভৌমিক। মনফকিরা, বৈশাখ ১৪১৭ হাওড়া।) এই অপব্যাখ্যার জনক হলেন ফ্রেডরিশ ম্যাক্স মূলর। *আর্য রহস্য* গ্রন্থে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য পেয়ে যাই যেমন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ম্যাক্স মূলর-এর

যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন মেকলে সাহেব। যে মেকলে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের সমস্ড় মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার। ১৮৩৬ সালের ১২ অক্টোবর এক চিঠিতে তিনি লেখেন 'It is my belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable casts in Bengal thirty years hence' (*Max Muller Exposed*- Brahma Dutt Bharati) সেই plans of education-এর একটি পরিকল্পনা ছিল আর্যজাতির আবিষ্কার এবং এই সূত্রেই ভারততত্ত্ববিদগণ জোর গলায় সেই কাল্পনিক আর্যজাতির অস্তিত্ব প্রকাশ করে বলতে থাকেন– ভারতীয় সভ্যতা, হিন্দুধর্ম, বেদ-বেদান্ড় সবকিছুর মূলে ভারতের মাটির কিছুই নেই, সমস্ড়ই সেই দুর্দান্ড় ভেড়া-চরানো যাযাবর বিজয়ী জাতির অবদান। ম্যাক্স মূলর বেদ অনুবাদকালে তাঁর স্ত্রীকে একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন 'আমার অনুবাদিত বেদ ও তার সংস্করণ ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যকে ব্যাপকভাবে নির্ধারিত করবে। কারণ এটাই হল তাদের ধর্মের উৎস এবং তাতে রয়েছে তাদের ধর্মের মূল কী। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি এই হল একমাত্র পদ্ধতি যা তাদের তিন হাজার বছরের সমস্ড় ধ্যানধারণাকে নির্মূল করে দেবে।' (*আর্য রহস্য*, পৃষ্ঠা-১৫)।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পাঠক/শ্রোতা সমীপে বিনীতভাবে আর-একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণের সামান্য তুলে ধরতে চাই। আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নেই, সবই ওই সাহেবদের অবদান– এই মতের প্রবল বিরোধিতা করে ব্যাপক দালিলিক প্রমাণসহ বিশেষত সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও এ ভূখণ্ডের আদিগ্রন্থ *ঋগ্বেদকে* অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দুই নিবিষ্ট গবেষক শামসুজ্জোহা মানিক ও শামসুল আলম চঞ্চল প্রণয়ন করেছেন এক বিশেষ গ্রন্থ *আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা* (বদ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩) এই গ্রন্থে তাঁরা স্পষ্টতই বলেন, '*ঋগ্বেদ* যেমন বহিরাগত কোনো যাযাবর জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি নয় তেমন আর্যরাও ভারতবর্ষে বহিরাগত, আক্রমণকারী জনগোষ্ঠী নয়। তারা এই উপমহাদেশেরই অধিবাসী যারা এখানে বহু প্রাচীনকাল থেকে একটি সুউন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল (পৃষ্ঠা-৫১)। জনমানসকে রহস্যের ধূম্রজালে আবদ্ধ করার লক্ষ্যেই যে *ঋগ্বেদ* রচনার সামাজিক ও কালিক পরিস্থিতি বা মূল তাৎপর্যকে গৌণ করে দিয়ে ধর্মীয় শক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের শ্রেণিসমূহের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষার হাতিয়ার করে তুলেছিলেন, লেখকদ্বয় তা সবিস্ড়ারে তুলে ধরেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন, 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব শুধু একটি মিথ নয়, এটি একটি মিথ্যাও। এই মিথ্যার অবসান ছাড়া এই উপমহাদেশের কোনো অঞ্চল কিংবা জাতিরই সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। ফলত সম্ভব নয় ভবিষ্যতের সঠিক গতিপথ নির্মাণ করাও। সুতরাং ইতিহাসের নামে বিদ্যমান এই নির্জলা মিথ্যার অবসান ঘটিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' (পৃষ্ঠা-২৬০)।

আমরা লক্ষ করি, বাংলা ও বাঙালির নাটক ও নাট্যচর্চার উপনিবেশীয় ইতিহাসে বিরাজ করছে নানা রকমের নির্জলা মিথ্যা (লিয়েবেদেফ মিথ অন্যতম)। এমনকি আমাদের আলোচ্য 'মৌলিক' ও 'রূপান্ড়রিত' নাট্যপ্রসঙ্গকেও ওই মিথ্যার অন্ড়র্ভুক্ত বললে অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করি। কেননা বাঙালির মৌলিক নাট্যধারণার পরিচয় পেতে হলে মাত্র গুটিকতক নাগরিক নাট্যউদ্যোগকে মুখ্য বিবেচনা করে এগোলে সমগ্র

জাতি-সংস্কৃতি থেকে দূরের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী হয়ে থাকতে হবে। কালপরিক্রমায় ওই বিচ্ছিন্ন দ্বীপকেই সমগ্র দেশ বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রবণতা মুখ্য মনে হতে পারে, তবু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই আমাদের যেতে হবে বৃহত্তর গণমানুষের প্রাঙ্গণে। সেখানে আমরা দেখব, সেই প্রাচীনকাল থেকে জনগণ জীবনযাপনের অনিবার্য অনুষঙ্গী করে তুলেছে তাদের গীতরঙ্গকে। গীত-বাদ্য-নৃত্য-কথার সমাহারে বিভিন্ন স্থান ও কালে বিকশিত হয়েছে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নাট্যআঙ্গিক। নাম-পরিচয়ের দিক দিয়ে তা কখনো 'নাটক' কখনো 'পালা' বা 'কিস্‌সা' 'রঙ্গ' 'কথা' 'কথকতা' বা শুধু 'গান' নামে গণমানসে স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মনে আঙ্গিক-নাম নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা নেই, এ ব্যথা রয়েছে কেবল নাগরিকজনের চিন্ড়ায় ও মননে। অন্যদিকে গীতরঙ্গের বিষয় নিয়েই আপ্লুত ও আলোড়িত হতে থাকেন নগর-দেয়ালের বাইরের মূল জনগোষ্ঠী। শত শত বছর ধরে বাংলার বিস্ড়ৃত প্রান্ড়রে চর্চিত হয়ে আসছে এমন এক গীতরঙ্গের বিষয় হল পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল। বরিশালের গৈলা (ফুলণ্ঢশ্রী) গ্রামের কবি বা আখ্যানকার বিজয়গুপ্ত থেকে শুরু করে হালের গ্রামের কবি-গায়েন এবং নগরের লেখক-সাহিত্যিকগণ ওই সেই একই আখ্যান (চাঁদ সদাগর- মনসা ও বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর) বহু বিচিত্র রূপ-রূপান্ড়রের মধ্য দিয়ে বাংলা আখ্যান-নাট্যের নির্মাণ-বিনির্মাণ হয়ে চলেছে। সে নাট্য মৌলিক না রূপান্ড়র এ প্রসঙ্গ সেখানে নিতান্ড়ই অবান্ড়র। বা যদি বলি, কানা হরিদত্ত (আনু: ত্রয়োদশ শতক; ময়মনসিংহ), নারায়ণদেব (পঞ্চদশ শতক; ময়মনসিংহ), বিজয়গুপ্ত (পঞ্চদশ শতক; বরিশাল), বিপ্রদাস পিপিলাই (পঞ্চদশ শতক; চব্বিশ পরগনা), গঙ্গাদাস সেন (ষোড়শ শতক; ঢাকা), রায় বিনোদ (ষোড়শ শতক; টাঙ্গাইল), দ্বিজ বংশীদাস (যোড়শ শতক; কিশোরগঞ্জ), জগজ্জীবন ঘোষাল (আনু: সপ্তদশ শতক; দিনাজপুর), রাধানাথ রায় (ঊনবিংশ শতক; সিলেট)... ... শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭; কলকাতা), সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮; ফেনী) প্রমুখ মনসামঙ্গল আখ্যানকারের মধ্যে কে মৌলিক বা অমৌলিক– সে প্রশ্ন যে অমূলক তাতে কোনো সন্দেহ কি থাকে?

বাংলার এই আখ্যান-নাট্যের গঠন-কাঠামো, বিষয়-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বিচিত্রতার দিকে মনোনিবেশ করা হলে, তা আমাদের সমৃদ্ধ নাট্যঐতিহ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করবে; কোনোরূপ হীনতাবোধের সুযোগই সেখানে থাকার কথা নয়। এছাড়া আগেই বলেছি নাট্যঐতিহ্যের ধারায় স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন নাম-শিরোনামের অস্ড়িত্ব থাকলেও তা কখনো মুখ্য থাকে না। এই পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলকে প্রধানত (বিশেষজ্ঞ মহলে) কাব্য-আখ্যানকাব্য বলা হলেও বাংলার বিস্ড়ৃত জনপ্রান্ড়রে এর রয়েছে অসংখ্য নাম-উপনাম। যেমন, মনসার গান, ভাসান, প্যাঁচালি, রয়ানি, কান্দনি বিষহরি, পদ্মার নাচন, বেহুলার গান ইত্যাদি। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে গবেষণা বা পর্যালোচনা কালে কোনো কোনো শ্রেণিভুক্তি বা নাম-শিরোনাম প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সেই নাম-শ্রেণি পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠলে নাট্যশিল্পের আসল সৌন্দর্য উপভোগে কিংবা প্রকাশে ব্যত্যয় ঘটতেই পারে। যেমন, নগর নাট্য পরিমণ্ডলে আমরা প্রতিনিয়তই মুখোমুখি হই নানা শ্রেণিকরণ ও বিচিত্র নাম-শিরোনামের– যা কিনা মূল নাট্যবিষয়কে ছাপিয়ে কেবল মুখ্যই হয়ে ওঠে না অনেক সময় গোটা নাট্যপ্রসঙ্গটির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।

যা হোক, প্রাক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলা যায় যে, দর্শকসকাশে প্রযোজনাটির সফল মঞ্চায়ন সম্পন্ন হলে নাটকটি মৌলিক না রূপান্ড়রিত সে প্রসঙ্গ মুখ্য থাকতে পারে না। এবং বলা বাহুল্য, এই অভিমতের সমর্থনে সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ *কোর্ট মার্শাল* আমাদের সামনেই রয়েছে। তবে, সে প্রসঙ্গে যাবার আগে রূপান্ড়রিত নাটক বা নাটকের রূপান্ড়র বিষয়ে অথবা তারও আগে শুধু 'রূপান্ড়র' প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। নাটক বা নাট্যপ্রযোজনা যেমন সংশ্লিষ্ট নাট্যজন এবং দর্শককে এক বিশেষ রূপান্ড়রে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, তেমনি নাটক নিজেই এক রূপান্ড়রের ফল। মানুষের অনুভূতি ও অভিব্যক্তির এক বিশেষ রূপান্ড়র ঘটে নাটকে– তাবৎ শিল্পে এবং বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে এই রূপান্ড়রণে এসে যুক্ত হয় আরো আরো নানা মৌল শিল্পঅনুষঙ্গ– গীত-বাদ্য-নৃত্য-রঙ্গ ও রঙ-রেখা-ধ্বনি ইত্যাদি। অর্থাৎ গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নাটক বা নাট্য নিজেই যৌগিক শিল্পকৃতি। আর এদিকে, নাটকের সাধারণ দর্শক নয়, এমনকি সংশ্লিষ্ট নাট্যজন নয়, কেবল কতিপয় গবেষক-আলোচক ওই সমন্বিত বা যৌগিক শিল্পকর্মটিকে মৌলিক-অমৌলিক ইত্যাকার নানা বিভাজনে ব্যস্ড়। এই ব্যস্ড় তৎপরতার ফল অবশ্য কখনো কখনো মঞ্চ পর্যন্ড় গড়ায়। তখন নাটকের বিষয়বস্তু-বক্তব্য-সৌন্দর্য– এই জরুরি সব প্রসঙ্গ গৌণ হয়ে গিয়ে আঙ্গিক-ভাবনা বা প্রয়োগের কৃৎ-কৌশল এবং নানারকম তত্ত্ব মুখ্য হয়ে পড়ে।

নাটকে ও নাট্যপ্রযোজনায় রূপান্ড়র ব্যাপারটি কয়েকভাবেই ঘটতে পারে। যেমনটা আমরা মনসামঙ্গল আখ্যান নাট্যপ্রসঙ্গে লক্ষ করলাম। অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে নানাজনের হাতে স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশ পেতে পারে। আবার একই প্রণেতার মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় বা অভিব্যক্তি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবলম্বনে বিভিন্ন আঙ্গিকে– কবিতায় গানে ছবিতে বা নাটকে প্রকাশিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের *শাপমোচন* -এর ভূমিকায় বলা হয়েছে: যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে *রাজা* নাটক রচিত তারই আভাসে *শাপমোচন* কথিকাটি রচনা করা হল'। এই একটিমাত্র বাক্যে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি শব্দ বা প্রসঙ্গ এসে গেল– ১.বৌদ্ধ আখ্যান ২.অবলম্বন ৩.নাটক ৪.আভাস ৫.কথিকা। আলোচিত 'রূপান্ড়র' প্রসঙ্গটির অনেক নিকটবর্তী দুটি শব্দ 'অবলম্বন' ও 'আভাস' আমরা এখানে পেয়ে যাই। একই সঙ্গে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে শিল্পসৃজন কিংবা সৃজনপূর্ব বিচিত্র পথ-পদ্ধতির পাঠ গ্রহণ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে, মৌলিক অমৌলিক ও রূপান্ড়র প্রসঙ্গ নিতান্ড়ই অবান্ড়র হয়ে পড়ে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, প্রবন্ধ-শিরোনামের 'রূপান্ড়রিত নাটক' বলতে কেবল ভিন্ন কোনো ভাষার নাটকের অনুবাদ তথা রূপান্ড়রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সাধারণত, নাট্যঘটনা, স্থান ও চরিত্রসমূহের কোনো অদল-বদল না করে কেবল ভাষান্তরকে আমরা অনুবাদ বলে গণ্য করি, আর ঘটনা স্থান চরিত্র ইত্যাদির ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশিকরণ (বঙ্গীকরণ)কে বলি রূপান্ড়রিত নাটক। কিন্তু আমরা খেয়াল করি না যে, অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রেও অলক্ষে থেকে যায় বিবিধ রূপান্ড়র প্রসঙ্গ। উদাহরণ হিসেবে *ওয়দিপাউস* নাটকটির কথা বলা যায়। সফোক্লেস রচনা করেছেন নাটক *ওয়দিপাউস তুরান্নস (Oedipous Tyrannos)*। আমরা দ্বিতীয়-তৃতীয় অনুবাদে পাই *ওয়দিপাউস রেক্স* বা *রাজা ওয়দিপাউস*। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা

রাজা, মহান রাজা, প্রজাহিতৈষী রাজা প্রভৃতি রাজনৈতিক শব্দ ও ধারণায় ঘনীভূত হতে থাকি। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা যায় প্রাচীন গ্রিক ভাষায় রাজা অর্থে বাইসেলিয়াস শব্দ প্রচলিত ছিল। সফোক্লেস বাইসেলিয়াস ওইদিপাউস না রেখে রাখলেন *ওয়দিপাউস তুরান্নস*– যে তুরান্নস শব্দের মানে দাঁড়ায় একনায়ক বা স্বেচ্ছাচারী। তাহলে বোধকরি প্রশ্ন তোলাই যায়– ট্র্যাজেডি তত্ত্বসহ নানাবিধ তত্ত্ব ও মতবাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্ড় ারকারী ব্যবসায়ী ও রাজশক্তি নিজেদেরকে মহান জাতি কিংবা রাজা মাত্রেই প্রজাহিতৈষী অতএব 'অবিচল থেক'– এইসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ধারণা ও কৌশলের গোড়াপত্তন কি হয়নি ওই *ওইদিপাউস* অনুবাদে?

নাটকের রূপান্ড়র বা রূপান্ড়রিত নাটক প্রসঙ্গে উপরের আলোচনা থেকে এ পর্যায়ে এসে 'রূপান্ড়রিত নাটকের সম্ভাবনা' প্রসঙ্গটি নাকচ করতে মন চায়। কেননা এতক্ষণ আমরা দেখলাম, মৌলিক বলি রূপান্ড়রিত বলি– মূল কথা নাটক হয়ে ওঠা নিয়ে। মঞ্চ, অভিনয়শিল্পী ও দর্শক এই তিনের সমন্বয়ে তা কতটুকু সার্থক হয়ে উঠল সেটাই বিবেচ্য বিষয়। তাই বলতে চাই, প্রবন্ধ-শিরোনামটি যথার্থ হতে পারত– 'মৌলিক নাটকের সংকট ও রূপান্ড়রিত নাটকের হয়ে ওঠা'। এই সময়ে দেশে রূপান্ড়রিত নাটকের কথা বললে সবার আগেই উঠে আসে মলিয়ের রচিত *দ্য মাইজার*- এর রূপান্ড় র *কঞ্জুস* নাটকের নাম। 'বাংলাদেশের সর্বাধিক মঞ্চায়িত নাটক' বলে বিজ্ঞাপিত এই কমেডি নাটকটিকে দেশের নাট্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক বললে বেশি বলা হবে না। কেননা, 'মৌলিক নাটকের সংকট' ধারণা বা অভিমতে যারা বিশ্বাসী তারা তাদের নাট্য কর্মকাণ্ড কে দর্শকহৃদয়ে বিশেষভাবে গেঁথে দেয়ার লক্ষ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই এই *কঞ্জুস* বা এর মূল রচয়িতা মলিয়ের-এর অন্যান্য নাটক নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা করতে চান। মলিয়ের যে সমাজ-সময় ও মানুষের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অসাম্যকে তাঁর রচনার মাধ্যমে হাস্যরসাত্মকভাবে তুলে ধরেছেন, রূপান্ড়রিত নাট্যপ্রযোজনায় সেখানে দেখা যায় আর্থ-সামাজিক বাস্ড়বতাহীন কিছু হাস্যপ্রসঙ্গ মাত্র– রস বা শিল্পরস সেখানে অনেকটাই উপেক্ষিত। অবশ্য এ মন্ড়ব্যকে খণ্ডিত বলেই বিবেচনা করতে হবে। কারণ তারিক আনাম খান কর্তৃক রূপান্ড়রিত নাটকের পাণ্ডুলিপি ও এর মূল প্রযোজনা দলের প্রযোজনাটি এখনো অদেখা রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মৌলিকতম প্রসঙ্গ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সেই মুক্তিযুদ্ধের এক বীরাঙ্গনা মায়ের সন্ড়ান আকবর। সেনাবাহিনীর সিপাহি আকবর মুখোমুখী হয় নিজ গ্রামের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকারপুত্র মেজর এফ এ খানের। রাজাকারপুত্রের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয় বীরাঙ্গনা মায়ের পুত্র। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধে কাউকে না কাউকে রুখে দাঁড়াতে হয়। তাই আকবর একদিন মেজর খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মারা পড়ে আরেক অফিসার এবং আহত হয় মেজর এফ এ খান। ফলস্বরূপ অনুষ্ঠিত হয় কোর্টমার্শাল। থিয়েটার আর্ট / ইউনিট প্রযোজিত এস এম সোলায়মানের এই নাটকটি যে বিদেশি কোনো নাটকের রূপান্ড়র তা সাধারণ দর্শককে না-বলে দিলে বিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। স্বদেশ দীপক রচিত হিন্দি ভাষার নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছেন সলিল সরকার। সেই অনুবাদ থেকে এস এম

সোলায়মানের রূপান্ড়র ও নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে *কোর্টমার্শাল*। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার দুই দশক পরে শহীদজননী জাহানারা ইমামের আহ্বানে এই বাংলার মাটিতে আবার ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় থিয়েটার আর্টের প্রযোজনা *কোর্টমার্শাল*-এ 'ওই রাজাকারের বাচ্চাকে আমি খুন করে ফেলব' বলে হুঙ্কার দিয়ে মঞ্চের সিপাহি আকবর যেন সেই ঘাতক-দালাল বিরোধী আন্দোলনকেই আরো বেগবান করে তুলছিল। এ কারণেই *কোর্টমার্শাল* নাটক মৌলিক না রূপান্ড়র সে প্রশ্ন কখনোই সামনে উঠে আসে না। এ ছাড়া কেবল বাংলাদেশের একাত্তরের সুনির্দিষ্ট ঘাতক-দালাল মাত্র নয়, গোটা পৃথিবীর অন্যায়-অনাচার সুস্পষ্ট নির্ঘোষ রূপে দাঁড়িয়ে যায় এই দৃশ্যকাব্য, এই *কোর্টমার্শাল*। এই নাট্যানুষ্ঠান খুব সহজেই সমবেত জনমানুষকে একটা আলোচনার দিকে ঠেলে দেয়। দর্শক হিসেবে কোনো নিষ্ক্রিয় উপাদান নয় বরং ওই নাট্যআয়োজনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেকে বাস্ড়ব চারপাশের অনিবার্য দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অর্থাৎ নাট্যঘটনার ক্রমপরিণতিতে *কোর্টমার্শাল* নাটক আর নাটক থাকেনি, তা একটি সামাজিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। আর এর ফলেই এস এম সোলায়মানের নাট্যকৃতি যথার্থ ও পরিশীলিত রাজনীতির থিয়েটারের জরুরি অথচ প্রায় শূন্য প্রাঙ্গণে বেশ বড় একটি জায়গা করে নেয়। *কোর্টমার্শালের* কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সিপাহি আকবর এই ভূখণ্ডের ইতিহাসের বড় এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সেই সত্য যা 'হাতের তালুতে রাখা আগুনের মতো, ধিকিধিকি আগুন!'

স্বদেশ দীপকের হিন্দি নাটক *কোর্টমার্শালে* সিপাহি রামচন্দ্র নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারণে তাকে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত। পদস্থ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন বিডি কাপুরের আর্দালি ডিউটি থেকে সরে আসায় রামচন্দ্রকে পথেঘাটে গালাগাল ও অপমান করেই যেত। খুনের রাতে ক্যাপ্টেন বর্মা ও ক্যাপ্টেন কাপুর গার্ডহাউসের সামনে মোটরসাইকেল থামিয়ে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল: 'ফর্সা মেথর! হারামির বাচ্চা! তোর মা নিশ্চয়ই কোনো কাপুর কি বর্মার সঙ্গে শুয়েছিল'। ঘৃণায় ক্ষোভে যন্ত্রণায় হাতের রাইফেল উঁচিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নৃশংসতার প্রতিরোধ করেছিলেন সিপাহি রামচন্দ্র। এস এম সোলায়মানের *কোর্টমার্শালে* যেমন দেখি মুক্তিযোদ্ধাজননীর সন্ড়ান আকবরকে প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করতে হয় একদিকে যেমন দারিদ্র্যের অপমান অন্যদিকে বীরাঙ্গনা মাকে নিয়ে স্বাধীনতার শত্রুর উত্তরাধিকার বহনকারী মেজর এফ এ খানের কুৎসিত আক্রমণ! ফলে সব ধরনের প্রতিবাদ, প্রতিকার প্রার্থনা ইত্যাদি নানা নিয়ম-শৃঙ্খলার স্ড়র অতিক্রম করে অনিবার্য গন্ড়ব্য সরাসরি প্রতিরোধের ভূমিতে 'দ্বিধাহীন মুক্তিযোদ্ধা' আকবরকে বলতে শুনি 'আমি খুন করেছি, শাস্ড়ি দিন'। এই শাণিত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আকবর ব্যক্তিমানুষের স্ড়র অতিক্রম করে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান এবং একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ কোটি কোটি বাঙালি জনগণের সম্মুখে করণীয় পথনির্দেশ তৈরি হয়ে যায়। আর এভাবেই *কোর্টমার্শাল* হয়ে ওঠে একটি পরিপূর্ণ নাট্যঅভিজ্ঞতা।

পরিশেষে আবারো বলি, ‘মৌলিক নাটকের সংকট’ ব্যাপারটি কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর সংকট এবং এই সংকটের যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রকরণের সহযোগে নবতর প্রয়োগশৈলীর মাধ্যেমে পরিপূর্ণ হতে পারে আমাদের প্রিয় নাট্যপ্রাঙ্গণ।

১ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ । । ১৫ নভেম্বর ২০১২
[থিয়েটার আর্ট ইউনিটের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে আন্ড়র্জাতিক নাট্য উৎসব ২০১২-তে পঠিত।]

কবিতা

স ত্ত রে র দ শ ক

মো হ ন রা য় হা ন

ও জল ও তৃষ্ণা

দু চোখে আমার তৃষ্ণা অথচ সমুদ্র বহুদূর
তৃষ্ণার খুব ভেতরে রয়েছে একটি লাল গোলাপ
বহুদিন থেকে তাকে আমি শুধু চুম্বন দেব বলে
বিশুষ্ক করে রেখেছি ঠোঁটের নিজস্ব আগ্রহ

সাহারা মরুর মতো দুই চোখ সে চোখের ভিনদেশে
খেলা করে শুধু ধু ধু মরীচিকা মায়া আর বিভ্রম
আর আমি সেই ভুলের মাটিতে রেখে আসি স্বপ্নকে
বিনীত কাতর মানুষের মতো ছুটে যাই বারবার

একদিন এই পোড়াজমি আর শ্মশান পেরুতে হবে
দূর মরীচিকা পাড়ি দিতে হবে জাহাজের মতো একা ।

০১.১০.১৯৭৮ ঢাকা কলেজ, ঢাকা

কৃষক

এই মাটি চষে ফলিয়েছি আমি সোনার ফসল বহু
রোপণ করেছি আমি যেই বীজ রক্তে মাংসে ঘামে
বেটার মতন সেই প্রিয় ধন আমার হয় নি কভু ।

আমার বুকের উষ্ণতা নিলে ছেনাল সভ্যতারা
হাড়ে হাড়ে দেখ জমেছে সাদা বরফের কণা
মৃত মানুষের দেহের মতন মাটি কাদা মেখে পড়ে আছি কতকাল ।

অস্থি ও মেধা ধারালো নখরে ছিঁড়ে নেয় কালো করাল হাঙর
কুয়াশায় ভেজা শীত রাত্রির মতন দুঃখে এই তো জীবন কাঁপে
কষ্টের এই তন্তুতে বোনা সকল আঁধার কেবল আমার থাকে ।

আজ শুধু ভাবি বুনি যে ফসল সে আমার নিজ কষ্টকে বোনা
নিজের হাতেই নিজের বেদনা বোনা
কাটি নি ফসল এতকাল আমি কেটেছি নিজের হাড় ।

শস্যের ঘ্রাণ টেনে নেয় ফের সবুজের কাছে
সবুজ আমার ফসল আমার শস্য আমার রক্তে রয়েছে লেখা
আমাকে ফিরিয়ে দাও হে আবার কৃষকের সজীবতা ।

০২.০১.১৯৭৯ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা ।

ইথিকা আমার ইথিকা

ইথিকা আমার ইথিকা এখন জেলে
ভালোবাসার অপরাধে রাজবিধি তার দিয়েছে দণ্ডাদেশ
আমাদের দুজনার মাঝে একটি দেয়াল আজ রয়েছে দাঁড়িয়ে
ভেতরের ছোট্ট এক সেলে ও যে কখন কেমন থাকে
আমি জানি না আমি জানি না ।
কোনোদিন হবে না কি মিলন আবার?
আমাদের আলিঙ্গনে নিবিড় ভালোবাসায়
আমাদের রক্তে বীর্যে জন্ম নেবে না কি একটি বলিষ্ঠ শিশু?

রাতে চাঁদ ওঠে বেতসের ঝাড়ে
জোছনার প্লাবন নামে ঝিঁঝিরা বাজায় সুর
আমি ঘুমাতে পারি না ঘুমাতে পারি না ঘুম আমার আসে না
সকালের সোনামাখা রোদের উদ্ভাস আমাকে চঞ্চল করে
ইথিকা আমার ইথিকা এখন অন্ধকারে ।

তবু বুক বাঁধি প্রত্যাশায় বুনি নক্ষত্রের স্বপ্ন মনে
একদিন ওই দেয়াল উপড়ে ফেলে বাহুর বন্ধনে
অস্থির চুম্বনে আলুথালু করে দেব ওর কেশ ।

শুধু ভয় হয় যদি ইথিকা হারিয়ে যায়!
কারাগারের সেলে লকাপে হাসপাতালে পাগলা গারদে
কোথাও যদি না খুঁজে পাই, যদি দেয়ালের ধারে
পাওয়া যায় ওর ধর্ষিত দেহের হাড়, মাথার খুলি
আমি ভাবতে পারি না ভাবতে পারি না আমি ভাবতে পারি না ।

আপনারা যদি কেউ স্নেহবান পিতা হন স্নেহময়ী মা
দরদী ভাই হন বিশ্বস্ত প্রেমিক
পাশে এসে দাঁড়ান আমার ।

ওই দেয়াল ওই কারাগার ভেঙে ফেলে
আমি আমার ইথিকাকে ছিনিয়ে আনবো
আমাদের অনিবার্য মিলনের ফসল

একটি সোনার শিশু আমি তার ভ্রূণ এঁকে যাব ।

ইথিকা আমার ইথিকা এখন জেলখানায়
আমি তাকে ছিনিয়ে আনব আমি তাকে ছিনিয়ে আনবই ।

২০.০৩.১৯৭৮ দেশ মুদ্রণ, সিরাজগঞ্জ

অস্ত্র

‘কোথায় রেখেছ, কোথায় কয়টি আছে বল্?’
পুলিশের বড়কর্তা বারবার শুধালেন–

‘বল্ শালা, শূয়ারের পুত, কোন্খানে রেখেছিস?’
ধমকে দালান ফাটে, নিরুত্তর ফাটে না আমার বুক
চোখ রাঙা করে সিআইডি অফিসার
খুলে দেয়া গোয়েন্দা রিপোর্ট বুক : ‘এই যে দেখুন স্যার ।’
অকস্মাৎ ভারী ঘুসি এসে পড়ে নাকে
মুখে চোখে বুকে পাঁজরে তলপেটে
লাঠি ও বুটের শব্দে
দুলে ওঠে ত্রিভুবন কতক্ষণ দুলেছে জানি না

জ্ঞান ফিরে এলে শুষ্ক জিভে ঠোঁটের কিনারে জমে থাকা
কালো রক্ত চেটে
হেসে উঠি :
দুটো গ্রেনেড আমার চোখ
স্টেনগান এই নাক
পাঁজরের হাড় রাইফেল
লাইট মেশিনগান হাতদুটো
ট্যাঙ্ক আমার পা
তবু ওরা কোনো অস্ত্রই খুঁজে কেন যে পেল না?

কালো কিষানের গান

এসো আরো কাছে এসো কিষানী আমার
এই শক্তহাতে তুমি তুলে দাও কাস্তে
নবান্ন উৎসবে ভরে উঠুক উঠান!
তীরভাঙা নদীতীরে জেগে-ওঠা চরে
গড়ব নতুন জনপদ জীবনের;
মিলনের মোহনায় জাগাব জোয়ার
পাহাড় ও নদীর গানে ।
তোমার মেহেদি নম্র হাত মেহনতে
আরো রাঙা হোক সুষম বণ্টনে
শস্যের সুঘ্রাণ মাখা যৌবন তোমার
বিপ্লবের মন্ত্র হোক শোষিতের খুনে

যদি আসে ঝড় মহাপ্লাবনের দিশা
নূহের নৌকার মতো তুলে নিও বুকে
যদি বর্গি এসে লুটে নিতে চায় ধান
ইলামিত্র হোয়ো তুমি, আমি দ্রোহী হাজং
শড়কি বল্লম হাতে দুইজনে তেজে
শত্রুর মস্তক চূর্ণ করব উৎসবে ।

যদি নিভে যায় যাক জোনাকির আলো
তোমার রূপেই যেন হয় আলোকিত
তাল তমাল আর হিজলের ছায়াতল ।

সুলতান এঁকেছেন যেরকম ছবি
সেরকম বলবান দৃঢ়পেশি তেজি
হোক আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ

এসো বাহুর বন্ধনে আরো কাছে এসো
সোনার যৌবন মুক্ত করো নম্রপলি
কর্ষণে উদ্বুদ্ধ করো নিভৃমি চাষাকে ।

জোছনার ভেতরে বাড়ি ফেরা

জোছনার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক' দিন
এ রকম বহুদিন আমি বাড়ি ফিরি নি ।

বাড়ি বলতে সেই যমুনার স্মৃতি :
বুকের ভেতরে বেদনার নদী
আমার মা; জেগে থাকে সারারাত
জরাজীর্ণ শীর্ণকায় ছায়া ফেলতে ফেলতে
ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে হিম মৃত্যুর গুহায়
খুক্‌কুক্‌ কাশি আর ঘুমের মধ্যে আমার নাম ধ'রে
ডেকে ওঠে– খোকা এলি নাকি?
জোছনার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক' দিন
বাড়ি বলতে মেঠোপথ গাঁয়ের হালট
শিশিরে ভিজে থাকা ঘাস নরম চাষের ভূঁয়ে
শুয়ে থাকা হলুদ চাঁদ সারি সারি গাছ বাঁশঝাড়
ভুতুড়ে ছায়া বনফুলের গন্ধ ।
জোছনার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক' দিন
আঁকাবাঁকা নদীটির ভাঙাচোরা কূল বেয়ে
শৈশব কৈশোর যৌবনের স্রোতে
কতদূর ভেসে এসেছি আজ এখানে
কত প্রেম-বিরহের স্মৃতি নিয়ে
আজো হেঁটে যাই এই পথে

কতখানি বেদনায় এই মাঠ এই নদী আকাশের
অগণন তারা কালের প্রবাহে জেগে আছ?
তবু কি শুনতে পাও কোনো পথিকের ভাঙা পাঁজরের
চাপাকান্না?

জোছনার ভেতরে বাড়ি ফিরছি ক' দিন
চরাচর মাঠ ফসলের আদিগন্ত জমি
ভেসে যায় ভেসে যায় চাঁদের বন্যায়
হু হু করে ওঠে মন

এ রকম জোছনায় কোনোদিন তোমাকে নিয়ে
পথ হাঁটা হল না আমার ।

ভোরস্বপ্ন

এ রকম ভোরস্বপ্ন তোমাকেও উষ্ণ উন্মাদিনী করে তোলে?
টানটান নদীর জলের মতো উচ্ছ্রিত জোয়ারে
ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে শরীরের প্রতিটি লোহিত কণা?
ঘূর্ণির মতন পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাক দিয়ে ওঠে
ভূমিকম্পের মতন কেঁপে কেঁপে ওঠে নাভিমূল
বন-কাঁপানো ভয়ংকর গর্জনে সহসা গভীর ঘুম
থেকে জেগে ওঠে রক্তপিপাসু বাঘ!

বিশ্বাস করো, ঘুমাবার আগে বা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও একবার
ভাবি নি তোমার মুখ; এমনকি সারারাত অন্যান্য টুকরো
টুকরো স্বপ্নে বহুবার ভেঙে গেছে ঘুম অথচ অনিকেত ভোরে
কবিতার অসহ্য সুন্দর দৃশ্যকাব্যের মতন অপূর্ব নগ্ন উদ্ভাসে
আমার লোমশ বুকে মুখ ঘসে তুমি বললে,
‘কতদিন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় চৈত্রের মাটির মতন চৌচির হয়ে আছি
আজ আমি চাই আষাঢ়ের বর্ষণের মতন সম্পূর্ণ তোমাকে’
অঝোর বৃষ্টির মতন চুম্বনে ভরে দিলে সমস্ত শরীর
গভীর আলিঙ্গনে তুলে নিলে যেন এভারেস্ট চূড়ায় ।

মৌমাছি উড়ে যাওয়া মধুচাকে মুখ ডুবিয়ে দিতেই
সুমসৃণ হাঁটু ভাঁজ করে খুলে দিলে পৃথিবীর স্বর্গদ্বার
আজন্ম আতপ্ত আমূল তৃষ্ণার্ত আমার জিহ্বা তোমার
কোমল-কস্তুরী স্পর্শের অদ্ভুত শিহরণে তুমি কঁকিয়ে ওঠার
সঙ্গে সঙ্গে কি নিষ্ঠুর জল্লাদের মতন কে যেন ভেঙে দিল আমার
এ-যাবতকালের শ্রেষ্ঠতম মধুস্বপ্ন!

এ রকম স্বপ্নভঙ্গের চেয়ে মৃত্যুই কি কাম্য নয়
কী রকম কষ্ট-যন্ত্রণার এই জাগরণ তুমি কি বুঝবে কোনোদিন?
লোকে বলে, ভোরস্বপ্ন বৃথা যায় না কখনো, ভোরস্বপ্ন নিরানব্বইভাগ ফলে

আমার প্রার্থনা আজ থেকে যেন মাত্র একভাগ অসম্ভাবনা পূর্ণ করে
হে আমার স্বপ্নেশ্বরী, তুমি আমার ভোরস্বপ্ন বাস্তবায়িত করো ।

২৬ আগস্ট ২০০৯, ঢাকা

আমার মা

আমার মা ছিলেন চাঁদের মতন রূপসী
যে কারো নজর কাড়ার মতন আকর্ষণীয় ।

পঞ্চাশ বছর আগে আমি যখন কিছুটা বুঝমান
মা তখন যৌবনবতী কী সুন্দর মাথার ওপরে মৃদু ঘোমটায়
নিজেকে শালীন করে রাখতেন ঘরে বা বাইরে
মা ছিলেন আশপাশে দশ গ্রামের সবচে কুলীন রমণী
কিন্তু আমি কখনোই মাকে বোরকা হিজাব পরতে দেখি নি ।

মা আমার এখন সত্তরোর্ধ্ব শীর্ণকায়
গুটিসুটি চামড়ায় বয়সের জীর্ণজরা
ছানিকাটা চোখ দ্যুতিহীন ঠোঁট চিরে উঁকি দেয় দাঁত
বুকে জড়িয়ে ধরলে হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাই না টের
কান্নায় ঝাপসা হয়ে আসে চোখ হু হু করে ওঠে বুক
মা, মা গো গর্ভধারিণী কত দুঃখ কষ্ট আঘাত-না দিয়েছি ।

সময়ের চাকায় নিপিষ্ট মলিন আমার মা
এখন বোরকা হিজাব ছাড়া যান না বাইরে
এমনকি নিকটজনের সামনেও টেনে টুনে
ঢেকে রাখেন নিজেকে ।

আমি বলি মা, এ বয়সে কে তোমাকে নজর দেবে
কেন এত রাখ-ঢাক তোমার সবার কাছে?
মা হাসে, বাবা রে সময় পাল্টিয়ে গেছে দেখো না
কত কমবয়েসী মেয়েরাও এখন কতটা পর্দানশীন ।

আমি অবাক হয়ে ভাবি মা আমার কত আধুনিক
সময়ের সাথে পা মিলিয়ে চলে
সত্যি সময় বদলে গেছে, ত্রিশ বছর আগেও স্কুল কলেজ
বিশ্ববিদ্যালয় পথে ঘাটে এত বোরকা হিজাবের
ছড়াছড়ি ছিল না, দুরন্ত তারুণ্য তেজ মেধা আর
মননের ঝলকানি ধর্মের খোলসে আজ ঢেকে যায়

ভাবি, কিভাবে অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযোদ্ধার মাকেও
গ্রাস করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা কী সুকৌশলে
বেড়ে ওঠার সূতিকাগার ঘর আর বিদ্যাপীঠের
চোখ কান নাক কেশ ঢেকে দিচ্ছে অমাবস্যার
নিকষ অন্ধকারে ।

৩০.০১.২০১২ ইস্কাটন গার্ডেন

কুকুর

এক ভাষার বুলি আরেক ভাষার গালি
তবু কুকুর বলে গালি দেব না তোমাকে
কুকুর মহৎ প্রাণী, এত নিরীহ যে আঘাত না করলে
কাউকে সে কামড়ায় না বরং অধিকাংশ সময় ভয়ে দৌড়ে পালায়

কুকুরের মতো প্রভুভক্ত প্রাণী পৃথিবীতে আর কয়টি আছে?
কী সুন্দর লেজ নাড়ে যখন তার নাম ধরে ডাকা হয় কিংবা
দেয়া হয় পছন্দের খাবার

তাড়িয়ে দিলেও সে বার বার ফিরে আসে
বাড়িতে ঢুকতে না দিলেও সারাদিন আশপাশে ঘোরে
কী নম্র কান্নার সুরে জানায় তার ফরিয়াদ

অসহায় করুণ চোখে কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটিসুটি
বসে থাকে প্রভুর দরজায় কী তার অপরাধ? মাঝে মাঝে
ভাঙা গলায় ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে মাঝরাতে চুপিসারে

কুকুরের মতো প্রেমিক প্রাণী কি আছে আর এ জগতে?
সারারাত পাহারা দেয় মনিবের বাড়িঘর সম্পদ
এতটুকু সন্দেহের ছায়া দেখলে তারস্বরে তেড়ে যায়

ভয়ঙ্কর চিৎকারে জাগিয়ে দেয় মনিবকে
প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর
অকাতরে প্রাণ দেয় অন্ন আর আশ্রয়দাতার জন্যে

তবু কেন মানুষ মানুষকে 'কুত্তার বাচ্চা' বলে গালি দেয়
ক্ষুধার্ত গরিব কুকুর কখনো মানুষের বর্জ্যে মুখ দেয় বলে?
তুমিতো মানুষ হয়েও মানুষের রক্ত-হাড়-মাংস-মজ্জা চিবিয়ে খাও

এমনকি অর্থ বিত্ত ক্ষমতার লোভে
তোমার প্রভুর কুকুরের বিষ্ঠাও পৃথিবীর সবচেয়ে
সুস্বাদু প্রসাদ বলে খেয়ে ফেলে পরম তৃপ্তির ঢেকুর তোলো

তোমাকে কি বলে প্রশংসা করব– হে আদর্শচ্যুত পয়মাল?
১৩.০৯.২০১২ ঢাকা

মেঘের শরীরে যাব

মেঘের শরীরে যাব ছোঁব তার করমচাঠোঁট
হিমেল কুয়াশা ফুঁড়ে থোকা থোকা শুভ্র কাশফুল
সবুজ নরম ঘাস গোলাপগালিচা আমন্ত্রণ
নক্ষত্রের কারুকাজ বোনা রেশম চাদর পাতা
উড়ে যাব ভিন্ন গ্রহে আর কেউ পৌঁছে নি যেখানে

মেঘের শরীর এত কম্প্র মধুময় শিহরিত
তুলতুলে খরগোশ ডুবে যায় মিহিন আঙুল
বিস্তীর্ণ সমুদ্র বয়ে যায় ধীর ক্ষিপ্র নীল ঢেউ
আগ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভা দুলে দুলে ফুলে ওঠে

মেঘের শরীর এত জাদুময় বিচিত্র বৈভব
মেঘের শরীরে যাব প্রজাপতির রঙিন ডানা
সমস্ত শরীর যেন বিষ্টিভেজা রোমশ কদম
মেখে নেব মেঘসুখ তনুময় জলফুল রেণু
শ্রাবণের অঝোর ধারায় ভিজে যাব তপ্তঘাম

থইথই ভরাগাঙ উপচে উঠেছে ঘোলাজল
আদিম সোমের ভেলা ভাসায় নব্যবেহুলা মেঘ
লখিন্দর ফিরে পায় প্রাণ জেগে ওঠে পুনরায়

মেঘের শরীরে যাব বহুদূর মেঘের ভেতর
সাদা সাদা নীল নীল ছাই রঙ লাল কালো পীত
রোদবৃষ্টি বিদ্যুৎঝড় জ্বলে পুড়ে ভিজে একাকার
মেঘের শরীরে যাব খরার আগুন পোড়া দাহ...

২৪.০৭.২০১২ ঢাকা

ঝ র্না র হ মা ন

অবাক রুমাল

আমরা হেঁটেছি পথ বহুদূর– আমাদের
কবেকার অন্তঃপুর ভুলে গেছে নাগরিক ঠিকানা ঠিকুজি
প্রতিদিন পথচলা আমাদের পুঁজি ।
বহুদূর পথ-হাঁটা আমাদের হাতেপায়ে ধুলো
আমাদের শুকনো জিভ ক্লান্ত দেহ আড়ষ্ট আঙুল
তৃষ্ণাকাতর খুব-আমাদের চোখমুখ নাক ঠোঁট আমাদের চুল ।

আচমকা আমাদের চারপাশের জেগে ওঠে চর
বাতাসের কালো ঝুল উড়ে যায় গলে পড়ে জমাট কার্বন

হাজার ভিস্তিওয়ালা মুহূর্তে ধুয়ে দেয় ধুলোর শহর
আমাদের চারপাশে জেগে ওঠে অপার্থিব নদী আর মুক্ত জলাশয়

আচমকা আমাদের মনে হয়
শহরের রাস্তাগুলো– বাসট্রাকরিকশাভ্যান সিএনজিস্কুটারঠেলাগাড়ি
ভিক্ষুক পটেকমার ভাসমান জীবিকা মিছিল
স্কাইস্ক্রেপার বাজার শপিংমল ইলেকট্রিক তার– তার– জটিল ধাঁধার
ফাঁদে আটকানো বোকাসোকা আকাশের বিপর্যস্ত নীল
থেমে পড়ে সবকিছু 'স্টপ' সিগনাল-জ্বলা অসমাপ্ত সেতুর ওপারে...

থেমে পড়ে একেবারে
নগরের কয়লা ও কারখানা বস্তিনিবাস উলুঝুল চুলদাড়ি
মিনারে প্রচণ্ড শব্দে ফুটতে-থাকা আগুনের খই
আমরা তখন কেউ নগরের নই
আমরা উঠছি ফুটে তুলোখোলা উড়োডানা পেঁজা কার্পাস
আমাদের চারপাশে থই থই ঢেউ তোলে
অথৈ শূন্যের পরে তীব্র আকাশ্ শ্ শ্ শ্ শ্ ।
আমরা পেরিয়ে যাই অসমাপ্ত সেতু
আমরা যেহেতু
মূলত চর ও নদীর আন্তঃসন্ধিস্থলের মানুষ ।

আমাদের নদী থেকে উঠে আসে
অপার্থিব তরঙ্গের রজতমুদ্রাভরা মায়া সিন্দুক
আমাদের লোমকূপে তৃণলতা, বন্যগন্ধ আদিমাটি পলির মাখন
আমরা যখন জলাশয়ে মুখ দেখি
আমাদের আঙুল থেকে ক্রমাগত জন্ম নেয় লালনীল মাছ
আমাদের দেহ থেকে চারপাশে বেড়ে ওঠে গাছ
আমাদের বাহুমূলে ফুঁসে ওঠে শঙ্খলাগা সাপ
আমাদের ভাষা থেকে চাপচাপ আলো আর
রৌদ্র আর নৈঃশব্দ্যের ঢেউ...
আমাদের কেউ বাতাসে উড়িয়ে দিই অবাক রুমাল
আমরা স্থাপন করি প্রণয়ের তীরচিহ্ন তীব্রতম লাল ।

দরজা

দরজাটায় কেউ হাত রেখেছে!
হাত দিয়ে ঠেলে কোনো লাভ হবে না। দাদার আমলের দরজা ওটা
খুব ভারি আর দশাসই পাল্লা। তা ছাড়া– ওতে আছে
প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের কাঠখোদাই। তার খাঁজে খাঁজে
বোলতা আর কুমোর পোকার পাকাপোক্ত টনটনে পুইন!

দরজাটায় আলতো টোকা!
টোকা দিয়ে কোনো লাভ হবে না।
নিরক্ষর মূর্খ ওটা। একেবারের আদিম চাষা।
কয়েকটা ঋতু পরিক্রমা আর
কয়েকটা উদয়-অস্ত'র খবর ছাড়া ওর এখন আর কিছুই মনে নেই
তবে ছেনি আর করাতের আওয়াজের একরকম ধাতুমন্ত্র জানা আছে ওর
আঙুলের তিন বা চার টোকায় ও কিছুই বোঝে না।

দরজাটায় কেউ করাঘাত করছে!
করাঘাতে কোনো ফল হবে না। ওটার হুড়কোতে জং ধরা।
ডাকাতের ভয় ছিল একদা।
তাই হুড়কোর পরে আছে আঁটাআঁটি খিল
আকরিক লৌহদণ্ড দাবানলে পোড়া কাঠ গাছের ফসিল।

দরজাটায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে–
লাভ হবে না। ও বড় শক্ত চিজ!
ওর ইতিহাসে ঘুণ নেই। উঁই নেই। নিপাট নিরেট ওটা। চরম পাথুরে।

দরজাটায় দমাদম লাথি পড়ছে!
লাথি দিয়ে লাভ হবে না!
ওর যে কাঠ! ওর গাছের গুঁড়িতে গা ঘসতো বন্য হাতির পাল
ওর যে বন! সূর্য থেকে সহস্র বছর খাড়া এসে পড়েছে
ঝাঁক ঝাঁক আগুনের তীর। ঝাঁঝিয়ে উঠেছে সবুজ রক্ত
ওর যে নকশা– ওটা এক গুপ্ত সংকেতমালা
দিব্যপ্রভ মানচিত্রের সংজ্ঞা লেখা তাতে
দরজাটা খোলার মন্ত্র কেউ জানে না।

দুটি কাপ

টেবিলের কাপ দুটি– কফি খাওয়া শেষ
ওদের দেখ, একটি কেমন সুখী! হাসছে!
এত হাসি যে ওর ঠোঁটের লিপস্টিক সরে গেছে গালে
আর সাদা রঙ আনন্দে কেমন ঝকমক করছে!
আর একটি কাপ! বিষণ্ন! দূরে বসে আছে ।
যদিও ছেড়েছে সিগ্রেট, তবুও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তার মুখ!
সমস্ত শরীরও ধূসর
এ কাপটি দুঃখী ।
তবে তার গভীর শপথ– সুখী কাপটির কাছে যাবে
কফিশপের টেবিল একদিন সে সুযোগ করে দেবে
দুঃখী কাপটি তার অপেক্ষায় থাকে
সুখী কাপ এসব ভাবে না ।

এই জনপদে একটি মেয়ে

চৌঠা ফেব্রুয়ারি । সোমবার । আমার জন্মদিন ।
ভোরের আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে টের পেলাম
আমার চুলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে কার স্নেহকোমল হাতের আঙুল,
কপালের ওপর ফিসফিস প্রার্থনার শব্দ । আমার মা ।
কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে আমায় বলছেন – শুভ জন্মদিন ।
আমি চোখ খুললাম । সকালের জায়নামাজ থেকে উঠে আসা –
ঘোমটার বেষ্টনীতে আমার মায়ের মমতাভরা মুখ ।
আমি আবার চোখ বুঁজলাম । মিষ্টি ঘুমের হালকা দোলনায় শুয়ে
মা, তোমাকে দেখলাম ।

কিন্তু মা, তুমি কি জানলে, মাত্র এক ঘণ্টা পরেই আমার দিনটি
কেমন কালো গর্তের ভেতরে ঢুকে গেল! গলা চেপে ধরা কেমন
একটা বিভীষিকা আমার চোখের ভেতর সজারুর মতো কাঁটা
বাগিয়ে বসে থাকলো?

সকালের নাশতার পর হাতে তুলে নিয়েছিলাম খবরের কাগজ ।
কালো কালিতে মাখা– যেন-বা চারকোলে আঁকা একটি ছবি ।
মানুষ – কিছু মানুষই মহা উল্লাসে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলা
ছিনতাইকারীকে পেট্রোলের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ।
একজন জীবন্ত মানুষের পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার খাণ্ডবদাহন
গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখছে সব পথচারী ।
আমি দুচোখ বন্ধ করে ফেলি । আমি দেখতে চাই না এ ছবি ।
বন্ধ হোক এ নৃশংসতা । অন্ধকার দূর হোক । আলো–
আলোর দেবদূতেরা পাখনা মেলে নেমে আসুক এই
পেট্রোল-পোড়া অঙ্গার জনপদে ।

আমার চেতনায় যখন বাজে এ স্লোগান – ঠিক তখুনি
বেজে ওঠে টেলিফোন । চন্দন – বড় আপার ফার্স্ট ইয়ারে পড়া
ছটফটে ছেলেটা – যাকে ক'দিন আগে কিডন্যাপ করা হয়েছে
রামপুরার ডোবায় তার লাশ পাওয়া গেছে ।
ওর হাতের আঙুলগুলো কাটা । চার হাত-পা পিছনে মুড়ে বাঁধা ।
চোখ বাঁধা কালো কাপড়ে । আর মুখের ভেতর
ঠেসে দেয়া আছে একটি টকটকে লাল আপেল ।

আমি চিৎকার করে উঠি । আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ।
আমার বমি পাচ্ছে । আমার সারা শরীর যেন অজগরের হা-এর
ভেতর দিয়ে – লালার ভেতর দিয়ে – কালো বিষের ভেতর দিয়ে
গলগল করে ঢুকে যাচ্ছে । আমার চৈতন্যে এক অস্থির গোঁয়ার
ট্রেন চলে । তীব্র হুইসেল বাজে । হুইসেল থামে না... ।

কলেজে গিয়ে শুনতে পাই – গতকাল বাসায় ফেরার পথে
আমাদের সিনিয়র আপা অনিন্দ্যসুন্দরী মহুয়াকে
একটি মাইক্রো আর কটি মুখোশধারী তুলে নিয়ে গেছে ।
মা, এ খবর শুনে তুমি ভয়ে সাদা হয়ে গেছো ।
আব্বাকে দিয়ে কুয়েতি বোরকা আনিয়েছো । আমার পায়ের পাতা
থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মুড়ে দিয়েও তুমি শান্তি
পাচ্ছো না । আর অন্ধকারের মতো কালো এ পোশাকের ভেতর
ঢুকে মনে হচ্ছে আমি কবরের ভেতর বসে আছি ।
আমার চৈতন্যে কবরের নিঃস্তব্ধতা ঢুকে যাচ্ছে ।

প্রখর রৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে মাটি । সবুজ গাছপালা । রঙিন ফুল ।
মারী মন্বন্তরে ছেয়ে যাচ্ছে আমার সময় ।
আমি পোকার মতো গুটিয়ে যাচ্ছি । মরা পাতার মতো
শুকিয়ে যাচ্ছি । ধুলোর মতো মিলিয়ে যাচ্ছি ।
চন্দনের কণ্ঠ রোধ করা টকটকে আপেল আমারও মুখের ভেতর
ঢুকে যাচ্ছে । অগ্নিস্রাবী পেট্রোলে আমায় কেউ পৈশাচিক স্নান
করাচ্ছে । ধর্ষক মাইক্রো আর মুখোশেরা মহুয়া আপার গন্ধমদির
দেহটির ভোজ সেরে অবশেষে আমারই দিকে ধেয়ে আসছে ।

চা-চক্র

তোমার সামনে এক কাপ চা
ধোঁয়া সাপ এঁকেবেঁকে
তোমার মুখের চারপাশ ঘিরে–
মুখের জ্যামিতি থেকে
বুনো মধুবিষ পাহাড়ি ভেষজ তোমাকে সবুজ স্পা ।

নাকের দেয়ালে ফোঁটা ফোঁটা নুন
দু ঠোঁটে কামজ চিনি
ধূম্র রেশমে মোড়ানো কেমন
জাদুকরী মায়াবিনী
চিনি গলে যায় তখনো তপ্ত স্টেইনলেস স্টিল স্পুন ।

গরম সিঙাড়া-চূড়া গম্বুজ
দুই ভাগ কর– ফের
ধোঁয়া-শ্বাস, ফের স্পাইসি সুবাস
জিরা মেথি সর্ষের
কোমল কামড়ে মুচমুচে জিভ সিঙাড়ার তিন ভুজ ।

উষ্ণ মিষ্টি চুমুকের পর
জিভে ঠোঁটে আহ্লাদ

তখনো একটু নুন রসায়ন
চিলি সস আস্বাদ
পিরিচে ও কাপে শেষ সংলাপে তখনো পরস্পর ।
হাতির পুল, ঢাকা, ১৬.০৫.১১

আ শি র দ শ ক

স র কা র মা সু দ

কাকটা

ঝড়-বাদলের রাতে গাছতলায় মরে পড়ে আছে
বড় পার্কের রাস্তার পাশে মরে পড়ে আছে
ঊর্ধ্বমুখি ঠোঁট আর শক্ত ঠাণ্ডা দুটি পা
মেঘলোকে উঠে গেছে পাখিটার শেষ চিৎকার!

উদ্যানবেশ্যার ভেজা শাড়ি শুকাবার পথে
আদালতপাড়া জমজমাট; হায় ভালোবাসার শপথে
কেন এত ছেঁড়া ফুল?
এত বেলা হলো, পাখিটার সৎকার নাই!
কী করে উদ্যানবুড়ো? পার্কে খাঁটি ভালোবাসা নাই
অভ্যাসবশত বসে আছে জোড়া জোড়া মাটির পুতুল ।

মৃত্যু এক নির্বিকার কঠিন বরফ
কাকটার চতুর চকিত দৃষ্টি পড়ে আছে ঘাসের ধুলায়
দেয়ালের ওইপারে রাস্তার জটিল স্রোত
কাকটা বসন্তদিনে মরে পড়ে আছে
গাছে গাছে রোদ আর পাতার কুহক
কাকটা চালতার পাশে মরে পড়ে আছে

সারা পার্ক পাখিদের উদার খেলাভূমি
আলো-ছায়ার মধ্যে কাক মরে পড়ে আছে!

আমি ভাবি মৃত্যুদৃশ্যে কেমন হবে বেহালার সুর
ঘুরে ঘুরে কাকটাকে দেখি–
যেদিন প্রথম সে পাহাড়ের ফাঁকে ওঠা সোনার আপেল দেখে
জুড়ে দিয়েছিল মহাচিৎকার, সেই ধ্বনি শুনি!

তারপর ঊর্ধ্বমুখি ঠোঁটে, ঠাণ্ডা পায়ে হাত বুলাই
বিষাদস্থির গাঢ় চোখের গোলকে চুমু খাই
তাকে নিয়ে চলে যাই নদীর পানিতে
ভালোবেসে ভাসিয়ে দিতে, শেষ বিদায় ।

মরা ব্যাঙ

ছোট্ট খালের টলটলে হাঁটুপানির আলো-ছায়াছবি
উপহার দিতে পারে নতুন অনুভব
কৈশোরের মুগ্ধ চোখ খুলে দিতে পারে বয়স্ক মানুষের রহস্যচেতনা
কী আছে মৃত্যুদৃশ্যে, ঘনায়মান পল্লি সন্ধ্যায় বাঁশঝাড়ের কিনারে
স্পষ্ট করে তা জানি না আজও
একটা মরা ব্যাঙ শাদা বুক পেট হাত পা ছড়িয়ে
চিৎ হয়ে আছে হাঁটুপানির গভীরে
পানির উপর, সবুজ পৃথিবীতে, খালের ধার ও সংলগ্ন জনপদে
থেমে নেই একটা কাজও
পঁচিশ বছর আগে মরে পড়ে আছে হোলা ব্যাঙ!
সেই খাল নালা হয়ে গেছে
খালপাড়ের গাছগুলো নেই
মানুষের বাড়িঘর, দৃশ্যপট, সময়ের কণ্ঠস্বর সব বদলে গেছে
ব্যাঙটা কিন্তু টলটলে হাঁটুপানির তলে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে আজও!
পানি সেচের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওই খালের পানি
সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমার মনের জঙ্গলবাড়িতে
পাখপাখালি ফিলে এলো সূর্যাস্তের ধাক্কায়
চুপ হয়ে আছে বাচাল বনানী ।

এখানে চিৎ হয়ে থাকা ব্যাঙের ছবি ছুঁয়ে, পানি সেচের শব্দ ছুঁয়ে
মহাকাল, কালভার্টের তিরতির জলস্রোত, এখন বাঁশপাতার
আলোড়নের অনেক ভিতরে প্রবহমান
পুঁটিমাছ মরা ব্যাঙের গা ঘেঁষে হেঁটে যায় ঝোপের ছায়ায় ।
না ঢেউ, না ঢেউয়ের বাইরে যা কিছু চলছে প্রতিদিন
কেউ তাকে স্পর্শ করতে যা পারে না এখন;
মরা ব্যাঙ মহান, সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া ফানুস,
তার হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে শ্যাওলার শিরায় শিরায় ।
মৃত্যুদৃশ্যের কেন্দ্র থেকে উঠে আসছে করুণ সেতার,
প্রত্যাখ্যান ভরা ভালোবাসার গভীরে জন্ম নিচ্ছে ঘৃণার উদ্ভিদ ।
কৈশোরের চোখ থেকে এক সময় খসে পড়ে মুগ্ধতার আবরণ
কচি চোখ বড় হয়ে খুলে ফেলে সব ক'টি স্বপ্নের চশমা
কল্পনার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার ব্যথা সেখানে অটল
কেন্দ্রভূমি উর্বর, গাঢ়; স্থির ওই খালের আয়নাজল
ওই মরা ব্যাঙ, বাঁশবাগানের দীর্ঘশ্বাস আমার বিহ্বল ভাবনার
এত কাছে,
পঁচিশ বছর পরে হাঁটু পানির গভীরে
মহাপ্রাণ মরা ব্যাঙটা চিৎ হয়ে পড়েই আছে ।

জোড়া অভিজ্ঞান

আমি এক কিশোরকে জানতাম । গাঢ় সন্ধেবেলা
দু'কাঁধে নক্ষত্র নিয়ে টো-টো করে বেড়াত সে
নোংরা সব পাড়ায় পাড়ায়!
একদিন লালজামা । একদিন অসম্ভব নীল!
বুড়িগঙ্গায় হাওয়া পড়ে গেছে, পাখিরা ফিরছে
এরকম এক সন্ধ্যায় তাকে পাওয়া গেল ।
'এই যে শুনছ!'
সে ছেলে মুহূর্তেই কোথায় উধাও!

আমি এক কিশোরীকে জানতাম । বেলা ডুবোডুবো ক্ষণে
নদীর চরে খেলা করত আবীর নিয়ে–

দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে ফ্রকের কোছায় তুলে
আনতো সিঁদুররোদ!

কখনো হলুদ জামা, কখনো খয়েরি!

বিষণ্ন ব্রিজের বাঁকে বাঁকা ছায়া নেই । পশ্চিমাচলে
আঁকা সিঁদুরের রঙধনু মিলেছে অসীমে–
সে ফিরছে একা একা নদীতীর ধরে,
'এই মেয়ে শোনো!'
সে-যে কোথায় হারিয়ে গেল চূর্ণহাসিতে!
চেয়ে দেখি অকাল আঁধার!

এখন আমার এক চোখে সন্ধ্যাতারা,
আরেক চোখে সূর্যাস্তের মৃদু ঘণ্টাধ্বনি!

পিকনিক

ওরা ছয়জন ছোট ছোট, ফ্রকপরা খুশিমুখ!
যেন ওরা জরায়ুতে ছিল না
একদিন কুয়াশাভোরে
পলিথিনমেঘ পেরিয়ে পৃথিবীতে নেমেছে
কুহেলিকাতর, নীল, চুপচাপ নদীর কিনারে!

তার মধ্যে তিনজন রান্না-বান্না নিয়ে মহাব্যস্ত!
হাল্কা ধূসর ধোঁয়া উঠছে
তিনজোড়া চোখ লাল
নদীর কিনার দিয়ে কয়েকটি ছোট পাখি
ভেজা বালির উপর রেখে যাচ্ছে পায়ের তারাছাপ!

মহাকাল ওই পাখি আর শিশুদের পদচিহ্ন মুছে দেবে ।
পাখিরা তখন বহুদূরে
শিশুরা তখন বড়, কোল নেবে হলফল শিশু ।

তখনো তো, আজ বিকেলের মতো,
লাল ব্রিজ পার হবে লাল রেলগাড়ি
এবং নদীর জল
আগেকার মতো নীল, চুপচাপ, কুহেলিকাতর!

জেলিমাছ

জেলিমাছ! নিয়ে যাবো শহরের বসতবাড়িতে
গদি হবে দোকানে, বৈঠকখানায়!
চোখ নেই, মুখ নেই, নাকি শরীরের সবটুকু
চোখ, সবটুকু মুখ!
ভেবেই অনেক রাত ঘুম এলো না
বিস্ময় উপচে পড়ে সমুদ্রফেনা!
তার সংসার কোথায়, কেমন?
পাতালে পাতার মতো পড়ে থাকা ঘুম!
জাগলে কিভাবে যায় বাজারে? পথের ভিড়ে?
শ্যাওলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে মনোহারি কাচের দোকান!
মৎস্যকন্যারা বসে আছে। সমুদ্রতরুর কাঁটাপাতা
কাঁটাকাণ্ড খয়েরি সবুজ! রহস্যের চেয়ে আরো
রহস্যমধুর অতলপ্রদেশ!
একদিন নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড়ে জল ভেঙে যাবার সময়
ওলট-পালট জলপৃথিবীর জনপদ– সমুদ্রন্যুমার্কেট!
জেলিমাছ, শঙ্খতারা, সুতোকাটা ঘুড়ি!
বাতাসের টানে কিভাবে কোথায় পড়ে আছে
জেলেরাও মাঝে মাঝে আনে।

জেলিমাছ! বালিতে জীবন নিঃসাড়!
সমুদ্র গর্জন, পাহাড়ের ক্রুদ্ধ তর্জনী, পৃথিবীর
আলোভাঙা ঢেউ, কে তাকে জাগাবে?
নাশতার টেবিলে রুটি আর জেলিকেক–
খণ্ড খণ্ড করে কাটা জেলিমাছ! মানুষের

কাঁটাচামচে লেগে আছে সাগরশ্যাওলা,
সরবতে নুন । জেলিমাছ যদি জানতো!
আহ্ চিন্তা আর ঘুমুতে দেবে না!
বিস্ময়ে উপচে পড়ে সমুদ্রফেনা–
সারা মনে শরীরে বালিশে বিছানায়!

খড়ের বাছুর

গাভী থেকে কিছু দূরে উন্মুখ চেয়ে আছে খড়ের বাছুর!
আসল গো-শিশু ছিল নদীতীরে লাফ-ঝাঁপ প্রিয়
নতুন উচ্ছ্বাসে ঘাস-মাটি খুবলে নিতো তার কচি খুর
আজও নদীর বাতাসে তার কচি ডাক ভাসে ।
নদীর ওপারে শালবন গাছপালাপ্রেমিকের কৃতি
বিকালবেলার আলোয় ওইদিকে চেয়ে থাকি
বাছুরের ছবি ছাড়া বেমানান বাগান প্রকৃতি
মানুষের কাছে ধরা পড়ে মানুষের নিখুঁত চালাকি ।

সে এক ঘোড়েল ঘোষ বাঁট টেনে টেনে দিশাহারা
দুধ নামছে না বাঁট তৈলাক্ত করে নেবার পরও
গাভী দেখছে ঝাপসা চোখে খড়ের বাছুর
দুধ নামছে, এইতো! ভিতরে ঝরনার স্রোত খর
এবার ভরবে পাত্র অর্ধেক দুধ আর অর্ধেক ফেনায়
গাভীটার চোখ বুঁজে আসে ঝরনাধারার আমেজে
কিন্তু গাভীটার মাথায় খটকা: ও তো খুব চঞ্চল
তবে আজ কেন হয়ে আছে ডোবার স্থির জল?

ওই গাভী আমাদের বোকাসোকা দেশজনতা
হায়! তাকে দুইয়ে রস নিচ্ছে রাজনীতিবিদগণ
সভাসমিতিতে জনতার মন ভেজে কথার আমেজে
মনে খটকা লেগে থাকে মাথাভাঙা কাঁটার মতন ।
তাদের বহুরূপ বাঁশি, তার নানারূপ সুর
যদি ধরা পড়ে যায় পাশাখেলার প্রকৃতি
তাই গাভী থেকে কিছু দূরে দৃষ্টিসীমায় রাখে খড়ের বাছুর ।

নিঃসঙ্গ ভ্রমণ

রোদে দেয়া ঝাঁকিজালে ধরা পড়েছে ঘন আঁশটে গন্ধ
আরও ধরা পড়েছে চাঁদা মাছের রূপকথা
ফণিমনসার পথ ভালোবাসি তার পুরু সবুজের গায়ে কাঁটা
কালীবাড়ির উঠোন ভালো লাগে
সেখানে বিষাক্ত ফলের গাছে শাদা শাদা তারা ফুটে থাকে
উইঢিবিগুলো এক একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ!

গরম বালুতে পা ডুবে গেল চরের মায়ায়
স্মৃতি পিছ্‌লে গেল সাইকেলের ক্লান্ত চাকায়!
(আমার টিফিনবক্সে স্ন্যাকস । ফ্লাস্কে লাল চা ।
আমার পকেটে গোল্ডলিফ জনপ্লেয়ার, চারপাশ শ্মশান
হাহ! আমি একদম একা ।)

নদী বয়ে যায় সাগরে, একথা কি পুরোপুরি ঠিক?
নদী আনন্দ-বেদনা নিয়ে চলেছে কোথায় কেউ জানবে না ।

মেঘগুলো এক-একটা ছোট-বড় পাহাড়
পাহাড়ের নিচে প্রচুর ভেড়ার পাল
ভেড়াগুলো স্থির মেঘ আকাশের অববাহিকায়
লেন্সের ভিতর দিয়ে নৌকা যায় অবাস্তব রূপাতলী ঘাট ।

হাওয়ায় ভর করে এসেছে একগুচ্ছ পরিষ্কার স্মৃতি
তার হেঁচকা টানে খুলে গেল জামার বোতাম
মাথার ওপর এত উঁচু নীল শামিয়ানা
মহাবিশ্বের কিছু কিছু রহস্য আমারও জানা!
নিচে জলাভূমির বুদ্বুদ! কাঁচা ধানের পৃথিবী–
মুভি ক্যামেরার ভিতর দিয়ে পাখি উড়ে যায় পশ্চিমে দক্ষিণে
আমজনতার মনের দুঃখে বেড়ে ওঠা ধঞ্চে গাছ যেদিকে নিবিড়!

সমুদ্র দর্শন

গভীর সমুদ্র থেকে যে বাতাস এসেছে
সমুদ্রের আত্মা থেকে যে ঢেউ এসে লাগছে আমার মনে
তার কোনো তুলনা নেই
অনেক দূর থেকে দেখা বিন্দুর মতো জেলেনৌকা
অল্প দূর থেকে দেখা উন্মাদিনীর মতো ঝাউবন
কুয়াকাটার খালের ওপাশে কুয়াশায় কাটা পড়া সূর্যোদয়
মাথার ভিতরে তাকিয়ে দেখা সুদীর্ঘ জলপথ-ক্লান্ত আলবাট্রসের
ফিরে আসার আলুলিত ভঙ্গি, নারকেলবনের হালকা বিষণ্নতা...
এসবের সত্যি কোনো তুলনা নেই, মানে নেই
আবার গভীর মানে আছে।

অশেষ সমুদ্র থেকে এখন ভাবনাতরঙ্গ আসছে
আমার চিন্তামগ্ন মাথায়
পানি আর শব্দ আর বাতাসের বিশালতা
তুচ্ছতার বড় বোধ উপহার দিয়ে চলেছে রসিকজনদের
যারা আবার একই সাথে পাকা সংসারী!
কিন্তু তারা ফেরত যাত্রার গাড়িতে ওঠার আগে
সৈকতের বালি-বালি পথে ফেলে যায় ঘন অনুভব
সমুদ্রে সূর্য ডুবে যাবার সময়কার অচেনা সংরাগ থেকে
আর কোনো ফুল ফোটে না বুলডোজারের শব্দময় সকালে!

আমি কিন্তু শুয়ে আছি সমুদ্র বাতাসে, ভেজা বালুর দেশে,
ফিরে গিয়েও আমার ছোট্ট স্টাডিরুমে আমি শুয়ে থাকবো এভাবে
মাথার নিচে দুই হাত, পায়ের গোড়ালি খামচে ধরবে অস্থির ফেনাপুঞ্জ
মহাঢেউয়ের চূড়ায় উঠে যেতে যেতে, এখন,
চোখ বন্ধ করে আমি শুনছি সজল ভৈরবী...

জীবনের মাঠে-ঘাটে তৃষ্ণাকাতর ভিক্ষুকের মতো ঘুরেছি যে-আমি
সে-ই এ মুহূর্তে সম্রাটের বৈভব নিয়ে
গর্জনের মুখোমুখি বসে আছি ঢেউগ্রস্ত, আত্মলীন!
যা কিছু চাপা পড়েছে জলগর্জনের আড়ালে
যা কিছু শব্দময় অনুভবময় হয়ে ওঠে মৌনতার কেন্দ্রদেশে

তারা সবাই এক সাথে উজ্জীবিত হয় রাত্রিসমুদ্রের ঝাউবনে!

ঢেউ এসে ভেতরসমুদ্রে নিয়ে যায় আমার সব ফুরফুরে অনুভব
সন্ধ্যার ভারি চিন্তা, অরণ্যবিলাপ....
অজগর ঢেউ আবার ওই চিন্তারাশি সৈকতে ফেলে রেখে যায়
তখন আর সেসব কেবলই চিন্তা থাকে না
হয়ে ওঠে সব সমুদ্রপাগল মানুষের গোপন আয়না
যেখানে এখন শাদা শাদা ঝিনুক পড়ে আছে তারার চূর্ণ!

তোমার জন্য, ও রবীন্দ্রনাথ

আমবাগানের স্থির ছবি
মাঝ বিকেলের বাদামি আলো
ওই দিকে মরা পদ্মার জলছবি
এক পলক ছুঁয়ে এসে মাথার ক্যামেরা
এখন কুঠিবাড়ি, লৌহসিঁড়ি, রেলিংঘেরা বারান্দার বিজন বিষাদে
দাঁড়িয়ে পড়েছে।
তার এক সেকেন্ড পরেই কবি জমিদার
তাকিয়ে আছে শিলাইদহের না-বিকেল না-সন্ধ্যার দিকে!

তার লম্বা জামার অনেক ভিতরে
ঘোলা ঢেউ ভাঙে কালো গাছপাতার মৃদু ঐকতান;
এখানে মেঠো সুর উঠছে অববাহিকার শান্ত জলাধার থেকে!
জল আর ডাঙ্গার মাঝখানে আত্মপ্রশ্নদীর্ণ, সংশয়জড়িত
কবি জমিদার
বসে আছে জীবনের বহু সকাল-সন্ধ্যার অমৃত কুহকে!
তার এক মিনিট পরেই রবি কবি নেমে যাচ্ছে কবিতার অন্ধকারে
প্রতীকের আলোয়।

তোমার জন্য, ও রবীন্দ্রনাথ,
আমি পাড়ি দিয়েছি মরা পদ্মার দীর্ঘশ্বাস
তোমাকে স্পর্শ করবো বলে পার হয়ে গেছি প্রিয় লালন সেতু
শুধু তোমার জন্য, ও বিশ্বপ্রেমিক, আমি ছেঁউড়িয়ার মেলায়

গান ধরেছি পাগল হৃদয়ে
আবার তোমার জন্যই ফিরে এসেছি পোড়াদহ জংশনের জটিল
যোগসূত্রে
আমার উৎকণ্ঠাময় আধো ঘুমের ভেতর ভেসে গেল সোনার আংটি
দ্রুতগামী ট্রেনের চাকার নিচে পিষ্ট হলো প্রবাসের ভালোবাসা
তা-ও তোমার জন্য, ও রবীন্দ্রনাথ ।

সু হি তা সু ল তা না

ঝাঁপতাল

এক স্বপ্নের রাতে জল ও জালের খেলা দেখতে গিয়ে
ধীবরের জালের ভেতরে দেখেছি আমি তার চাঁদমুখ
মায়ার ফাঁদে আমি জলে নেমেছি তাকে ছুঁতেও
পারিনি । প্রতিরাতে অপাপবিদ্ধ আলো হয়ে ঘূর্ণায়িত
নাভির ভেতরে তৃষ্ণার নদী হয়ে ভাসিয়ে নেয়
ঝাঁপতাল । মগ্নতার ওপারে ডুবসাঁতার খেলে নীল
ফড়িঙের ডানা । মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
ঘনীভূত হতে থাকে বিষাদের কালো ছায়া

দুই.

আমার মনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে ভোরের দোয়েল পাখি
যাকে ভালোবাসি আমি সেতো থাকে অন্য কোনোখানে
প্রতিদিন জীবন থেকে যখন একটি করে দিন চলে যেতে
থাকে তখন ভাঙা কাচের টুকরো ক্রমশ অপেক্ষা
ও অনুতাপের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে যায়

তিন.

সন্ধ্যার আলো নিভে গেলে তোমাকে মনে পড়ে আবার
সমুদ্রপাড়ের ছেলে তুমি ভালোবাসো ঢের বোঝো.....
এই নাও অর্ধেক জীবন তোমাকে দিলাম। এটা কি ভুল
নাকি আগুনের বিমর্ষ বিরাগ? নাগরিক জীবনের সব
কোলাহল ছেড়ে মন চায় যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই

চার.

তোমাকে ছুঁয়েছে হাঙর কুমির নষ্ট মাছের চোখ
শরীরে মেখেছো বালি আর ভাঙা শামুকের দাঁত
আর আমি তোমাকে রঙধনু ভেবে নীল আকাশে
উড়িয়ে দিয়েছি আমার হৃদয়। স্বপ্নভুক মানুষেরা
চিরকাল স্বপ্ন খেয়ে বাঁচে। নীল পুষ্পের সৌরভে
প্রাণের গভীরে বাজে ঝাঁপতাল। কোন সে বাঁশির
সুর ভাসে দূরগ্রামে? সবুজ অরণ্যের ছায়ায় ওড়ে
চন্দ্রাহত ধূসর আলো আর অদ্ভুত নীল প্রজাপতি

পাঁচ.

কেন আমি তোমার শহর থেকে ধীরে ধীরে আমার
মুখ আমি ফিরিয়ে নেবো বলো? ও শহর যে
আমারও প্রিয় খুউব! চেয়ে দ্যাখো বোধের আঙুল
ছুঁয়েছে চন্দ্র! নৈঃশব্দ্যের এক মধ্যদুপুরে তুমি
কেন মাতাল হলে নিমগ্ন বেদনায়? এ দহন
পোহাবে কে? কেন সব সম্ভাবনা ছিঁড়ে খুঁড়ে মৃত্যু
ডেকে আনো? কেন দুঃস্বপ্নের রাতে উঁচিয়ে ধরো
সর্পের ফণা? নীলকণ্ঠ শিবের প্রতীক হয়ে ঝুলে
থাকে স্বপ্নের রাত। কেন হৃদয় খনন করে আবার
বেদনা জাগাতে চাও? কবোষ্ণ জলে কার মুখ
অগ্নি হয়ে ঝরে? এ এক অদ্ভুত জীবন!

ছয়.

একদিন সঙ্গীবিহীন প্রকৃতির রঙে জলের গহিনে ডুবে
থাকা এক ঝাঁক প্রজাপতি বিস্ময় উড়িয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়
এই গভীর নির্জনতায় কেন আগুনে ঝলসে দিলে অপেক্ষার

মুহূর্ত? তোমার সাথে আমার দূরত্ব এমন কিছু নয়!
নৈকট্যলাভের ধারাপাত মাত্র। চারদিকে চেয়ে দ্যাখো
মানুষ আজ আগুনের ক্রীতদাস মাত্র। ধূর্ত দেয়ালের নিচে
ক্রমশ সকল সম্ভাবনা চাপা পড়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ
অনুজ্জ্বল রাতে নক্ষত্র গলে গলে ছাই হয় .....

সাত.
অসম্ভবকে গুঁড়িয়ে দিয়ে কেন আর্তনাদ ডেকে
আনো? কেন ফণাবিদ্ধ নিশীথে বিষণ্ন বৃক্ষের
ছায়ায় চন্দ্রের আলো ধুলো নিয়ে খ্যালে?
সব তুচ্ছতা জলহীন দিঘির কাছে নিয়ে যায়
নিরন্তর যমুনাজলে মুগ্ধতার ছোপ ছোপ অপরাধ
হৃদয়জখমের মতো পীড়িত করে রাখে। এ কোন
ভয়ার্ত হরিয়াল? হরিৎ বনে ক্রন্দন নিয়ে খ্যালে?

ন ব্ব ই য়ে র দ শ ক

শি মু ল মা হ মু দ

এইভাবে অনেকগুলো দিন আর অনেকগুলো
রাত প্রেম করি আমরা

১.
বৃক্ষেরও গল্প আছে, গল্প আছে আকাশ, নদী
অথবা একটুকরো মৃত ঘাসের জৈবরসে।
আমাদের প্রিয় শারীরীয় শৈশব; ইজেল প্লেটে
ছড়ানো প্রিয় রঙিন শৈশব; যাকে আমি স্মৃতি
হিসেবে লুকিয়ে রাখি জৈবিক হরমোন কণায়।
হয়তো-বা লক্ষাংশের এক মিলি জৈব; যেন-বা

মায়ের গর্ভে নিরাপদ মমতা অথবা চাঁদের ছায়ায় জাড়িত গর্ভকালীন গোপন জীবন ।

মা আমাকে ডেকেছিলেন সেইদিন; মায়ের জরায়ুর ভেতর । সেই আমার অনাঘ্রাত বোধের ভেতরে মায়ের আদিকণ্ঠ প্রবেশ করলে আমিহীন অহম, আমিই নিঃসঙ্গতা; আর তখন মাতৃগর্ভে শব্দবিহীন চিরায়ত নিঃসঙ্গতা ।

২.
আর যদি নিঃসঙ্গতা হয়ে থাকে একখানা পরিপূর্ণ ভরাট বিরামহীন ফরেস্ট; তবে সেই ফরেস্টের ভেতর আমি হাঁটছি আর ভাবছি শেষ পর্যন্ত মানুষই চূড়ান্ত অর্থে শরীরজীবী জীব । ভোগবাদী জীবনের যাবতীয় আয়োজন; দেহ অনুগত গতিময় ধারাপাত; প্রকৃত দৃশ্যের আড়ালে প্রকৃত শব্দের ক্রন্দন ।

আমাকে তো ফিরতেই হয়; শরীরের কাছে, বনের পাখি অথবা মাংসাশী তৃণভোজী জীবের মতো ফরেস্টের কাছে; নগর অথবা নগরের মানুষের কাছে ।

৩.
যে শিশুটি গতিপ্রাণ মায়ের কোলে রেলগাড়ির জানালায় আকাশের কোনো অনুভূতি না বুঝেই চোখ খুলে দেয় দৃশ্যে, দৃশ্যান্তর সবুজ আকাশ । সেই শিশুটির জানা নেই এইসব সমকাল আর সমকালভোজীদের যুক্তিবাদী ভাষাচিত্র ।

গৃহপালিত প্রশ্নে আটকে রাখি নিজেকে দেহের ভেতর । জেগে ওঠে সংশয়, এইসব কোনোকিছু না বুঝেই হয়তো-বা প্রিয়জন কেমন আছো, এই এতটুকু জীবনে কীভাবে অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা বেঁচে

থাকে দেহে? ভালো লাগে এইসব ক্ষুদ্র সময়। হয়তো-বা বেড়ে যায় বয়স; এই এক চেনা পৃথিবীর বয়স; এইভাবে চেনা পৃথিবী একদা অচেনা হয়, বেড়ে যায় পৃথিবীর বয়স।

৪.

বৃষ্টির সমারোহে মাটির গন্ধ জেগে উঠলে দেহে, সন্দেহ হয় আমাদের ভেতর কারো কারো একদিন হয়তো-বা কৈশোর ছিলো। অথবা এই দেহ, দেহময় শরীর; কোথাও মন নেই, নেই কোনো শৈশব অতীত; শুধুই বয়স বাড়ে আইবুড়ো পৃথিবীর সাথে অসভ্য দেহে।

বৃষ্টির শব্দ অথবা আগুনচুলোর ধোঁয়াগন্ধ নিয়ে বেড়ে যায় আমাদের মাতামহীর বয়স, প্রপ্রাচীন সময়। অতীত পৃথিবীর মতো ফিরে আসে মেঘ, মেঘশূন্য আকাশ অথবা নদী। আমাদের মনে থাকে না এইসব ছবি; তবু ভালোলাগা; অবাক হই অথবা কষ্টের অভিনয় করি; অথবা নাগরিক বৃষ্টির বিকেলে নোতুন কোনো নাগরিক প্রেমিকাকে বসিয়ে পাশে শারীরীয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলি; অথবা শারীরীয় সময়কে ভিজ্যুআল করে নিতে বৃষ্টি অথবা পাখিচিত্র ফুটিয়ে তুলি আমাদের ভেতর। 'তবুও ভালোলাগা অনেক', এইসব ভাবতে ভালোলাগে; আর কামশেষ দেহে জেগে ওঠে, 'চলে যাক নুনিয়া ঝুমু'; 'নুনিয়া ঝুমু' নামে আমার কি কোনোদিন কোনো এক প্রেমিকা ছিলেন?

৫.

এইভাবে অনেকগুলো দিন আর অনেকগুলো রাত প্রেম করি আমরা; আর একসময় ভুলে যাই জুঁইদি নামে কোনো এক নারী একদা কোনো

এক কিশোরবেলায় প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলো আমাকে।

আর তখন সামনের সিটে বসে থাকা গতিপ্রাণ মায়ের মতো অন্য কোনো মায়ের কোলে বসে ছিলো হয়তো কোনো এক তড়িৎশিশু; যে বিদ্যুৎশিশু ১০০ বছরের ওপারে আগামী আকাশ দেখছে এখন।

দী প ং ক র গৌ ত ম

আমরা সংখ্যালঘু

বাঘিয়া বিলের আল ভেঙে ভেঙে উঠে আসে নির্বাক ধানকন্যা এক। বহু দূর থেকে হেঁটে তারপর সদর রাস্তায়। অজস্র কৌতূহলী মানুষের ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে যেতে চাইলেই প্রাজ্ঞজনেরা প্রশ্ন করে, কে তুমি? কহ কন্যা সত্যি পরিচয়। লুটপাটে লুকাইয়া আছিলা। সত্য করে কও। কোনো কথা বলে না সে, কোনো উত্তর নেই। আবার প্রাজ্ঞজন প্রশ্ন করে কী তোমার পরিচয়? হিন্দু-মুসলিম না খ্রিস্টান? পরচা কিংবা মৌজা নম্বর জানো? না হলে বলো বাবা কিংবা গ্রামের নাম। নিরুত্তর থাকে মেয়েটি। এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতেই থাকে। একসময় মেয়েটি মুখ সূর্যোদয়ের মতো খুলে ফেলে ঠোঁটের আস্তিন। বলে, কোনো পরিচয় নাই, আমরা সংখ্যালঘু– নির্বাচন আমাদের পরিচয়।

চাঁদের মতো একা

রাতের ঘোরে জলের ফণা মেলে
দুই চোখেতে অযুত পাখির বাসা

তোমায় যেন কোথায় দেখেছি
ঘোর আষাঢ়ে বর্ষা বুকে জ্বলে

মনে পড়ে? চৌরঙ্গির মোড়

হারিয়ে গেল পাখির কলরব
মাঠ হারালাম কালবোশেখী ঝড়ে
একলা আছি চাঁদের মতো একা
সূর্যদহে পুড়ছি রাত্রি ভোর

একদলা একাকিত্ব

স্মৃতি নেই
ভাবতে ভাবতে কীভাবে যেন পাটখড়ি বা খেজুরের ডগার বেড়ার ফাঁক দিয়ে
উঁকি দেয় শৈশব

মোড়ের বামের বাঁকে
দীঘল পুকুর এখনো তার কাকচক্ষু জলে
জলকেলি করে

চলটা ওঠা ঘাটলার ভাঁজে একদলা একাকিত্ব
একটা শিথলে-পড়া সিঁড়ি ভেঙে
কাত হয়ে আছে পড়ে

কারও মুখ লাল টিপ হয়ে ভাসে–

নবান্নের জাত

অনার্যের লোহিতকণা ভেঙে যায়
ভেঙে যায় চেতনার আলপথ যতো
অন্তর্গত ফেনিল জলে ডুবে যায় আর্যের অহংকার

আহা! রাজাবাড়ির ন্যাংটা ঘোড়া ।

কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল কোনোটাই নয়
এখনও কানে বাজে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ
খিলজির ইতিহাস পরাজয়; কলঙ্ক
লজ্জায় কালো হয় কালের কলস ।

তরবারি যুগ বহুরূপে হানা দেয় জনপদে জনপথে
অস্ত্রের আগ্রাসী চোখ দানবিক হয় প্রতিদিন
যে মানুষ জাগে বীরের হুংকারে
বীরশূন্য জনপদে জাগে না মানুষ
নূরলদীন সূর্যসেন ক্ষুদিরাম প্রীতিলতা
খাতায় কলমে বন্দি সবাই । মানুষ জাগে না
রাজপথে পড়ে থাকে পিকাসোর শ্বেত পারাবত ।

তবুও তোমায় দেই বিঘা বিঘা পাললিক সুখ
শিশু ধানে দোল খাওয়া খেত,
কপালে এঁকে দেই একথালা চাঁদ ।
দিতে পারি আরও
আমরা নবান্নের জাত, গতরে মাখা মাটি
সোঁদা এই মাটিতে লেগে আছে মায়ের দুধের ঘ্রাণ ।

আমরা নবান্নের জাত । কাকডাকা ভোরে
কাককে আমন্ত্রণ জানাই আমরা
করোটির গহিন প্রদেশ ভেঙেচুরে দেখ রক্তপ্লাবন
সেখানে বীরের ঘ্রাণ ।

ডাক দিতে পারি
যেকোনো মুহূর্তে দিতে পারি ডাক
সে ডাকে আবার ঘুমভাঙা মানুষের ডাকবে প্লাবন
আমরা নবান্নের জাত– কারো প্রতি নতজানু নই ।

আগুনমুখার ছেলে

বুকের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে
নেভে না তা জ্বলে শুধুই জ্বলে ।
আগুনমুখার ছেলে দেখে সাদা বুটের ছায়া
দেশটা জ্বলে বুকের ভেতর কোন জীবনের মায়া ।
মায়া কাটে ছায়া কাটে বর্গিরা দেয় হানা
ধনুক ধরে বীরেরা সব ছিলায় মারে টানা ।
আগুনমুখার ছেলে দেখে ঘাস, শস্য পোড়ে
স্বদেশ প্রেমের খড়্গ তখন হাতের মধ্যে ঘোরে ।
আক্রমণে আক্রমণে বেনিয়া যায় টলে
আগুনমুখার ছেলের গলায় ফাঁসির রজ্জু ঝুলে ।
সেই ছেলেটা বীর ক্ষুদিরাম
আগুনমুখার ছেলে
এখনও এই বুকের মধ্যে তপ্ত আগুন জ্বালে ।

রা গী ব হা সা ন

হাসি তুলে দাও একটু

হাসি তুলে দাও একটু । আকাশের মেঘে মেঘে এত শাদা রঙ,
প্রতিভা কতদিকেই ছড়িয়ে দিয়েছ– জলকণার মতো আমি নীরব হয়ে থাকি
রাত্রির ঘ্রাণময়ে জেগে থেকে তোমার শয়নভঙ্গির দৃশ্য
আমার মস্তিষ্কের শরে শরে জেগে থাকে । পবিত্র
ডানার মতো কবে আমি আখ্যান খুলে চিন্তাকে বেদনাকে তোমার শরীরের ওম
পেয়ে তার বর্ণনা করে গেছি, নিশ্চুপ জলের মতো আজ আমাকে
জাগাও, কারখানার বাতির মতো আলো জ্বেলে দাও, অরণ্যে
শীত বড় নেমে আসে– তার মতো করে চুম্বন দিয়ে, প্রশাখার জোনাকি

জানে জ্যোৎস্নায় মাঠে মাঠে তার উড়ে যাওয়া, বেদনা ফেলে রেখে বৃষ্টির
মতন মৃত্যুকে জাগিয়ে গিয়ে- শুধু কি উপন্যাস পড়ে থাকে?
সেই কাহিনী আজ কোথায় ভাসিয়ে দিলে– এত যে রৌদ্রমেঘ,
পালকের রোমাঞ্চ– রাজধানী অগ্নিগর্ভে ডুবে যায় । তবু সংশ্লিষ্ট
প্রক্ষেপণ– ভালো আছ তো, কত দীর্ঘ বিরতি রয়ে গেল,
তোমার মা এখনো কি আতঙ্কে ভোগে আমাকে নিয়ে,
তুমি কতটা ভালোবেসেছিলে আমাকে– অথবা ভালোবাসনি শুধু
আকাশের বাষ্পীয় জলের মতো, নিউইয়র্কের রাস্তাঘাটের মতো–
উপদ্রবহীন থেকে গিয়ে-যা আশা করেছ তার কতটুকু পেয়েছ? মাংসের
দোকানের মাছির মতো, সর্ব আলোহীন পথ দেখি– এইটুকুই
বৃষ্টি পড়ে– ঝাউবন শরীর উৎসারিত হয়ে ওঠে । আন্তর্জাতিক
হোটেলের সামনে– জল জমে । সেক্রেটারিয়েটের সামনে তরিতরকারিময়ের
বাজার সম্প্রতি উঠে গেছে । তবু রক্তফলের আকৃতি–
আজো কি হাসি পায় এই ভেবে যে– ক্ষণকাল সময়ে
দরজা পেরিয়ে যে এসেছিল সে তোমাকে ভালোবেসেছিল, অক্ষিগোলকে
তোমার ছবি ছাড়া কোনো ছবি দেখেনি ।
পত্রাবলিদের ঝরে যাওয়ার দৃশ্যের পরে আজ জেনেছ– এখন হয়তো
বৃষ্টি আসতে পারে– চারুময়ী ভগ্ন দালানের লতাগুল্ম জেগে আছে
জ্যোৎস্নার দিকে মুখ চেয়ে– অগ্নিফলা জলের অতলে পড়ছে কেন?

সাফল্য পড়ে গেল, আঘাত পেল বুঝি?

সাফল্য পড়ে গেল, আঘাত পেল বুঝি? জানালার পাশে চাঁদ এসে চুপিচুপি কী
কথা
বলে গিয়েছিল আর টেবিলের রচনা ওভাবেই পড়ে থাকল,
মেশিনের অনুভূতি ছিল আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার, কিছুক্ষণ আগেই
পরিবেশে তাপাঙ্ক শুরু হয়েছে । পাহাড়ের শরীরে ফেলা হচ্ছে আগুনফল ।
সাফল্য ঝরে যায়– আবার কীর্তিমান গড়ে ওঠে । ফল পেকে গেলে
সামান্য বাতাসে তা পড়ে যায়, নির্জন চায়ের দোকানে বসে থেকে মহিলা
মোটরসাইকেলে চেপে চলে গেল, কাঁঠালগাছের পাকাফলে
কালোমাছি ভনভন করছে । উৎসবের ওপর থেকে
বৃষ্টি ছেড়ে দিলো কে– খবরের কাগজে পাওয়া যায়, তাঁবুর নিচে
সমগ্র অন্ধকারে ঐতিহ্য পুড়িয়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয় ।

যুদ্ধ বেড়ে গেলে রসদ সরবরাহ বেড়ে যায় ।
মহিলা ও পুরুষ জলপাই পোশাক পরে যুদ্ধ করে । জন্মফল হাতে নিয়ে মুদির
দোকানে বসে থেকে মরুভূমি জ্যোৎস্নায়– সভ্যতার
করুণ মুখখানি দেখে তোমার চোখে জল এলো ।
সাফল্য বৃষ্টিভেজা রোদে একাই দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে ।
দেবদারুর ছায়ের নিচে, বৃষ্টি পড়ায় সাফল্যের চুল এখনো
শুকায়নি । সর্দি লেগে যাবে না । কফ উঠবে তো ।
বুক ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে ।
এসব কথা কি সাফল্য শোনে । সে কি বান্ধবীর জন্য এখানে
দাঁড়িয়ে আছে? একটু আগেই তো সে পড়ে গিয়েছিল– ধানক্ষেতের
জলের গবাক্ষে ।
আঙুলে তার কাদা লেগেছে । পোশাকে রক্তের চিহ্ন
সাফল্য যে মাঝেমধ্যে জ্ঞান ঝরে যাওয়ার মতো স্বভাব করে বসে,
লোহার স্ফুলিঙ্গ ঝরে যাওয়ার মতো জ্বলে ওঠে,
বান্ধবীর উপস্থিতি না হওয়ায়– নিভে যায়, হাওয়ার জলকণা
তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়– অদ্ভুত আলোর কাছে ।

দরজার সমগ্রতা

এই বনময়ের পটভূমির ওপর বৃষ্টি পড়ছে, সেলুনের কাচ ভাঙা আছে ।
রাস্তা পার হতে গিয়ে তারা রক্তফল পেয়েছে । তবু স্বাগতম জানিয়েছে–
দরজার সমস্ত সমগ্রকে ।
তোমরাও কি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে প্রার্থনা করোনি– বৃষ্টির জন্য
প্রতিরক্ষা গড়ে তোলোনি– আকাশ ও জলস্থলের চতুর্দিক । বনের ফলকে পাহারা
দেওয়ার জন্য– রাত্রিময় জাগিয়ে রাখোনি সৈনিক? তোমাদের করতলের জল
পড়ে গেলে– সাদা শ্বেত কবুতরকে জনমানবহীন ভূমির দিকে যেতে বারণ
করেছ ।
তুমি ফিরে আস । তোমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুমি ছিলে জলকণার সমুজ্জ্বল শিখা ।
হায়– একজন গ্ল্যামার ফটোগ্রাফারের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে তোমার বাড়ি
পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা হলো না তোমার বাড়ি । তোমার উঠোনেই
তুমি ছিলে– এ খবর আমি পেয়েছিলাম চৈত্রের গরমে ।
তখন কৃষক তার জমি লাঙ্গল দিয়ে ফালাফালা করছে ।
কলাগাছের পাতা জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে গেলে– ধানমালার স্থানিকেই

ঘুমিয়ে
পড়ে ধানকাটা মানুষ ।
তাদের গল্পের মধ্যে তুমি ভেসে উঠলে । আজ লেকের ধারে
তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েও তোমার রক্তময় বাড়ি, দেয়াল, গাছ আমি
চিনতে পারিনি ।
যে ব্যক্তি উদ্ভিদের মধ্যদিয়ে চলে গেল, রাস্তার বর্ণনা লিখে আর সমাজ
পটভূমি
বরফের সাদা ধারণ করে আছে, তার সারমর্ম এবং টিনের চালের বৃষ্টি মহৎ
উৎসর্গ আমাদের স্নায়ুকে নাড়া দিয়েছে– এই সরল বক্তব্যে কথা বলেছে,
যে ব্যক্তি মানুষ প্যাগোডার ছায়ার কুয়াশায়– ব্রিজ পার হতে গিয়ে দেখে
একটি
সারমর্ম ভোরের বাতাসে উড়ছে, দুলছে,
বারবার জানালার কাছে আসছে, বারবার জানালা থেকে সরে যাচ্ছে,
বারবার দরজার ডালিম গাছের কাছে আসছে ।

ছায়া

মুখের বৃষ্টিভাষায় সাম্প্রদায়িক আলো, বিকেলের শীত পেয়ে ঘর ছেড়ে যাইনি
মধু সেবনে শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে আসে কফি পানে রাত জাগিয়ে রাখে
শীতে শরীর টেনে ধরে বুকের নরম কমলা
বুকের পশমে রেখে জায়মান পুরুষ দেহ হাড়ের উপকথা কাহিনী শঙ্খে
দুপুর রাত পেরিয়ে দিয়েছিল স্নানার্থে কালোত্তীর্ণ বুকের নক্ষত্র শীতে
কেঁপে কেঁপে গিয়েছেল আর মার্কিন সমাজের মতো নিউইয়র্কের রাস্তার মতো
শান্ত ও উদ্ভিন্ন শরীর শশিকলা রান্নার ঘ্রাণের মতন সান্নিধ্যে থেকে
পথে যেতে পথে যেতে বাসে উঠতে উঠতে সিটিসেল ফোনে
কথা বলতে বলতে গভীর সমুদ্রে সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণের চুক্তি
রচনা হতে হতে শরীরে বৃষ্টি এসে যায়
তোমার বিনম্র কণ্ঠে জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া পড়েছে
শরীর আজ শরীর থেকে দূরে চলে যায়
বৃষ্টি আজ বৃষ্টির থেকে মেলট্রেনে করে ব্যাগভর্তি বইখাতাপত্র নিয়ে ট্রেনের জানালা
ধরে বসে আছে বাইরে তার চোখ অগ্নিনির্বাপক গ্যাসের ধাতুময় শেলটি চোখের
সামনে বৃষ্টি বৃষ্টির মধ্যে শরীর দিয়েছিল কবে ম্যাডোনার মতো স্নানঘরে নেচেছিল
স্নানঘর ছেড়ে বান্ধবীদের সামনেই নেচেছিল কালোত্তীর্ণ আলোর ক্রমশ পরম্পরা

বীজ থেকে বীজের অভ্যুদয় শরীর থেকে শরীরে ফুল তৈরি সারিসারি গাছের পাশে
সেনানিবাস সৈনিকদের সতর্কচোখ সৈনিকদের গাড়িও পড়ে যায় খাদে সৈনিকদের
ট্রাংক চলে আসে শহরের মধ্যে, সমুদ্রভূমিকম্প ভেসে নিয়ে গেল
পুরুষ নারীদের, বাগানে বসে তারা এলকোহল গিলছিল ।

বকুলতলার শীত অবকাঠামো

যূথবদ্ধভাবে হাঁসগুলো জলের ওপরে পরিভ্রমণ করে বেড়ালো ।
আর রিমঝিম বৃষ্টি মাতাল
হয়ে তাদের শরীর পরিবৃত্ত করে গেল ।
আমরা জেনেছিলাম নক্ষত্রলোকের কাছে বেদনা পড়ে থাকে, ধর্মহীন পালক
ডানা ঝাপটিয়ে উৎসের আলোমুখে নিয়ন্ত্রণের কপাট খুলে দিয়ে শারীরিক লাবণ্য
প্রার্থনা করেছিল ।
হাঁসগুলোর গল্প বলার পরিদৃশ্যমান আলো আঁধার, জীবনানন্দ দাশের ব্যথামুখ
প্রকৃতির মধ্যে তুষার পড়ে গেলে থেকে যায় অনির্বাণ শিখা, তরবারি ।
যেইসব উৎসের দিকে গিয়েছি, করুণাবিমুখ প্রত্নহাড়
তারা ধানক্ষেতের ধারাজলে লাল নিশান উড়িয়ে বলাকার শিকারে
যূথদল পাঠিয়ে অন্ধকার মাঠ নিয়ে এসেছে ।
ভোরের শীত ঘ্রাণ পড়ে গেলে আমরা আমাদের উঠোনের রাজহাঁসগুলোর দরজা
খুলে দিয়ে বলেছি জলের কাছে যাও
দখলদার নৃপতির হাঁটাচলার মতো জলের উপরিকাঠামোয় গিয়ে শিরিষ
গাছের ফুলগুলোকে বাতাসে ঝরে যেতে বলো
মাধবী ভোরের পড়া পড়তে উঠে শিরস্ত্রাণহীন জ্ঞান আর বকুলতলার
শীত অবকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়ে বুঝিয়ে দেবে
তাদের, তোমাদের, সকলের
আলোস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে বিবাহউৎসবে, বাৎসরিক মেলার মাঠে
তার বিন্দু বিন্দু আলোকণা ঘাসে পড়েছে, মস্তিষ্কে পড়েছে?

তোমার সময়

তোমার সময় সময়ের চেয়ে দামি
এই এত রাতে কাউকে ডাকি না আমি
তোমার সময় সময়ের চেয়ে দামি
আমি ধূলিকণা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
শরতের মেঘে কালো রঙ মরি খুঁজে
এই এত রাতে সংসারে নেভে আলো
আলো না বরং অন্ধকারই তো ভালো
কেউ কারো মুখ দেখে না রাত্রি ঝাড়া
ল্যাম্পপোস্টের ক্লান্তিটা দিশেহারা
আর ফুটপাতে এলোমেলো পথচারী
পা-দুটো পাথরে কাতরায় মহামারী
বেঁধেছ পরানে বিরামবিহীন জ্বর
এই এত রাতে সবচেয়ে ভালো ঘর
দরজাবিহীন ঠিকানা বদলে নিও
আমি নই কালো বিড়ালের মিঁউ মিঁউ
জব্দ করেছ পিঁপড়ের ঘরবাড়ি
মৃত্যু আহত হাইকোর্টে রুল জারি
শেষরাতে শেষ সিগারেটে আহা মধু
জানাচ্ছি আমি শিখিয়েছ তুমি জাদু
সোনার কাঠিতে কলঙ্ক রুপা মল
মনের ঘুঙুরে কাতরায় তোকে বল
কোন নামে এই এতরাতে ডাকি আমি
তোমার সময় সময়ের চেয়ে দামি

পাপোশ

আমি তো জুতার মতো পড়ে আছি
প্রবেশলগ্নে ফেলে গেছ

পাপোশের পাড়ে
ব্যস্ততম দরজায় কত লোক এলো গেলো
ভেতরে বাইরে
উপেক্ষা করে মেখে দিলো ধুলো আরও কিছু
তবুও অপেক্ষায় ছিলাম বিদায়ের বেলা
আমাকে গুছিয়ে তুলবে
কিন্তু হায়

যাবার বেলায় অন্য কাউকে জড়ালে বুকে
সেই সুখে আমি হতবাক
তোমার মুখের দিকে চেয়ে
দেখি তালার আরেক ঢালে
বাতাসের হুড়োহুড়ি
চাবি খোলা নিয়ে
তোলপাড়!

গয়নাবাক্স

বহুকাল হলো এই ছোট্ট বাক্সের ভিতরে বন্দি হয়ে আছি। আগে বছরে একবার আমার খোঁজ হতো তাদের বিবাহবার্ষিকীতে। সেই দিন আমি অতিথিনারায়ণ, আমার অলংকার মায়ের গায়ে চড়ে এক ধরনের অহংকারে পরিণত হতো। গভীর মমতায় মাকে দেখতেন বাবা; তখন খুব ভালো লাগত আমার। তারপর তারা যখন একে অপরকে খুলে দেখতে চাইত, তখন ঝরে পড়তাম আমি। সকাল হবার আগেই আবার চড়ে বসতাম ছোট্ট জাদুর বাক্সে। বাবার মৃত্যুর পর মা আর কখনো দেখেনি আমাকে।

মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আজ ২২শে শ্রাবণ, মা-বাবার বিবাহবার্ষিকী। আজ অনেক দিন পর গভীর রাতে মা আমাকে হাতে তুলে নিলেন; তারপর চড়িয়ে দিলেন বৃক্ষের লতায়-পাতায়, চিবুকে-ওষ্ঠে, কণ্ঠসীমানায় আর হৃদপিণ্ডের অস্থিতে। ধবধবে সাদা শাড়ির বদলে টকটকে বেনারসি পরলেন দেবী, কপালে সিঁদুর। গয়নার ভার মুক্ত হয়ে আমি তখন প্রতিমা দেখছিলাম।

একসময় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মা । কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির, তারপর খুলে ফেললেন তাঁর সকল আভরণ । মা এখন সামান্য ভারমুক্ত হয়েছেন মন বলে । আর মা'র চোখের জলে ভিজে যাওয়া অলংকারে পুনরায় ভারি হয়ে গেলাম আমি । এই অলংকার এখন আর ভালো লাগে না আমার ।
৫. ১০.১১, ৫৬/২, রাত ১টা, উত্তর বাসাবো, ঢাকা ।

স্বর্ণগোধূলি

জ্যোৎস্নার নির্ঝর ধরে
যেতে যেতে
টিলাপাহাড়ের দক্ষিণে,
রূপব্রহ্মার প্রচ্ছায়ায় যেখানে
শত রক্তলহরীর নিঝুম ঝোপ ।
আর সব বেগানা রাগিণী গড়ে
সুরেলা মরণের নীড় ।

পলাশহাওয়া ওগো অশোকহাওয়া,
সংগোপন মেঘের দর্পণে দ্যাখো
লাবণ্যরিক্ত কাঠামো আমার ।

ঘুমের দেশে
এমন একবারই জেগে ওঠা
তারপর কুয়াশামিনার থেকে
তোমার এই মিহি ঝরে পড়া
চিরদিনের মতো মুকুলিত ।

কোমলগান্ধার

রাত্রি ।
মরুভূমি ছেড়ে যাই
ওই দূর

মালিনীর
অববাহিকায় ।
তার জলে
হাঁস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
আমার দগ্ধ চৈতন্য ।

ভোর
এখন মালিনীই
মূলত মরুভূমি ।

মা হ মু দ টৌ ক ন

স্মৃতিগ্রাম

এখানে এলেই ঠিক মনে পড়ে
থলে আর আধুলি দ্বন্দ্বে জনকের বিষণ্ন আকাশ ।

এই গ্রাম, পাতাছন্দ মাটি আর বুনো গাবগাছ
ধুলো উড়ে ফিরছে খুরেরা । নৃত্যরত যেন রাস্তাটি–
আধভাঙা সাঁকো । বিষণ্ন হয়ে ওঠা গোধূলির হিজল কোটরে
ও তক্ষক, ঈশ্বরের মতো কাকে ডাকো?

পোড়া-শুটি, কালিমুখ দাঁড়িয়ে সন্ধ্যায়; দূরে লালবাতি
ট্রিং ট্রিং কিনতে পারিনি, দু'চাকার বাই-সাইকেল ।

সন্ধ্যা জুড়ে মা'র হাহাকার–
শেয়াল নিয়েছে তার ডিমপাড়া হাঁস ।

এখানে দাঁড়ালে, এই রাস্তা, বরুন শাখায়

বুনোঘাস, শূন্যলতা আর
নিস্তরঙ্গ জল... শীত শীত লাগে ।

হাওয়ায় হাওয়ায় অগুণতি হাঁসের হাহাকার...
একজন মাতাল শ্রমিকের সংলাপ

জড়িয়ে ধরেছি পা, নোয়াচ্ছি মস্তক
যাসনে এ ভরসন্ধ্যায়... ঝোপঝাড়... শেয়াল শ্বাপদ
ওই তো কুমড়ো বীজ, অদ্য পেয়েছে ভ্রূণপাতা
যাসনে, জোড় করছি হাত, খুলে দিচ্ছি খাতা ।

আজ সন্ধ্যায় মিলেছে সাপ্তাহিক
সত্যি বলছি নয়শ' পঁচাত্তর । তিন কিলো চাল, আলু-ডাল-মুড়ি পোয়া
বিশ্বাস কর, যায়নি ইলিশ ছোঁয়া... ছেড়ে দে মা, কেঁদে মরি
তবু অবিশ্বাস? তমু মিস্তিরি ছিলো, সাক্ষী মানতে পারি ।

মুদির দোকান পাওনা ঘ্যানর-ঘ্যান
দিয়েছি ত্রিশেক, খেউড় সে-কী খিস্তি
খুন চেপে গেল তবুও তুলিনি হাত । তোর উপদেশ–
তখনি অকস্মাৎ, মনে পড়ে

গেলো, এক পাতা বড়ি জন্মনিয়ন্ত্রণ
দ্যাখ, ঠিকঠিক আনতে ভুলিনি দ্যাখ!

যাসনে কসম, দিব্যি দিচ্ছি... মাল খাবোনানে আর
যাসনে বউটি, ও বউ শোন না
গায়ে হাত তুলবো না, মাইরি বলছি!

পত্রলেখা

একটি নতুন বই– কেনা হলো, চেনা হলো শব্দের ঘ্রাণ
তোমাকে পত্রলেখা, তোমাকে আমার অভিমান...

তোমায় কতো পত্র লিখি এবং ছিঁড়ি। হাতের লেখা–
কী বিচ্ছিরি। আবার লিখি...
দেই মিশিয়ে ফুলপাপড়ি, চুম্বনদাগ আবার ছিঁড়ি
জলে ভাসাই, জলফোঁটা দেই আবার লিখি।

ঘাসের কাছে পাতার কাছে নতুন কত্তো শব্দ শিখি
তোমার জন্য সবই লিখি...

যত্নে আবার খাতা খুলেই, শুকনো ফুলের ধূপ মেখে যেই
লিখতে বসি– বৃষ্টি নামে, মেঘ ডাকে খুউব
পথ ডুবে যায়, দিক ভুলে যায় ছোট্ট সারস
তার কথাটি তোমায় লিখি। চোখের তারায় খানিকটা মেঘ
মেঘ উড়ে যায় দূর পরবাস, তোমায় ডাকি...

মায়ের অসুখ, বোনের ছোট্ট আবির মাখা কপোল জুড়ে আশীর্বাণী;
হঠাৎ দেখা– সড়ক জুড়ে এক বনফুল ধুলোয় হাসে আর ভাসমান
এক তরুণীর কান্নার দাগ মুছিয়ে দিচ্ছে আরেকটি হাত
বৃক্ষ যেমন রোদের ছায়া সে মূর্তিমান। তোমায় লিখি...

কান্না লিখি, ঘেন্না লিখি, বনপলাশের স্বপ্ন লিখি
রাত্রি লিখি। জানলা জুড়ে তৃষ্ণারেখা শব্দ সবই

তোমায় কত্তো জীবন লিখি এবং ছিঁড়ি। হাতের লেখা–
কী বিচ্ছিরি...

বাবার চশমা

ওই তো দেয়ালে বাবা, রোপিত কামরাঙা গাছ–
কার্নিসে শুভেচ্ছা স্বরূপ
তেছড়া রোদ্দুর খেলে আগের দিনের মতো
সন্ধ্যার ধূপ।

ওই তো দেয়ালঘড়ি

সময় দিচ্ছে আজও
জুয়েল টিকটিক । দেয়ালে মাকড়শা–
জালবিদ্ধ দু'একটি শিশু বৃশ্চিক ।

হাওয়া দিচ্ছে দক্ষিণ জানালা
আবছা কেঁপে
কেঁপে ওঠে ক্যালেন্ডার পাতা
ঝোলানো মসৃণ আজও, রেলি ব্রাদার্স
ছাতা ।

টেবিলে বই ইতিউতি
চশমাটি পিতার দু'চোখ
ঝাপসা পৃথিবী দেখি; মুহ্যমান বুক ভাঙে
শোক!

আগন্তুক

আমাকে চেনোনি তুমি? শাখা বিস্তৃত আমি মায়ামহীরুহ । আগুন দিয়েছ যাকে–
জল আর দাহ্য রসায়ন । আমাকে চেনোনি তবে? ধুলোমাখা পথের সমীপে
দেখা যায় দু'একটি রঙ্গন । অচেনা মেনেছ অতঃপর? আশীর্বাদ তালুভরা আলুভরা
যেমন জমিন । কেন যে চেনো না... এই ছানি-মায়াদের দেশে আমিও তো রয়েছি
বিভ্রম ।

বোঝনি সুন্দর তুমি? রোদে পোড়া, জলে ভেজা তালের খোড়লে
থেকে তবে উদভ্রান্ত মধ্যাহ্নে মিহিস্বরে শোনাইনি গান? তারাজ্বলা বিপ্রতীপ জ্যামিতি
শহরে
বুদ্বুদ-ওড়া সেই প্রিয় শিশুতোষ, মধ্যে তুমি চেনোনি জলের রামধনু?

কী আশ্চর্য বিড়ম্বনাময়–
অস্তিত্ববিনাশী স্বচ্ছ কাচ বড্ড মাৎস্যন্যায় । চেনোনি চেনোনি তুমি মেঘের সংকেত!

উন্মুক্ত চরাচর আকাশে মুখ, মঙ্গল কি অন্য গ্রহান্তরে, মায়াজাল ছিঁড়ে খুউব–

মিস্কিওয়ে ঘুরেছি সমূহ। জননীর ছায়া জুড়ে প্রতি জন্মদাগ, বাঁকে বাঁকে একাঙ্কিকায়

তবুও বোঝোনি ওই শিরায় শিরায়, পুরনো দিনের মুদ্রা নেচে ওঠে ধাঙরের মতো
জলে জ্বলে আখ্যান দেখোনি কখনো?
বনমোরগের ডাকে যে শেয়াল গল্প বলতে চায়, ষাষ্টাঙ্গে জানাওনি কুর্নিশ।
অথবা সে গন্ধর্ব নিয়মে, শিশিরের ফোঁটা দিয়ে এঁকেছ কাজল। আর
জুজুদের কানে কানে তবু তুমি গল্প বলে গেছ, নাকি– ছিপি খুলে ফেনাজল
শিখে গেছ ভাবুক প্রজ্ঞান?

আমাকে চেনোনি আমি পিঁপড়েমন্ত্র ক্ষুদ্রশস্যকণা, জমিয়েছি কার অন্ন তবে?

রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধশ্বাস ক্রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতায়, আমাকে দেখোনি তুমি।
কী বিষাদ মায়ামৃগ, বজ্রমেঘ মুঠোয় আমি হাওয়ার মল্লার। জ্বলে জ্বলে
বাষ্পাকুল আলো বুকে কৃষ্ণগহ্বর। সে-ও তো দ্যাখোনি তুমি বিষণ্ন দুরবিন...

আমাকে চেনোনি তুমি? মেরেছ চাবুক ক্ষুব্ধ, রক্তে করেছো জলপান
ফুলের কুসুম দিয়ে অভিনব কপোলে সম্মান। দূর্বাঘাস করে ঠিক–
মাড়িয়েছ দু'পায়ে জঙ্গম। মেঘের আহ্নিকে সিক্ত আগুনে করেছ বিসর্জন, অতঃপর...

চেনোনি আমাকে আমি নিজের ঈশ্বর। যূপকাঠে মৃত্যুমুখ, চোখে মৃত হাসির উত্তাপ
ভেঙে ফুঁড়ে তোমাদের মসৃণ চাদরে, নকশা কেটে ফুল এঁকে দেব।

তোমাদের সঙরূপ– তোমার নিলাজ প্রটোটাইপ– জাল জেনে তথাপিও
পাখা খুলে নৃত্যরত ভুল প্রজাপতি। শাখামৃগদের দেশে আমিও তো–
কাকতাড়ুয়া, ঋজুরেখ ভুল বনস্পতি...

কা জী না সি র মা মু ন

শস্যমালা

বাজারের নাম শস্যমালা
সুতিয়া নদীর পাশে অতনু দেহের মতো সাবলীল মানুষের ভিড়
তামাগলা সূর্যের সিথানে তবু অরণ্যশোভন এই নীরবতা খান খান ভেঙে যাবে আজ
সরব উত্থানে কোন্ উজ্জীবন
জড়িয়ে রয়েছে এই প্রাণের পেখম জনতার?
তেমাথায় গোল হয়ে সুতিয়া নদীর পাশে অভিলাষহীন?
পণ্যের জঠরে বসে কেউ বুঝি জাদুর দোলক শুধু দু'হাতে নাড়েন
চিলতে রোদের মতো প্রতিপাদ্য সোনার হৃদয় এখানে দারুণ বেচাকেনা হয় ।
মনের ব্যঞ্জনে খুব শিখর ছুঁয়েছি বলে মানুষের
আজ বাঁশি হয়ে যাই; উড়ে আসি রঙিন ফানুস আমি হাওয়ায় হাওয়ায় পলাতক ।
উল্লম্ব গতির দিকে মুখ করে প্রতিভায় জেগে আছে গগন শিরীষ
একটি সজনেগাছ, পাতা নাই, ডালে ডালে নিরীহ বিকেল
মনে হয় ভৌতিক কঙ্কাল, শুধু নিরন্ন আঙুলগুলো থাবা মেলে আছে ।
পাঁচটি সতীর্থ পাখি এইমাত্র সহসা দুর্বার উড়ে গেল
জীবনের ভাঁজে ভাঁজে পরিবৃত স্বাধীনতা কোথায় লুকিয়ে থাকে এতটা সুলভ?
শুকনো নদীর বুকে ফসলের ঢেউ...
প্রতিবর্ণ সভ্যতার সবুজ আগুন বুঝি জল কেড়ে নিল!
সুবর্ণ কৃষক ছাড়া লোল অভিশাপ তবে কে বোঝে এমন?
বনেদি বাড়ির দিকে ওইযে মেয়েরা তাই গগনবিদারী সুখ, তবু
নিরুপায় একটি বেদনা শুধু আঁচলে বেঁধেছে ।
আর বুড়ো বৃক্ষের কোটরে থাকা কুণ্ডলিত সাপের মতন
অনন্য খোঁপায় তারা গুঁজে নিচ্ছে ফুল, সাদা জবা ।
মোড়ল বাঁশের মতো আমার যৌবন কেন স্ফীত হয়ে যায়?
নিজেকে খরচ করে সজল ঋণের ভারে নুয়ে পড়ি ।

আকাশ এখানে রোজ সহস্র মেঘের কুঁড়েঘর
হিমের কুন্তলে আজ জেগে আছে রমণী সুলভ ।
আহা নারী! আমাকে ছোবল দাও,
সভ্যতা বিলীন করে অরণ্যবাসরে সমধিক নীলকণ্ঠ হয়ে উঠি

দৃষ্টিপাত

স্তন
দু'মুঠো জানালা তোমার
উঁকি দিলে অন্তঃপুরে লেলিহান
পরীর পৃথিবী যেন মানবী শরীর
কতদূর লতাপাতা?
বনের পশম?
নাভির প্রদেশে ছত্রখান
স্পর্শের গণ্ডগ্রাম?
নির্জন?
চাঁদ, নিভে যাও
সিঁদেল চোরের কাছে জোছনাকে
শত্রু মনে হয় ।

এই শেষ চুমুক তোমার

মেঘের নিতম্ব নাই; নাচতে পারে না তাই ভাসে ।
আমরা সবাই ওই নিতম্ব রহিত মেঘ; দেবদারু পাতাবাহারের মতো
বাপ চাচা ফুপুদের সরল ব্যঞ্জনে ফুলহীন, ফলহীন
সতীর্থ রচনা করে চলেছি কেবল ।
সবুজ টিয়ের মতো লাল ঠোঁটে তুলে নিয়ে
ভাগ্যের হলুদ খাম গণক প্রবঞ্চকের
নিজেই জানি না কার ভাগ্য কতটুকু ।
অথচ মাটির এক ভাঙা ঠুলি গতকাল রাতের বৃষ্টির
অবোধ নিরীহ জল বুকে নিয়ে উঠোনের নিকট উপান্তে

ব্যাঙের ছাতার নিচে চুপচাপ । সে-ও জানে সূর্যের সফল
অত্যাচারে হয়তো ফুরাবে তার স্পন্দপ্রাণ, মৌন ঘনঘটা...
যদি এই নিরুত্তাপ দেহত্যাগ, পরিণত হত্যা রঙ
নিষ্প্রাণ বাষ্পের দিকে আর এই জল বিলীনতা
অকুণ্ঠ দর্শন ভেবে জপ করি ডালিমের নীরব ছায়ায়
লাল ফাটা মগ্ন বিরহের
কবর দেখাবো বলে–তবে, হে, বাতাসদেহ, রসনিকুঞ্জের
পরপারে বেদন বৃষ্টির পরিচারিকা, তুমি কি
ভাববে, আমিও জীবনের
বিফল উপাত্তে অপারগ
লাটিম ঘুরাচ্ছি শুধু শুধু? যেন আমি কাদাখোঁচা পাখি
সোনাবউ খুঁজছি কাদায়?

খরচের প্রজাপতি হাতে নিয়ে আমি চিরদিন ভেসে গেছি
কেবলি বিরল অপচয়ে ।
পেয়ারার তিরোধানে আজ তাই হল্লা করে ছুটে যায় দাঁতের আক্ষেপ ।
জীবন দেখেছি এক জলঢোঁড়া সাপের মতন
কামড় দিয়েছি, তবু বিষহীন উপদ্রুত ক্ষতের চিহ্নটি
ছাড়া অন্য ধ্রুবতারা কুশ রক্ত রিরংসা অভয়
খই লালা অমৃত চুম্বন কাক–এতসব অবগত
আলো পাখি প্রেম বৈরিতার অধিকারে
পোড়াতে পারিনি আজও জীবনের অভিধানে
নতুন শব্দের মতো রহস্যের নারীকে, দারুণ অল্পে ভোলে
এ রকম বালক, বিরল বন্ধু, মাতৃকা অথবা খুকি যার
ফ্রকপরা প্রথম যৌবন ক্যান্ডি চকলেট হাতে পেলে রোজ
মুঠোয় আকাশ নিয়ে নাচতে পারতো ।
আকাঙ্ক্ষার মতো
বিশাল আকাশ!
আজ তাই আলো গঞ্জনার, মনোবিকৃতির নতুন বিগ্রহে
চন্দ্রমল্লিকার এক সোহাগ দুপুর
হঠাৎ আমাকে দিলে গন্ধ পরিমল, মনে হয়
নগরীর গণিকাপাড়ায় মানিব্যাগ ফেলে এসে
ভাবতে পারবো
পৌরুষ অপরাজিত!...

যেন-বা নগর
প্রিয় তরুর নিচে গিরিকা দেবীর মতো জ্বলজ্বল করে–
তার প্রেম প্রভা পরিচয়হীন ধূম্রল যৌবনে কালো পিচ হয়ে
গলে যাচ্ছি বসুরাজ; কথক রাজার মতো ডাকছি হাতের
সেলফোনে, ওগো বুকপোড়া পাথরের সড়ক সম্রাজ্ঞী,
ট্রাফিক জ্যামের কোনো বিভীষিকা নাই; দাও, দাও,
লম্পট রাত্রির হেরোইন, স্তন বিমোহনে ঘুমিয়ে কাটাই ।
তারপর পথিক নারীর দেহ-বাতায়নে বিনামূল্যে উঁকি দেয়
জলপাই রঙে আঁকা মিলিটারি ভ্যান ।
সারারাত পুলিশ পুলিশ; তবু বারবণিতার দগ্ধ কামুক শরীর
চেয়ে নেয় টুংটাং রিকশার মাতাল শ্রমিক ।
সশ্রম প্যাডেল ছেড়ে আজকে সে মোহমগ্ন, প্রেমিক মিথ্যুক ।
আর ট্রাক, মহামতি সৌরচাকা, পথের ধর্ষক–
তেলের পাম্পের কাছে নগদ টাকায় কিছু যৌন যোগাযোগ ফেলে
চলে যায়, চলে যায় দূরে...
শুধু আমি রক্তবিরচিত বুনো সভ্যতার তিক্ত উপহাস;
মানুষের গীতল পশ্চাতে লাথি মেরে
অগত্যা মাস্তান । খলনগরীর পাঁজাকোলে
গিরিকা দেবীর কথা ভাবছি; যেন সে
জাদু বীণা, বাঁশি; প্রাণে তিলোত্তমা হাতে আখগাছ
দেখিয়ে বলছে, এই নাও, লাঠিভরা শরবত,
এই শেষ চুমুক তোমার....

(*অশ্রুপার্বণ* কাব্যগ্রন্থ থেকে)

ডানার স্বপ্নটা আর নেই

পত্রল ব্যবধানে আমি যে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
সেখানে পাখির মতো গুলি পড়ে
বুলেটবিদ্ধ ছায়ার নিচে
ছেঁড়া পালকের স্তূপ ছাড়া কিছুই দেখাবার নেই আমার
বুলেট আর পাখিদের সাথে এভাবে আমার
স্বপ্নের সংযোগ

যেন পাতা
পাখি হতে চেয়েছিল
পাখি মৃত্যু দিয়ে লিখেছে সেই শোক
তাই ভাবছি
উড়বো না
আকাশ মাতিয়ে এলে মনে হবে
ডানার স্বপ্নটা আর নেই ।

লবণ প্রার্থনার দিনলিপি

বাগান সংগুপ্ত রেখে
তুমি কেন পাথর ভালোবাসো?
দেয়ালে শ্যাওলা জমে
কাঠামো গুঁড়িয়ে দিলে ধুলো জমে
প্রত্ন-প্রবেশিকায়
অতীত মোহিত করে তুমি কেন
পিছনে হাঁটো?

তালগাছ নীরবে বাড়ে । ঝড়েও লুটিয়ে পড়ে না ।
তোমাকে পাহাড় দিলাম । মৌনতায় উঠে আসো ।

পুলক ছড়িয়ে দিলে
সঙ্গে কিছু বিষাদের দায় থেকে যায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে জীবন মিলিয়ে দেখো
সমুদ্র কখনো লিখবে না লবণ প্রার্থনার দিনলিপি ।
বিষাদ তাড়িত হলে তুমি কেন আকাঙ্ক্ষা মাড়াও?
অপূরণের দাবানলে
মানুষ কেবলি ছাই হতে চায়, সোনা নয় ।
হৃদয়ে আকাশ গুঁজে রাখো
মেঘে মেঘে স্বপ্ন খুঁজে পাবে ।

মৃত্যুকে প্রেমের জন্য উপাত্ত ভেবো না
তোমাকে শোনবো লুপ্ত পাথরের গান ।

(*লখিন্দরের গান* কাব্যগ্রন্থ থেকে)

আ ল ম গী র নি ষা দ

এই শহর একটি সন্ধ্যা এবং আমি

একটা শহর দেখো কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সমস্ত নথিপত্র
মুদ্রাদিসহ । রেললাইন-পাড়ার ভেতর থেকে রহস্যাকারে
উঠে আসে ধোঁয়া, আসলে সন্ধ্যা যাচ্ছে দিগ্বিদিকে, আকাশে ছড়িয়ে ।
আমিও তখন একটা একশো এমএল নিকোলাস শিশি'র
অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছি । চিন্তা করে দেখেছি প্রেমফ্রেম কিছু না,
দুজনের অভ্যাস । দিনটা কেটে যাচ্ছে । পালাতে চাইলে
দেখি, ভালোবাসা বাড়ছে । একটা সিগারেট ধরিয়েছি,
তারপর সিগারেট ।

কারো রক্তে দেখে ফেলি নীচতার খেলা । কোথায় কখন
কোন প্রাচ্যে কে কার কলোনি হলো । আমি বুকের ভেতর সেই
অতিচেনা চুরচুর মোচড়ের অপেক্ষায় থাকি । কখনো-বা
মানুষের বিলুপ্ত কিছু হারিয়ে যায় । রাত্রি হলে,
কলকাতার সব মেসবাড়িওলা ক্যাথলিক যাজক হয়ে যায় ।

আজ শুধু পাতা খসা; পতনের শব্দে খুব দুঃখ পাই । কোনো
ক্রসিংয়ে এলে ট্রাফিক সিগন্যাল পড়ে । আর আমি
রোজ জাহাঙ্গীরনগরে প্রেমিকার সাথে পাখি দেখি...
তোমার মুখ মনে পড়ে না; নাকি ইচ্ছে করে?
দণ্ডেক দাঁড়াবো নাকি বরিশালের কবির সাহসে?
বহুগামী প্রেমিকেরা শুনেছি, ভালোবাসায় একনিষ্ঠ হয় ।

রাত বাড়লে আমি টেবিলঘড়ি উল্টে রাখি ।
বন্ধুরা 'চ্যাট' করে স্থানের ধারণা ভাঙে । অথচ এই সন্ধ্যা
আমার কাছে একটা সম্পূর্ণ জীবন মনে হয় । একটা
পাখিহীন শহরে আমার ফুরিয়ে যাবার থাকে ।

একজন মানুষের দেখলাম, বিরহের ভেতরেই জন্ম
এবং সাবালক হয়ে যাচ্ছে প্রেম ।

হন্যমান

আমার কিন্তু মাঝে মাঝে খুন হতে ইচ্ছে করে

গোপন আততায়ী মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে
রক্তের ভেতর পড়ে আছি এইমাত্র
নিহতমান যন্ত্রণায় কোনো শিল্পের অনুভূতি
আমাকে ভর করবে তখন?

যন্ত্রণার পিক আওয়ারে শুনেছি শূন্যতা আছে
এই নিবৃত্তি মানে সমাপ্তি নয়
একমাত্রিক পরম প্রবাহ

নিহত হতে হতে মানুষ কি মাদকে বুঁদ হয়!
অন্তরীক্ষ থেকে তার উঠোনে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে
জোছনার ওহি ।

কবির জীবন দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করে
অনির্গম যাত্রায়

নিহতের যন্ত্রণা যে কোনো শিল্পেরই মোদ্দাকথা ।

দেশ

বহু পুরুষের ভালোবাসা পেতে পেতে
তুই একলা হয়ে গেলি ।

মার্কসবাদ

মার্কসবাদ পুঁজিবাদ খতমের কথা বইলা
জন্মাইলেও আদপে বিষম তা না ।

যতদিন এইটা অর্থকড়ির আন্দাজে ছিল
মার্কসবাদ নিজেও তাই বিশ্বাস করছে ।

যে-ই কথাটা কৌটিল্য ছাড়াইয়া চৈতন্যে এসে ঠেকলো
দেখা গেল, মার্কসবাদই পুঁজিবাদের মহান দার্শনিক ।

পাপকথা

ক্লাসে যাচ্ছি, ধারের টাকায় ধার শুধবো
হিপপকেটে টেররিজম
বুকপকেটের শূন্যতা, দেখিস যেন হারায় না ।

নীলকুঠিতে হাজিরা দিলি? আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে নে
তোমার না প্রেমিকা আছে? সাবধান
আমার কিন্তু দাঁড়ায় না ।

ও সব কথা ছাড়ো বস, বিদেশ কিন্তু ছাড়ে না
আজ হবে উদ্‌মা নেশা
কোনো বান্ধবী হাত বাড়ায় না?

ওই গলিটা এড়িয়ে চলি

বাকির খাতায় নতুন দোকান
বন্ধুরা সব 'ঘরপোড়া', বিফল ধারের বায়না ।

আমার কিন্তু চলে যাচ্ছে, কী করে তা জানি না
সকাল দুপুর টুবা হয়ে
সাবেকি সব আবেগ-টাবেগ, এখন আমায় নাড়ায় না ।

এয়ারপোস্টে বাড়ছে পাপ, একটা চিঠিও লিখছি না
সাদাপাতা, বইপত্তর, রাত্রি জাগা আরেকটি ভোর
ডুবে যাচ্ছি, তবু শালী আমায় ছেড়ে যায় না ।

কোথায় ফিরবো জানি না

একদিন ঘোরের মধ্যে
খুব সন্ধ্যায়
পতন আমাকে ডেকেছিল, পতন ।

সুবোধ প্রেমিকের মতো, আমি
তার গালে গাল রেখেছিলাম ।

প্রায় আমাকে বাড়ি ফিরতে হতো রাত্তিরে
ফেরার পথেই ছিল
তিতির কান্নার মতো এক নিস্তব্ধ মাঠ
মাঝে মাঝে কী হতো জানি না
রক্তের নালার মতো ফেরবার সরুপথ–
দুপাশের অদ্ভুত জমাট শূন্যতা
একেক দিন আমাকে কীভাবে যে ছুঁয়ে দিতো
সেদিন আমার ফেরা হতো না
সারারাত আবর্তিত বুকের দহ
কোথাও ফিরতে ইচ্ছে করতো না আর ।

শৈশবের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল না
পাটের গন্ধে ফিরে আসা সহসা কৈশোর

আমার দৃশ্য জুড়ে শুধু পিতাহীন আরণ্যপ্রহর

পিতা আমাকে ফিরতে বলে এখন
অথচ
শৈশবের বিষণ্ন কান্নায়
তার বুক আমার ছিলো না ।
আমি ছিলাম রোগাভোগা
প্রায়ই জ্বরের ঘোরে-বেঘোরে কেটে যেতো
দি এ টিমের রাতগুলো ।

এখন আমার বিশ্বাস হয় না
উষ্ণ ভাতের মতো রাতের বেলা
বাবা আমার বিছানার পাশে পায়চারি করতেন
একসময় নিঃসাড়ে উঠে এসে
বলতেন, ‘সোনালি শাহজাদা’র কথা ।

বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরতেন
আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতাম
অসুস্থ শরীর বুকের মমত্ব বোঝে না

বাবা সম্রাট বাবরের গল্প বলতেন
আমি বিহ্বল হয়ে সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম,
এক অলৌকিকতা প্রত্যক্ষণের আশায় উৎকণ্ঠায়
ছটফট অস্বস্তি নিয়ে নিশ্চুপ
বুঝতে চাইতাম
আমার বুকের জ্বরগুলো বাবার বুকে যায় কি না!

আমি আজো বুঝি না
বয়স কেন দূরত্ব এনে দেয়!
অভিজ্ঞতা, সংগ্রহ, পরিচয়তা কেন
মানুষকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ একলা করে দেয় ।
একদিন বিকেলে আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না
আমি নিজের আত্মার পায়ে হাঁটু মুড়ে বসে
একমুঠো অন্ধকার চেয়েছি ।

পতনের আছে অন্ধকার
সৃষ্টির শুরু অন্ধকারে
অন্ধকার থেকে উঠে আসা এই প্রাণ
আসলে পতনে আছে টান
জন্মের টান আমাকে পতনে ফেরায় ।

এই যে পৃথিবী
সবাই নিজস্ব কূপে বসবাস করে
অনন্ত আকাশ ভেবে;

আমার বুকে ধস নেমে যায়
নিঃশব্দ থেকে উঠে আসে কোলাহল
পতনের মতো সুতীব্র টান
আমি কোথাও অনুভব করি না,
এমনকি যাকে না পেলে আমার পৃথিবী
মিথ্যে হয়ে যায়
তার স্পর্শও আমাকে এতটা ছোঁয় না ।

আমাকে ফিরতে বলো
কোথায় ফিরবো!

সো হে ল হা সা ন গা লি ব

সসেমিরা

বইতে না পেরে বট, নিজেরই এ ভার, মাটিতে নামায় ঝুরি–
পাখিটিও বোঝে তার, নতুন একটি কাণ্ডে সে চায় দাঁড়াতে ।

যে হাত সহসা থেমে, নেমে আসে হাতে
তাকে প্রশ্ন ক'রো না, প্রশ্নটি নয় এমন জরুরি ।

ছুঁয়ে দ্যাখো, ছুঁলেই তো ফেটে যাবে দোপাটির ফল–
অপেক্ষার গোপন বেদনা ।
সমস্তই মনে হবে আগেই সাজানো, চমকে দেবার ছল

তারপরও সাহসে কুলালে
কাঁটাঝোপ পার হয়ে বনফুল তুলে নিও ।

নীলে ডোবা তুলি এনে হলুদে বুলালে
কী করে সবুজ হয়, বুঝিনি আমিও ।

গালিব

তোমার মৃত্যুর পর কত যে বালিকা
তারার জালিকা মুড়ে হয়েছে ষোড়শী–
অগণ্য, অসংখ্য; ঠিক তত দীর্ঘশ্বাস জন্ম নিলো পৃথিবীতে ।
জন্ম নিলো পীড়া, মড়ক ও মহামারী;
কবিতার খেরোখাতা ঢেকে দিলো মসি ।

আমিও মরেছি মর্মে । এ জলমণ্ডলে হাওয়া বিদ্রূপের মতো
নিরাময়হীন । কায়া কোরবানি করেই ফের
পেতে হবে আয়ুঋণ–

যা বলুক নিখিলেশ, নিখিলের এই পশ্বাচার
এ-ই ত্যাগব্রত...
তাই আছি ধর্মে, আছি বন্দি গ্রীষ্ম আর শীতে;
অর্শে কত বর্ষা চির-শুষ্ক সিলিকনে– বালির আর্শিতে ।

উদয় এবং অস্তাচলে দিগন্তের মেঘ
অগ্নিসুধা পান করে যে-টুকু সময়
হাত কিংবা হাতুড়ির উৎপাতবিহীন
কামারশালার দগ্ধ লোহার মতন জ্বলে
যে-টুকু সময় ধুলো
উড়ে গিয়ে মানুষের মন ছুঁলো

তেমনই সুযোগ বুঝে দেয় উঁকি নিথর সবুজে
তেলাকুচো ফল– রক্তে টলোমল
একটি দ্যুলোক

সে-টুকু সময়
এ জীবন রাঙা হয়; তবু কোনো রঙ নয়
তৃপ্তিমূলক ।

নারী– এক অদ্ভুত নগরী

‘এই এক অদ্ভুত নগরী– বাগদাদ । এ কথা জানে না কেউ, একটি সে নিজেই চেয়েছিল দুরন্ত হালাকু খান এসে তাকে তছনছ করে দিয়ে যাক । আমি জানি, আর শুনতে পাই এখনো অজস্র হ্রেষা, খুরের বর্ষণশব্দ ।’

‘কোথায় সে মঙ্গোলিয়া– কোন সুদূর মঙ্গল গ্রহে!’

‘এই বাগদাদ যার মঞ্জিলে-মোকাম, সেই ইরাকের কথা ভাবি । সে তো চায় তার সব শহরই লুণ্ঠিত হোক । বৃদ্ধ-খোকা যারা আসে, তারা ভুলে যায় এখানেই মৃত্যু-উপত্যকা । কুফারবাসীদের ডাকে পথ ভুল করে তেমনি কজন একবার এসেছিল কারবালা প্রান্তরে ।’

না, আমরা যাইনি বাগদাদ । করিনি তেমন বাগদান কাউরেই । কাঁচাবাজারের পিছে ঝুপড়ি-ঘরটাতে থাকি । আর গান শুনি: শূন্য এ বুকে পাখি মোর...

কোথা থেকে উড়ে আসে একশো পাখির ঝাঁক! তর্ক আর তাসের খেলায় এ পৃথিবী শোনে ঠিক দুপুরবেলায়–

শুধু একটি ঘুঘুর ডাক ।

অনাস্থাসেতুর ধারে

অনাস্থাসেতুর রেলিঙে হাত রেখে বলছি । উপবাসে দীর্ণ ঘাসের গালিচা, পথ । কত-না তৃষ্ণার্ত, তবু পানীয়ের প্রস্তাবনা সারাদিন ঠেকিয়ে রেখে সন্ধ্যায় এসেছি তোমার দ্বারে । সত্যি বলি, কোনো দুয়ারেই প্রবেশ করি নি আমি । খোলা পেয়েও না । মাতৃ-আজ্ঞা মাথা পেতে নিয়েছি । সেই উদ্দাম লাবণ্যঢেউ আজ এই জীর্ণ পেয়ালায় তুলে নিতে চাই, যার স্পর্শে কাচের ঝাড়বাতি আপনিই চূর্ণ হয়ে পড়ে । আমাকে চূর্ণ করে যে পথে ছড়াবে তুমি, জানি সে পথে হেঁটে যাবে অসংখ্য পুরুষ । তাদের পা ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তপুষ্প ফোটাবে একদিন । কার্নিশের ধার থেকে দেখবে শুধু কার্নেশিয়া, কিছু তার পড়েছে মাটিতে, কিছু মিশে গেছে ধুলায় ।

ধুলায় ধূসর ইতিহাসে চাবুকের শব্দ কি শুনতে পাও? হাতি ও ঘোড়ার ডাক? যদিও এখানে প্রেরক ও প্রাপকের কোনো দ্বৈতগান নেই । হয়তো বেদনা আছে– লা-ওয়ারিশ । আছে আর্তনাদ– না-মঞ্জুর । চলে গেছে হাওয়া, নীলকুঠি যতদূর ।

মিলিন্দপঞ্‌হো

ঈশ, অক্ষ, রজ্জু, চক্র– এসবের মধ্যে কোনটি রথ– এই জিজ্ঞাসার সামনে দ্যাখো রথারোহী যোদ্ধাও কেমন ভূমিসাৎ! হস্ত, পদ, স্কন্ধ,

মাথা– আছো তবে কোনখানে– এ প্রশ্ন থাক আস্তিনে গোটানো ।

একটি দেহের মধ্যে ক্রমাগত প্রবেশ ও প্রস্থান-চিহ্ন রেখে যেতে যেতে
একদিন সকলেই গেয়ে উঠি, প্রায় সমস্বরে, কোথায় পাবো তারে!
এমনকি যখন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে মূর্ত আর বিমূর্ত, চুম্বন ও চিৎকারধ্বনির
দাঁড়িয়াবন্ধায়, তখনও, তখনও মনে হয় শুধু, পাবো কি তারে!

তারই কাঁধে ভর দিয়ে ওই নাচে রৌদ্র । কেঁপে ওঠে বারবার ফড়িঙের
পাখনার ছায়া...

শূন্যে মিলায় ইতিবৃত্ত, সময়েরও দেহ, দীর্ঘশ্বাস । তুমিও হে নাগসেন ।
দিগভোলা এই মিলিন্দের পথে, কে তবু গান গায়, কে এসে ফিরে যায়?
রয়ে গেল ডুমুরপাতায় বৃষ্টিবিন্দু, বর্ষণের নিঃশব্দ হাইফেন ।

ফি রো জ মা ল

রাত্রিমন

বোতল বোবারাত্রি বা দীর্ঘশব্দরেখা
ঘনীভূত কুয়াশায় বাদামিবনবিবর–
পয়দন্ত মনলোভা
জলশূন্য স্বলোকন্তরণ
আত্মআনন্দ নদদেশ দ্বেষাবৃত
বুনোঘাসাগ্রস্থান
মুখাবয়বে মমত্বমন
দৈহিক দৈনন্দিন কখনও
দারুণ পাখা দুরন্তউড়ন্ত উষ্ণানয়ন - - -

যাত্রা

আকাশ দেখলাম বক্রাকার সবুজ
দরজায় জানালায় বারান্দায় ছাদে
কালো প্রজাপতি মস্তিষ্ক পশ্চাতে উড়ছে
চৌরাস্তায় সন্ধ্যায়
উড়ন্ত মেরুপথচ্ছায়
মরুকরণ হতে সুরক্ষা করো মন
গড়ে তোলো সবুজ সরোবর বাগানগান–

অজানা সময়

অজান্তে নিমেষে মিশকালো
দেখায় শুভমেষদল মেঘমালাবলাকায়
অফুরন্ত দারুণ নিশ্বাস নিঃসৃত
ভাসমান বায়ুয় আজো অজস্র . . .
অজানাস্থান নিঃস্নিগুবার্তা ব্যত্যয়
ছন্দবিহীন কারণ স্বচ্ছন্দে লিখে
ফিরে দেখায় সুখবোধ মুখাবয়ব
একদিন হঠাৎ আয়নায় মনে হয়
এই ই . . . আমিষখোর আমিত্বে নিতান্ত
পিটুইটারিগ্রন্থি নিষেক টিপটুথপেস্ট . . . . .
অথচ অপেক্ষ্য আজো অজস্র অনুজীবে
মাইক্রোদন্তহাস্যরূপে কোনদিন বহুগ্রাস
গোগ্রাসে বহুগ্রহ পেরোয়ে
অদ্ভুত !? বিহীন অম্লান চিরন্তন
দেখা হয় . . . . . .

পরিবর্তন

সুগভীর কুয়াশারাত্রি
অপেক্ষায় অস্থির যাত্রী মহোদয়

তড়িঘড়ি যাচ্ছেন শেষরাত্রি ব্রেনের মতন ট্রেন
অনড়স্থির স্টেশন
অবরুদ্ধ কালস্থির
এতো . . . এতো . . . সবশব . . .
যাচ্ছেন যাত্রাবাড়ি
কখন কেউই জানছেন . . .

গতি

কিছু-সুদীর্ঘগাছের তলের মানুষ
তাদের দেহের ভেতর আঁধার ছায়ায়
উষ্ণ-অপেক্ষায় পোহায়
সমধর্মীশক্তি শক্ত-সাম্যাবস্থায় মহাবিশ্বে চলমান

আত্মহারা গণসংগীতে-কিছু-নিশ্চুপ-আত্মার–
দৈহিক ছায়া নদীর বাতাসে গভীরে গহিনে বিমোহিত
রঙিন বৈশাখি ভালোবাসবে
আমবনদের ছায়ার মতোন কোনোদিন নয়–

সমষ্টি বিন্দু

সপ্ত-পৃথিবী নক্ষত্রসম
সহস্রসময় সেতু এঁকেবেঁকে হেঁটে–
দৌড়েছে– জলজগান নদী–

বিকলাঙ্গ বসতির ভেতর তেলাপোকা
মশামাছি-বিলেতি মাগুর মাছ–
ইঁদুর-চিকা-বেড়াল খেলায়–
কুক্কুর-চিক্কুর-শতজীবন ছিন্ন–

নাগালেই ছিলেম
জলের উপর ভেসে বেড়ায় অগ্নি
অরণ্য দাবানল ঘুমন্ত দৃশ্য সমষ্টি বিন্দু

দ্বি তী য় দ শ ক

শ্বে তা শ তা ব্দী এ ষ

হয়তো-বা বয়সের দোষে

হয়তো-বা বয়সের দোষে
এমন একলা লাগে, নিঃস্ব লাগে, শূন্য লাগে সব
রোদ-পাখি-প্রজাপতি কুয়াশায় ঢেকে যায়
কী যে অসহ্য, এইসব দিনকাল
পুড়ে পুড়ে করে ফেলি ছাই ।

মাথার ভেতরে খেলে রাজনীতি
বাড়িঘর ভেঙেচুরে মড়ে যাক
মিশে যাক বাম দিকে অপারগ মানুষের ঢল

কান্নার রোল তুলে লাভ নেই
হাতের শাঁখা ফেলো ভেঙে
হয়তো-বা বয়সের দোষে
অসহ্য ভাবনারা এমন ঝড় তোলে মনে!

রৈখিক ইতিহাস

আমার হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবি
রেখাগুলো বহু বহু জনপদের সাংকেতিক ইতিহাস
গুপ্ত সৌষ্ঠবে এই হাতে রয়েছে সুস্থির

কল্পনা করে নেই, সেইসব জনপদে–
এরকম সন্ধ্যায় জমাট হাটের ভিড়ে
কারা কারা কী সব বাণিজ্য করে নিয়ে যেত,
মহলগুলো ছিলো জৌলুসময় ।
ওইসব জনপদে কোনো কোনো রমণীর মনে
কেমন দুঃখ ছিলো– শুধু এইটুকু নীল রঙ ভাবতে পারি না ।

রক্তজবার মতো লাল লাল লোহিত কণিকা
সিন্ধু-মহেঞ্জোদারো মিশরীয় নীলনদ
লুপ্ত বাতাস ছুঁয়ে বুকের ভেতরে ভাঙে আর গড়ে
অবাক তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে
সাদা হয়ে যায় সভ্যতার শূন্য বিলয়ে
যুদ্ধগ্রস্ত সব দিন আর রাত

আমার হাতের রেখা শূন্যতার ইতিহাস
ভূগোল আর বিজ্ঞানে জোয়ার-ভাটার টানে
বদ্‌লাতে থাকে চিরকাল ।

অতিক্রম

আমাদের পথগুলো একে অন্যকে অতিক্রম করে যায়
নিজেদের ভেতরের অলি-গলি অচেনা বাঁক
সাজিয়ে তুলি দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার আগুনে
পুড়তে থাকা জীবনকাল, ছাই ধ্বংসস্তূপ আর
এঁদোগলির ব্যারিকেড পেরিয়ে, একটি ফুলেল
আঙ্গিনায় যাবার বিলাসী ইচ্ছা বিনা সিগন্যালে

সামনে এসে দাঁড়ায়

রেলগেইট পার হয়ে দয়াময়ী মোড় এরপর
চাঁপাতলা ঘাট, দৃশ্যপটগুলো বদ্‌লাতে থাকে
বদ্‌লাতে থাকে নীতি আর মূল্যবোধের লেবেল আঁটা-মন
ঘনকুয়াশার আবডালে শীতের ছুটির এই পরিচিত শহর
অপরিচিতের মতো আচরণ করে বসে
আমাদের গন্তব্য বদলে যায়–
তবে সঠিক গন্তব্য কোথায় এই প্রশ্নের
উত্তর খুঁজে ফেরে চেতনাগ্রস্ত পথিকের দল

আমাদের পথগুলো তাই চৌকাঠ-আঙ্গিনা পেরিয়ে
ধুলোয়-ধূসরিত, শুধু অতিক্রম করে চলে
সময় আর সামাজিক মৌসুমি উৎসব ।

সহজ চিহ্নায়ণ

ওই তো বাগানে আশ্চর্য গোলাপ
তবু এ বারান্দায় কী তীব্র শূন্যতা
শীতের বিকেলে রোদ কেন এমন বিফল?
এইসব প্রশ্নের উত্তর নেই কোনো
মুখোশ-আঁটা মানুষেরা দিব্যি বেঁচে থাকে চিরকাল;
হৃদয়ে অন্তর্গত বিরোধ যাদের, সুখী হয় না তারা
কোনোদিন, সব কিছু শূন্য মনে হয়, যদিও
পৃথিবী রঙিন!

তবু ভালো লাগে এই শীতে রোদের পরশ
সাজানো বাগান জুড়ে নয়নতারা-গাঁদা-বনিপ্রিন্স
কিরকম হাসি-খুশি ওরা সব বিকীর্ণ শীতে
তাই বুঝি বেঁচে থাকা আজো সহনীয়
ঝুপ্ করে ভালো লাগে সামনে তাকাতে!

অতিক্রান্ত ব্যক্তিগত ভূগোল

তোমাদের ব্যক্তিগত ভূগোলে যদি প্রবেশাধিকার নিষেধ হয়
যাবো তবে নগরীর শেষ প্রান্তরে; ধুলো ওড়ানো কোনো কার্নিভালে
নগ্নপরীদের ক্লান্ত মহড়া শেষে দেখবো পুতুলনাচ,
পাকস্থলী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ,

শিকারিদের ঝলসানো মাংসের উৎসবে মিশে যাওয়া নোনা স্বাদ–
অতিক্রম করে, আমাকে যেতে হবে কোনো সন্ন্যাসীর কাছে ।

হাতে হাতে বদলে যাওয়া নাটাইয়ের সুতো–
পশ্চিমে ক্রমে ভেসে যাওয়া ঘুড়ি দেখে শিউরে ওঠা মায়ের চোখে
উড়ন্ত ক্যাবিনেট শকুনেরা ছায়া ফেলে ।

মিশরীয় মমি পর্যটকেরা এখানে খুঁজতে আসে
চুমকি লাগানো কোনো যাদুর আয়না
আয়নাতে ইতিহাস বিমর্ষ করুণ-কালো ।
আয়নাতে সময়কে দেখা যায় না ।

একপাশে মঞ্চ সাজে অথবা সাজানো মঞ্চে ঝুলে থাকে
সারি সারি মৃতদেহ, মৃত কণ্ঠস্বর
চাঁদের উজ্জ্বলতা বাড়ে-কমে, অন্ধকার জমে এলে
উদ্ধত জোয়ারে ভাসে অদ্ভুত শহর ।

ছোট-বড় গল্পেরা অগ্নিগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, কার্নিভালে
আমার পথ তখন মৃত নগর ছেড়ে বেরিয়ে যায়
বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মানচিত্রে, একরোখা অবিশ্বাসে
বন্ধ চোখ দিয়ে শুধু দেখি নিজের ছায়া,
জীর্ণদেহের কোটরে যদি পাওয়া যায় একটা বায়বীয় সজীবতা,
ঠিক বোঝা যায় না ।

এইভাবে ভূপর্যটনের গল্পেরা পুরনো হতে হতে
অস্বীকার করে সব ইমারত, ব্যক্তিগত ভূগোল,

বৈদ্যুতিক বিভ্রাটে জেগে ওঠে অ্যামিবা,
ব্রহ্মাণ্ড ভরে যায় নরম সবুজ ঘাসে
আমার শরীরে ফোটে ঘাসফুল ।

রা জ কু মা র মা ঝি

ইনসমনিয়া

সারা রাত বাঘিনীর চুমু
শহরজুড়ে মেয়েদের চুম্বনের মতন ভারী বৃষ্টি
বাড়ছে মাছের পিপাসা ।

ছিঁড়ে ফেলা চিরকুটদের শোক
সেলাই করা মেয়ে-পুতুলের টুকরো টাকরা
পরিত্যক্ত চুমুর পেরেক
কার্নিসে দলছুট নতুন বউয়ের মতন মেঘ
কিংবা মেয়েলি জ্যোৎস্নার কনিষ্ঠ তরবারি
শিরায় শিরায় ফরফর ধ্বনি তুলছে ।

সারা রাত বাঘিনীর চুমু
শহরজুড়ে বৃষ্টিরা মাথা খুঁটছে কাচের জানালায়
বাড়ছে মাছের পিপাসা ।

ঈগলও একটা পাখি

পাখিটা উড়ছে
বাতাসকে চুমুতে চুমুতে উড়ে যাচ্ছে
নধর যে পাখিটা গতকাল রাতে

একটা কড়া-রঙ মোরগকে খুব নিপুণ হাতে জবাই করেছে ।

আর সাদা রঙ একদঙ্গল মেঘে
আকাশ ফুঁসছে
অথচ কামড়প্রবণ এক ঠোঁট জলীয় বাষ্পও পাওয়া যাচ্ছে না
একটা রাত সবকটা চোখ খুলে কাঁদবার জন্য.....

স্বপ্নটা

সারা রাত স্বপ্নটা ঘুমোতে পারেনি এক ফোঁটাও
শিরার গভীরে জাবর কেটেছে
কানকো-কাটা কালো মহিষের মাথা;
তিনটা হৃৎপিণ্ড
দুই চোখে আর বুকে পুষে
হাড় জিরজির হাপরের মতো শ্বাস টেনেছে স্বপ্নটা ।

চুমুর ফসিলে সেলাই জমাচ্ছে পাখি পালকের বেশ
হাঙরের দাঁতময় পাকা পাকা চুমুর জখম;
অন্তঃসত্ত্বা উটনীর প্রেমে নীল আতরের গন্ধ
ডুবোচর জুড়ে বাড়ছে নোনা বাগডাশের বসতি ।

সারাটা দিন স্বপ্নটা গন্ধ পাচ্ছে
আবলুস জানালা, পাথর কবাটের
সারাটা দিন তার ছায়ার ভেতর
শীত লাগাচ্ছে বাঘরঙ বেড়ালের ছায়া ।

ইরেজার

চতুর্দিক ক্ষুধার্ত মূর্তিগুলো হাহাকার করছে
তুমি শুধু চুলায় রান্না করে যাচ্ছ
চুলপোড়া চলচ্চিত্রে তোমার একমাত্র সুরঙ্গ অগস্ত্যযাত্রার দধীচিবন
কারণ এখানেই মৃত মানুষের ছাই
পাখিদের সাথে উড়িয়ে দেওয়া হয়
কিংবা কোনো পোয়াতি কুকুরের শীতার্ত শয্যায় বিছিয়ে রাখা হয়
এভাবে যাদের নিলামের ঢোলের বাড়িতে শামুকঘুম ভাঙে না
তারাই দেশ বিক্রি করে । বিক্রি করে মাকে
একটি নদীর মৃত্যু মানে মায়ের মৃত্যুর সমান
এ-কথা শুধু তুমি বলেছিলে
অথচ অন্ধতিস্তা বুকের গভীরে ঢুকতে না পারার আর্তনাদ
এখনো এঁটে আছে গোলটেবিলের বৈঠকে
একজন মাঝি দাঁড় টেনে যাচ্ছে
আর তার নৌকার গলুইয়ে গুন বেঁধে বিপরীতে টানছে
বুনো শূয়রের হাড়
অদূরে সূর্যের সাথে প্রসারিত হচ্ছে শাপলা
আর হ্যারিকানের কালো চিমনি মুছে যাচ্ছে ক্রমাগত

স্ক্রু

বৃক্ষের কোনো মগজ নেই
তবুও খাদ্যের অভাব দেখা দিলে নিজের পাতা ঝেড়ে ফেলে
কিংবা অন্ধ ডাইরেসিয়াসও জানে না
পাখির মলে লুকিয়ে থাকা বীজ পরগাছা হবে কিনা
তবে তিনি জানেন যে
বেশিরভাগ ফল গাছ থেকে পড়লে পাকা হয়
অথবা কবর চাষাবাদ করে মানুষ পুঁতলেই

কংস হওয়া যায় না
তার পূর্বে পড়ে নিতে হয় জেনটাই
শিল্পের নামে বনসাই
উভয় লিঙ্গের কেঁচো ছাড়া আর কি-বা হতে পারে
তবুও মেঘবালিকা আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে জেলিফিশ
আর লাটাই হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মগজহীন বালক
ইঁদুর দাঁতে কেটে দিচ্ছে নাসপাতি জরায়ু
এ কথা ভেবে বন্ধ্যানদের স্রোত– আর কত দূর যেতে পারে

সিসিতিস্

সঙ্গমহীন প্রেম অভিশাপ হয়ে যায়
জেনেও সূর্যের হাত ছুঁতে পারিনি
অ্যালার্ম ঘড়ির তৃতীয় চোখের সাক্ষ্য না বুঝে
কবন্ধচোখে খেয়েছি মানুষের মাংস
ঘুম থেকে জেগে দেখি রক্তাক্ত ওষ্ঠের আহাজারি
মাকে হত্যা করে যারা ওরেস্তেস কিংবা পরশুরাম হতে চায়
তারা গণতান্ত্রিক বনবিবির আশীর্বাদ পেতে পারে
কবিতার খাতায় তারা নির্বাচিত জল্লাদ
অথচ তারাই একদিন সুচের গুহা চেটে আদ্রেঁইস হতে চেয়েছিল
তারা এখন মাকড়সাজালে বন্দি
কাক কণ্ঠের ঠুমরি
ঠাকুরমার ঘুম ভাঙাতে পারে
সঙ্গত কারণে ঝাঁটার দৃশ্য গৌণ নয়

গল্প

থ্যালা সামলিয়ে লে লে

.....

মো হা ম্ম দ আ সা দু জ্জা মা ন

সেবার দেশে খুব আকাল লেগেছিল। আকালের ছুতো করে ডাক্তাররা কম প'সা দিত। দিনে পাঁচ-সাতটা লাশ কেটেও দু'সের চালের দাম হত না। দশ-বারো টাকা সের চাল। ইচ্ছে করলে সে-ও হের-ফের করে কাঁচা পয়সা কামাতে পারত কিন্তু তা করেনি। শুয়ে শুয়েই ভাবছে ও। যক্ষ্মা রোগী। দু'মাস একেবারে বিছানা নিয়েছে। আজ ওর কত কথাই-না মনে পড়ছে।

একদিন ডাক্তার বলল, একটা কেলেঙ্কারি-লাশ আছে। রাতের মধ্যেই ওটার কাটা-ছেঁড়ার কাজ সেরে ফেলতে হবে। অমনি মানোয়া লাশকাটা ঘরে ঢুকল। সাথে সুখলাল। তার সমবয়সী। দোহারা চেহারা দু'জনেরই। ঘরে ঢুকেই একেবারে থ' মানোয়া। লাশ দেখে ওর বিশ্বাসই হয় না যে ওটা লাশ! জীবিত মানুষ নয়! একেবারে তরতাজা। একটি কিশোরীর লাশ। বিষ খেয়েছিল অভাগীটা। বিড় বিড় করে মানোয়া। চাকু চালাতে বড়োই বাধো বাধো ঠেকছে। তবু কাজ শুরু করল মানোয়ারা। পুরো চাদরটা সরাতেই সুখলাল লাশটির ভেতর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে। মানোয়া এ-ধরনের আচরণকে সহ্য করতে পারে না। দিক-বিদিক না-তাকিয়ে সে সুখলালের দু'গালে পটাস পটাস দু'টো চড় কষে দেয়। দাঁতের গোড়া দিয়ে কলকলিয়ে রক্ত বেরোয় সুখলালের। গর্জে উঠে মানোয়া–

ছালা, নিমুকহারাম। যেতা তোকে খোরাখ দিচ্ছে, সেতার সাতে বেইমানি করছিছ!

অন্য কেউ হলে, সুখলাল এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ত বাঘের হুংকার দিয়ে কিন্তু মানোয়া'র বেলায় সে নিরুপায়। কিছু বলেনি সুখলাল। মাথা নিচু করে শুধু চোখের পানি মুছেছে সে। এই কি সেই মানোয়া? যে দু'তিনটে লাশ চাটাইয়ে মুড়িয়ে বগলে ফেলে, অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে পারত? নিজের শরীরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে মানোয়া। ভাগ্যের উপর দোষারোপ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কত আর শুয়ে থাকা যায়। দিন-রাত শুয়ে থাকতে থাকতে হাড়-গোড়ে ব্যথা জমে গেছে মানোয়া'র। অহেতুক ঘুমোবার চেষ্টা করে। চোখ বুজে থাকে অনেকক্ষণ। ঘুম আসে না।

খুট করে শব্দ হয় দোরগোড়ায়। পাশ ফিরে তাকায় মানোয়া। মিন্নতি। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ওর বউ। বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। মিন্নতির মুখটা ভার। চোখগুলো গর্তে ডুবে গেছে। যেদিন থেকে মানোয়া বিছানা নিয়েছে সেদিন থেকে মিন্নতির বড়ো কষ্টে দিন কাটছে।

নিউমার্কেট ঝাঁট দেয় মিন্নতি। সকাল-বিকেল দু'বার। দেড় শ' টাকা মাইনে। বেশির ভাগই বাকি থাকে। গত-মাসের টাকাগুলোও মানোয়া'র পেছনেই খরচ হয়েছে। নিচু গলায় মানোয়া জিজ্ঞেস করে–

কুছু হলোরে মিন্নতি। ডাক্তারবাবু কুছু কহিছে।

মানোয়া'র ভর্তির ব্যাপারে খুব দৌড়াদৌড়ি যাচ্ছে মিন্নতির। কোথাও ভর্তি করা যাচ্ছে না। সবাই আশা দেয়। সিট খালি হলেই ভর্তি করে নেবে। মনের সত্য কথাটা ঢেকে রেখে মিন্নতি হাসে। মিথ্যে আশ্বাস দেয় মানোয়াকে–

হারে মানোয়া হা, তোর ভর্তির ছব থিক কারিয়াই হামি চালিয়ে এলাম। তুই ছুদু খাবি-দাবি আরাম করিবি। দেখে লিছ ছব থিক হয়ে যাবেরে। মিন্নতি মানোয়া'র চুলে হাত বুলায়। মানোয়া মিন্নতির হাতটা চেপে ধরে ওর মুখের দিকে চায়। মানোয়া'র চোখ দুটো সকালের রোদের মতো চিক্ চিক্ করে হাসে। হাসপাতালে ভর্তি হলেই বাঁচা যাবে। আবার আগের মতো দেহ-মন ফিরে পাওয়া যাবে।

মানোয়া'র ভর্তির ব্যাপারে যখন কোনো কিনারাই হয় না তখন খুব খুব করে রাগ হয় মিন্নতির। কাঁদো কাঁদো স্বরে একাই বলতে থাকে– কতো কহিলাম, রে মানোয়া বাংলা টালিস্ লা। তাড়ি ছুবিলা। হামার কতা ছুনলে লে তো! এলা থেলা ছামলিয়ে লে লে।

মানোয়া মিন্নতির এ-রাগের ভাষা বুঝে। বুঝে বলেই আরো দুঃখ বাড়ে ওর জন্যে। মিন্নতি যে ওকে অসম্ভব ভালোবাসে। ভালোবেসেই ওদের বিয়ে হয়েছিল। ঘরের ভেতরের ঘটি-বাটির দিকে অকারণ চেয়ে থাকে মানোয়া তখন। খোঁজ খবর নেয়। দোরগোড়ায় লেঠা মেরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মিন্নতি। বোশেখের উপড়ানো পাটশাকের মতো কেমন নেতিয়ে পড়েছে। মানোয়া'র কী যে মায়া হয়। কথার রেশ পাল্টিয়ে কথা পারে মানোয়া–

মিন্নতিরে, ছোটটা কলছিমে জল লিয়ে আছতে তোর বহুৎ লাগেরে। আজ একতা বড়া কলছি লিয়ে আছবি লা হয়।

মানোয়া'র অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে মিন্নতি কাঁদবে না হাসবে ভেবে পায় না। একে তো যক্ষ্মা রোগী, তার ওপর কোনো পথ্য নেই। রক্ত যাওয়া এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ নেই। কী দিয়ে যে কী হবে, সে চিন্তেয় বাঁচে না সে। আর মানোয়া বলে কলসির কথা। বুক ফেটে কান্না আসতে চায় মিন্নতির। মানোয়াকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া কাটে–

"কানা কহে কান কথা,
আর থছা কহে হামার বিহের কথা !"

আস্তে উঠে মাচার কাছে শিকায় হাত বাড়ায় মিন্নতি। সকালের কিছু তুলে রাখা জাও থেকে দু'তিন চামচ মাটির শানকিতে করে মানোয়া'র সামনে দেয়। খুব নরম করে বলে–

ল্যারে মানোয়া, এত্তু খেয়ে লে।

মানোয়া'র শরীরের দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে আবার বলে–

শরীলডা একেবারে ছুকাইয়া গেছে।

মিন্নতির চোখ দুটো হঠাৎ করে আষাঢ়ের উপচে-পড়া নদীর মতো ছল্‌কে ওঠে। মিন্নতির চোখে-মুখে চিন্তার রেখাগুলো আরো স্পষ্ট দেখায়। ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে মানোয়াকে তুলে বসায়। বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট গণা যায়। চোখ দুটো পাখির বাসার ডিমের মতো পড়ে আছে। মানোয়াকে একটা পালকহীন শকুনের মতো দেখায়। কাঁসার গেলাসে একটু ওষুধ ঢালে মিন্নতি। বেরিয়ে যাবার সময় খুব আদর করে বলে মিন্নতি–

আছুদটুকু খেয়ে লিছ। হামি লিউমার্কেত গেলাম। দাক্তার ছাব তলব করিছে।

মানোয়া ঘাড় কাত করে মিন্নতির কথায় সায় দেয়। বাইরে থেকে কায়দা করে বাঁশের দরজাটা এঁটে দেয় মিন্নতি। এবং সে চলে যায়।

সালেহ চৌধুরী হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার। মিন্নতি চেনে তাকে। মানোয়াই একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মিন্নতি কাঁচু-মাচু করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সব কথা জানাল। এক সময় ধৈর্য রাখতে পারে না সে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। হুমড়ি খেয়ে ডাক্তারের দু'পা জাপটে ধরে মিন্নতি। বিচ্ছেছ করবেন লা ছার, হামার মানোয়ার ছরিল খালি ছুকাইয়া যায়। ছুদু জল খেতে চায়। তাজা তাজা রক্ত যায়। কুছু খাইতে পারেলা। রুপিয়ে থাকলে তো ভালো খানা মিলবে। তাতো লেই।

ডাক্তার টেনে তোলে। চেয়ারে বসিয়ে শান্ত হতে বলে। মানোয়া'র ভর্তির সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা করে দেবে বলে আশ্বাসও দেয়। কিছু ক্যাপসুল মিন্নতির হাতে দিয়ে দিনে তিন বার খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। একটি ছোট চিঠি মিন্নতিকে দিয়ে বলে–

আগামী মাসের ৮ তারিখে ওকে মহাখালী টি. বি. হাসপাতালে নিয়ে যেয়ো। ওরা ভর্তি করে নেবে। চিঠিটা দেখালেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চিথি দেখালেই হবে বাবু? ভর্তি করিয়ে লেবে?

আনন্দে আত্মবিহ্বল মিন্নতি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমিও বলে দেব। শোনো, ওকে পানি কম দেবে। পারলে ডাবের পানি খাওয়াবার চেষ্টা করো।

ওষুধ এবং ছোট্ট চিঠিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় মিন্নতির ভেজা চোখ দু'টো আনন্দে ছল ছল করে উঠে। তড়িঘড়ি ঘরে ফেরে মিন্নতি। এরই মধ্যে মানোয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। মিন্নতি খুব খুশি হয়। একটুও ঘুমোতে যে পারে না। এক-আধটু ঘুমোলে

মিন্নতি ঘরের ভেতর টুঁ শব্দটিও করে না। ৮ তারিখে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে কথাটা বলার জন্যে সে নিঃশব্দে মানোয়া'র ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় শিয়রে বসে থাকে।

বাইরে একটি ট্রাক দৈত্যের মতো শব্দ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সামনে চলে যায়। শব্দে ঘুম ভাঙে মানোয়া'র। মিন্নতির ভীষণ রাগ হয়। ট্রাক ড্রাইভারের চৌদ্দ গোষ্ঠীর উদ্ধার করে সে। প্রথমে সে মানোয়াকে কুলকুচা করায়। ডাক্তারের দেয়া একটা ক্যাপসুল খাইয়ে দেয়। আর বলে মানোয়ারে, তোকে তি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে লেবে। লিউমার্কেতের দাক্তার ছাব কলো। এই দেক চিথি। আঁচলের গিঁট খুলে যত্ন করে চিঠিটা দেখায় মানোয়াকে। মানোয়া চিঠিটা হাতে নেয়। পড়তে পারে না। তবু ওটা ভর্তির চিঠি। বুকে জড়িয়ে ধরে। আনন্দে ওর চোখে সত্যি সত্যি জল আসে। উঠে আচমকা বসতে চায়। কিন্তু একটু উঠেই পড়ে যায় বিছানায়। মিন্নতি বাধা দেয়। উঠতে বারণ করে। আহা হা হা, তুই চুপ রহ। হামি সব করিয়ে লেবে। দেখেলিছ। আত্মহারা মানোয়া চিঠিটা বুকে চেপে ধরেই বলে–

হামি ছমঝে রে মিন্নতি ছমঝে। লিউমার্কেতের দাক্তার বাবু বহুৎ ভালো লোক আছে।

মিন্নতি একটু স্বস্তি বোধ করে। এতোদিনে ভগবান ওর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। একটু আশায় হাতছানি। মানোয়া বাঁচলেই তো ওর প্রকৃত বাঁচা।

যেদিন নিউমার্কেটের সালেহ সাহেব ভর্তির কথা বলেছে, সেদিন থেকেই যেন মানোয়া আস্তে আস্তে সেরে উঠছে। বেশি বেশি খেতে চায়। কাশ-রক্ত কমে গেছে। একাই উঠে বসতে পারে।

দু'দিন যাবত মিন্নতির চোখে স্বস্তির ঘুম। গত দু'তিন মাসে ভুলেও চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। মানোয়া'র গা টিপে দেয়া, এই পানি, এই ওষুধ, কাশ-রক্ত পরিষ্কার করা। বাইরে আনা-নেয়া করতেই রাত শেষ হয়ে যেতো। একেবারে দুর্বিষহ জীবন হয়ে উঠেছিল মিন্নতির।

আজ সকাল থেকেই গা উঠছে না মিন্নতির। ঘরের সামনের রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বসে একটি কাক বার বার মরা ডাক ডাকছে। মিন্নতির মনে কোনো আশঙ্কা জাগে না। সকালবেলাই একটি শানকি হাত থেকে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মিন্নতির বুকের কাছে মৃদু সংশয়-কম্পন উঠতে চায় কিন্তু সে প্রশ্রয় দেয় না। তবু কেন যেন গা চলে না কাজে। আজ কত কাজ। মানোয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব আজকের কথাই তো বলেছিল। মানোয়া'র ভর্তির তারিখ আজ।

মানোয়া'র মুখ-হাত ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দেয়। বালিশের নিচে চাপা দেয়া ইস্ত্রি করা নিলেমি জামাটা পরিয়ে দেয়। চুল আঁচড়িয়ে দেয় সিঁথি করে। নিজের সাজটাও করতে থাকে। ওর মায়ের দেয়া বিয়ের শাড়িটা পরে। কোনো উৎসব ছাড়া ওটা সাধারণত পরে না সে। হাজার হলেও বিয়ের স্মৃতি। চুলের এ-পাশ ও-পাশ দু'টো টান দিতে গিয়ে বাধা পায় মিন্নতি। চিরুনি ঢুকে না। জমবে না ময়লা! কতদিন সাবান

পড়েনি চুলে। একটা ৫৭০ সাবান ছিল তা-ও মানোয়া'র রক্তমাখা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতেই কবে শেষ হয়ে গেছে। আর আনা হয়নি। আর চুলের যত্ন ! যার জন্যে যত্ন, সে তো বিছানা নিয়েছে। কে বলবে–

আহারে মিন্নতি, তোর লম্বা লম্বা কালো চুলের বাহার হামাক্ পাগল করিয়ে দেয়। আর দুষ্টুমি করে চুলের মধ্যে মাথা লুকোবে কে। অঙ্গগুলোর দিকে নজর পড়ে মিন্নতির। কতদিন যত্ন নেই। সাজলে মানোয়া বরাবরই খুশি হত। কিনা রূপের বাহার ওর সারা অঙ্গ জুড়ে।

আট বছর আগে এমন দিনেই ওদের বিয়ে হয়েছিল। কোনো বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। এত তাড়াতাড়ি মানোয়াও চায় না। বাচ্চা-কাচ্চা হলেই বউ আর বউ থাকে না। স্বামীর কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। মিন্নতির শরীরের কোথাও কোনো বসতি নেই। সাজলে কেউ বলতেই পারে না যে, ও ৮ বছর স্বামীর ঘর করছে।

বিয়ের পরেও সুখলাল কত করে লোভ দেখিয়েছে। মানোয়া'র মাতলামির কথা ফাঁস করে দিয়েছে। রুপোর খাড়ু, বিছা, ছল্ মল্ কত কী সেধেছে। কিছুতেই মিন্নতি ভোলেনি। মিন্নতি সুখলালকে শুনিয়ে দিয়েছে–

যারে লিয়ে ডুব দিয়েচি, তারে লিয়েই উদবো, মরবোরে। তুই ভাগ, লইলে মানোয়াকে কয়া দিবো হো। এসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতেই তৈরি হয়ে যায় মিন্নতি। ছোট ভাইকে বলা আছে আগে থেকে। সে রিকসা নিয়ে ন'টার দিকে অপেক্ষা করবে। বেড়ায় ঝোলানো ফাটা আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখটা একবার দেখে নেয়।

হা হা, বড়া ছুন্দর মানিয়েছেরে মিন্নতি। তুই বহুৎ দেখ-না আচিছ্রে। মানোয়া ভালো থাকলে নিশ্চয়ই এ-কথা বলত। মুচকি হাসে সে। হাসলে খুব সুন্দর দেখায় মিন্নতিকে। মানোয়া'র দিকে ফিরে তাকায় মিন্নতি। একটু কাশলো সে। কাশের সাথে একটু রক্ত। চমকে ওঠে মিন্নতি।

আবার রক্ত। অস্ফুট উচ্চারণ করে সে। মানোয়া'র কাছে যায়। দু'দিন আগেও বন্ধ ছিল। কাশ বাড়ে। মিন্নতি মানোয়া'র বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। আজকের কাশের সাথে পুঁজের মতো দলা দলা চাকা চাকা কী যেন পড়ছে ! শিউরে ওঠে মিন্নতি। মনটা অজানা আশঙ্কায় এবার সত্যি সত্যি ভরে ওঠে।

আহ্, গেলাম রে মিন্নতি, গেলাম। হামাক্ মাফ করিয়ে দে। হামি তোকে বহুৎ কষ্ট - - - - - - কথা শেষ করতে পারে না সে, আঁতকে ওঠে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে মানোয়া'র। ইশারায় সে মিন্নতিকে বুক ডলে দিতে বলে।

মিন্নতি আরো ঘন ঘন মানোয়া'র বুকে-পিঠে হাত চালায়। আর আশ্বাস দেয়–

লা লা, তোর কিছু হয়লি। ছব ছেরে যাবে। তুই ভাবিছলে। মানোয়া মানোয়ারে, হামি তোকে হাছপাতালে ভর্তি করিয়া লিবেই লিবে।

নাকে-মুখে চাপ চাপ রক্ত এবার। মানোয়া'র দম বন্ধ হয়ে আসছে। কথা বলতে পারছে না সে। হাত দিয়ে মিন্নতির শাড়ি খাম্চে ধরছে। পা দু'টো লোহার

রডের মতো শক্ত সোজা হয়ে যাচ্ছে। মিন্নতি মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে মানোয়া'র কষ্ট দেখছে।

আচমকা সমস্ত শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মানোয়া মিন্নতির কোলে ঢলে পড়ে। সব শেষ। মিন্নতি মানোয়া'র নিষ্প্রাণ মাথাটা আস্তে রক্তমাখা চিটচিটে বালিশে রাখে। হাত-পা সোজা করিয়ে দেয়। মানোয়া'র লাশের উপর একটি কাঁথা মেলে ঢেকে দেয়। মিন্নতি হাউমাউ করে কাঁদল না। হাসপাতালের বড়ো সার্জনের মুখটা ওর চোখের সামনে কয়েকবার দুলে উঠল। যে সার্জন সিট নেই অজুহাতে বারবার মিন্নতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, মানোয়াকে ভর্তি করে নেয়নি।

মানোয়ার বুকের উপর নিজের মাথা আলতো ঠেকাল মিন্নতি। দু'চোখ বেয়ে প্রতিবাদী উত্তপ্ত নদীর ধারা আস্তে মানোয়া'র রক্তমাখা বুকের সাথে একাকার হয়ে গেল। বাইরে মিন্নতির ছোট ভাই রিকশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। দেরি দেখে সে হেঁকে উঠল– দিদি, জামাইবাবুকে জলদি লিয়ে আয় লা। আপিছ টাইমে অনেক ক্ষেপ পাওয়া যায়রে। জলদি লিয়ে আয়।

প্রকাশিত গল্পের উপলব্ধি

.....

স্ব কৃ ত নো মা ন

বিষয়ের দিক থেকে গল্পটি ভালো, সন্দেহ নেই। ডোম জীবনের বঞ্চনা আর যন্ত্রণার কথা গল্পের ভঙ্গিতে বেশ ভালোভাবেই বয়ান করেছেন লেখক। 'সেবার দেশে খুব আকাল লেগেছিল। আকালের ছুতো করে ডাক্তাররা কম প'সা দিত' – শুরুটা চমৎকার। একটি ভালো গল্পের ইঙ্গিতবাহী।

গল্পের মাঝামাঝি এসে যে কোনো সচেতন পাঠক মুখোমুখী হবেন একটি স্বার্থক গল্প হয়ে ওঠার জন্য বড় এক বাধার। পাঠকের টের পাওয়াকে নাকচ করে দিয়ে গল্পের শেষে মানোয়াকে না মেরে যদি গল্পটাকে অন্যদিকে টার্ন করানো যেত, তবে অন্যরকম একটি গল্প হয়ে যেত। মৃত্যু তো মানবজীবনের সর্বশেষ পরিণতি। এই উপলব্ধিটা সব মানুষেরই আছে। গল্পকারের কাজ তো পাঠকের মনে নতুন উপলব্ধি সঞ্চার করা।

জীবনের এমন দিক, যে দিকটা সম্পর্কে পাঠক ইতোপূর্বে অবগত নন, গল্পকারের কাজ সেদিকে আলো ফেলা, সেদিকটাকে পরিচিত করে তোলা। মানোয়ার মৃত্যুতে গল্পটা গতানুগতিক হয়ে গেল। বিশ শতকীয় 'সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল' অথবা 'মরিয়া গেল'র মতো অনেকটা। মনে হলো, লেখক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ডোম জীবনের বঞ্চনা-লাঞ্চনাকে ফুটিয়ে তুলতে কারো ফরমায়েশ বাস্তবায়ন করেছেন।

ভাষা ও আঙ্গিক প্রচলিত ধারার। পড়েই বোঝা যায় গল্পটা কোনো নবীন লেখকের, যার লেখালেখির বয়স খুব বেশি নয়। বয়স বেশি হলেও তার গল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এখনো গড়ে ওঠেনি। ডোমদের ভাষাটা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। 'মিন্নতির চোখ দুটো হঠাৎ করে আষাঢ়ের উপচে-পড়া নদীর মতো ছল্‌কে ওঠে' কিংবা 'মানোয়ার চোখ দুটো পাখির বাসার ডিমের মতো পড়ে আছে' বা 'মানোয়াকে একটা পালকহীন শকুনের মতো দেখায়' – এসব উপমার মধ্যে সৃজনশীলতা আছে। তবে শব্দের গাঁথুনি ও কাহিনির বর্ণনায় জড়তা লক্ষণীয়।

নারী / প্রবন্ধ

'শেষের রাত্রি' এবং রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর নারীভাবনা

.....

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী-অধিকার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রচারিত এবং প্রবাদ-প্রতিম উচ্চারণের একটি বক্তব্য হল : 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার দাও অধিকার (১৯৯৫ক : ৪১৩)।' এখানে তাঁর অবস্থানে একটি পরিমিতি আমি লক্ষ করি, যা কারো মর্যাদা-রক্ষার পূর্বশর্ত। কারো হাতে কিছু তুলে দেয়ার মধ্যে, দান করার মধ্যে ওই মর্যাদাটি যে থাকে না, রবীন্দ্রনাথ সে-পরিস্থিতিটি লক্ষ করতে বলেন। অমনভাবে পাওয়া যে

প্রকৃত পাওয়া নয়, নয় হয়ে-ওঠা, ক'জন সেটা লক্ষ করেন? *চিত্রাঙ্গদা* গীতিনৃত্যনাট্যেও চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে একই তাৎপর্যের একটি আহ্বান (১৯৯৫খ : ৪৮৯) :

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

এভাবে এগোতে-এগোতে যা পাওয়া যায়, তা নারী-পুরুষ সকলকেই নির্মোহভাবে দেখার দুর্লভ প্রয়াস, আদর্শায়নমুক্তভাবে দেখা। এবং তারই অংশ হল সমালোচনামূলক-ভাবে দেখা। আমার ধারণা : পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন এবং উন্নতির পরে এখন সময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর অনালোচিত এবং স্বল্প-আলোচিত কিছু মতাবস্থানকে লক্ষ করার। নারী-বিষয়ে, নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে। কোথাও এমন কিছু পলকা নেই, যা এতে ভেঙে পড়বে। বরং পরিস্থিতির উন্নতির পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর জন্যে এ-যাবৎ অলক্ষিত-স্বল্পলক্ষিত ধারণা এবং বক্তব্যে এবারে– এখন যাওয়াটাই জরুরি।

এরূপ আলোচনা শুরুর পক্ষে আবার সাহায্য নেয়া যায় *শেষের কবিতা* উপন্যাসের অমিত রায়ের বলা বিখ্যাত কিছু কথার। কথাগুলো যে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কিংবা ঔপন্যাসিকের নয়, তা আমরা মনে রাখব। কিন্তু, কথাগুলোর নিজস্ব মূল্য বা সত্যাসত্যকেও তো লক্ষ না করার কিছু নেই। এ-প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পক্ষে কথাগুলোর (তথ্যসূত্র: কাজল; ২০০৯ : ১১৪) প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য : 'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধে বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার যোগান দেয়।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "স্ত্রীর পত্র"–কেও নারী-অধিকার-বিষয়ে মেনিফেস্টোর মর্যাদা দিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ করা হয় "পয়লা নম্বর"ও। "স্ত্রীর পত্র" গল্পটি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাইব। এই 'পত্র'টি একটি তীর্থস্থান থেকে লেখা, পত্রের আকারেই গল্পটি লেখা। এ- নিয়ে কিছু কথা আমি হেনরিক ইবসেনের *অ' ডলস হাউস*- বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেছিলাম। গল্পের পত্রলেখক মৃণাল স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যায়– শ্রীক্ষেত্রের তীর্থে। পত্রে সে তার স্বামীর সংসারে

দিনযাপনের অভিজ্ঞতাগুলো বয়ান করে। তার জায়ের বোন বিন্দুকে নিয়েই কথা অনেক বেশি। স্বামীর একান্নবর্তী সংসারে তার নিজের এবং অন্য মেয়েদের দুঃখকষ্টের বিবরণে মৃণালের চিঠিটি পূর্ণ। মৃণালের কাছেই বিন্দু বেশি আশ্রয় এবং সুরক্ষা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ-গল্পে সংসারে মেয়েদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার যে সত্য ছবি এঁকেছেন, তা মর্মস্পর্শী। বিন্দুর মতো অসহায় এবং আশ্রিত পরিস্থিতির ছেলে/পুরুষদেরও যে নানা দুর্দশা ঘটে, সেটা আমরা ভুলতে বসি। মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন শেষ পর্যন্ত অসহায় বিন্দুকে বিয়ে দিয়ে তাকে তাদের ঘাড় থেকে নামাতে চাইল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বিন্দু দেখতে পেল যে তার স্বামী পাগল। এ-ব্যাপারে মৃণালকে বিন্দু যা বলেছিল, তা হুবহু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫০৪), সংসারের পরিস্থিতিগুলো যে মিশ্র এবং বিরোধপূর্ণ, অন্যথায় তা বোঝা যাবে না। মৃণাল ঠেসে চেপে প্রশ্ন করলে বিন্দু তার শ্বশুর সম্পর্কে জানাল, '...শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না– কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।' অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এই পরিস্থিতিটি কি প্রকৃতপক্ষে ছোট এবং গুরুত্বহীন? উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমি বলেছিলাম যে "স্ত্রী পত্র" গল্পে এটিও একটি তীর্থযাত্রার, তীর্থবাসের ঘটনা। গল্পে এটি এরূপ দ্বিতীয় ঘটনা। বিন্দুর শ্বশুর, বিন্দুর ভাষ্য-অনুযায়ীই, স্ত্রীকে 'যমের মতো ভয় করেন'। এবং পাগল ছেলের বিয়েতে জড়িত থাকতে না-চেয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু এড়াতে 'বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন।' শ্রীক্ষেত্রবাসিনী মৃণালের গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিন্দুর কাশীবাসী শ্বশুরের গল্প কি কেউ লিখবেন? কোনো মানবতাবাদী, নারীবাদী? রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দ্বিতীয় তীর্থযাত্রার উল্লেখ নিশ্চয় অসচেতন নয়, কিন্তু তিনি তাকে অত্যন্ত অসম গুরুত্বে উল্লেখ করেছেন। মেয়েদের দুর্দশার পরিস্থিতিগুলো নিয়ে লেখা একটি সাহিত্যিক চালে পরিণত হয়েছিল বলেই এই ভারসাম্যহীনতা কি-না, কে বলবে? কোনো অগভীর এবং অন্যায় জনমতকে সমীহ করার মতো মনোভাব বুঝি! প্রসঙ্গক্রমে বলি যে এই জনমতকে কথিতরকম সমীহ করেই বোধ হয় জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিপুল– অধিকাংশ গদ্য লেখা– গল্প, উপন্যাস– অপ্রকাশিত রেখেই প্রয়াত হন। সম্ভাব্য বিরূপ জনপ্রতিক্রিয়ার এই যে পরিস্থিতি, যার মুখে আমরা প্রায় সকলেই অসহায়, জীবনানন্দ দাশ প্রায় সমুদয় গদ্য লেখা অপ্রকাশিত রেখে যান, তা আর কতদিন এভাবে আলোচনা-বিশ্লেষণের বাইরে থাকবে?

"স্ত্রীর পত্র" গল্পে পরবর্তী অনুচ্ছেদে মৃণালের ভাষ্যে বিন্দুর শাশুড়ি সম্পর্কে আরো জানা যায়, 'শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক।' ইত্যাদি। এমন শাশুড়ির ভয়ে বিন্দুকে তৃতীয় রাতে তার পাগল স্বামীর ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তারপর স্বামী ঘুমোবার পরে বিন্দু পালিয়ে চলে এসেছিল মৃণালের কাছে। এখন বিবরণ-মতে, 'পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো

ভয়ানক' যে-নারী, তার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটানোর কাহিনী শেষপর্যন্ত-কাশীবাসী-যে-পুরুষের, তার গল্প কে লিখবেন? সাহিত্যিক এবং তাত্ত্বিক ঝোঁক বলি বা চল বলি, তার মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকবে সমগ্র সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিবাজি? কোনো ভারসাম্যহীনতার পরিণতিই তো কল্যাণকর নয় বলে বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি ছোটগল্প, "শেষের রাত্রি" আমাদের আলোচনার পক্ষে আরো প্রাসঙ্গিক। বিস্ময়কর যে এ-গল্পটি নিয়ে কোথাও তেমন কোনো আলোচনা নেই। বর্তমান যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে শ্রেণি-প্রশ্নটি অনেক পেছনে চলে গেছে, তাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সে-জন্যেই লিঙ্গ বিষয়টি চাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে অবশ্য এ রকম ঘটাই স্বাভাবিক। লৈঙ্গিক সমতা-ন্যায্যতার যে দাবি নারীবাদীদের, "শেষের রাত্রি" গল্পে উপস্থাপিত পরিস্থিতি এবং ঘটনার আলোচনায় তো সেক্ষেত্রে তাদেরও আগ্রহ থাকতে পারত। তা যে নেই, তাঁরা যে "স্ত্রীর পত্র" কিংবা "পয়লা নম্বর" সম্পর্কে বলেই শেষ করেন, তা-ই প্রমাণ করে যে সমতা-ন্যায্যতা তাঁদেরও সত্য আগ্রহ নয়। তাদের বিপুল-অধিকাংশের প্রকৃত আগ্রহ আত্মমঞ্চায়নে।

"শেষের রাত্রি" গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের পরিস্থিতি গল্পটি যতটা জানাতে পারে, অন্য কোনোভাবে তা করা কঠিন। মৃত্যুর আগে একবারের জন্যেও কেন সে তার স্ত্রীর দেখা পর্যন্ত পায় না, গল্পে সে-প্রশ্নের তেমন কোনো উত্তর নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন। স্ত্রী মণির অনাগ্রহ-উপেক্ষা-অবহেলা পাহাড়প্রমাণ। যতীনের মাসির দিক থেকে মণির এই নির্মমতাকে আড়াল করার কিংবা লুকনোর করুণ চেষ্টাগুলো বরং এক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ। সেগুলোই বোধ করি মণির আচরণ যে অকারণ, অগ্রহণযোগ্য, তা জানায়। আরো চোখে পড়ে মণির প্রতি যতীনের নিজের এক অন্ধ অনুরাগ, বুঝি তাকে তার ভালোবাসতেই হবে! মিথ্যেকে সত্য ভাবার এক ঘোর তার! একি কোনো দুরারোগ্য মানসকাঠামো তার, এবং জগৎসংসারের আরো অনেকের? মণির যত অনাগ্রহ, বিকর্ষণ, যতীনের যেন ততই আস্থা, আকর্ষণ! যতীনের এই নির্বিচার ভালোবাসা যে অবকাশ তৈরি করে, মণির মনোভাব এবং আচরণকে তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তবে সাফাই নয়। কারণ, সুযোগ নেওয়াটা সমতা কিংবা ন্যায্যতার মনোভাব নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা অনেকেই তা নিই না।

এ-গল্পটির আলোচনায় আরো বলার আছে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ঘটনার স্তরে থেকেছেন এবং যতীনের একপেশে অনুরাগ সম্পর্কে জানিয়েই যে শেষ করেছেন, তা নয়। গল্পটির একপর্যায়ে যতীন-মণির সম্পর্ক বিষয়ে তার কিছু মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তাতে তাদের অমিলের চরিত্রটা বোঝা যায়, প্রকৃতিগত দূরত্ব সম্পর্কে। যা আরো উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই দুরতিক্রম্য দূরত্ব নিয়ে মণির পীড়িত-ক্লিষ্ট-ভাবিত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, আর যতীনের গোটা জীবনজুড়েই যে এই দূরত্বের বেদনা, যন্ত্রণা, গল্পটি তা-ই নিয়ে। দাম্পত্য সংকটের এক অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে পর্যবেক্ষণ "শেষের রাত্রি" গল্পে, আমরা এখন যা উদ্ধৃত করব, বিস্ময়কর যে জীবনানন্দ

দাশের অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে যেন তারই বিশদতর-বিস্তৃততর বিবরণ। সেখানে নারীর পক্ষ থেকে প্রত্যাহার, উপেক্ষা-অবহেলা আর শীতলতারও বহুলাংশে একই ছবি। জীবনানন্দের লেখা সেসব ছবি তো দেখা যায় না, সওয়া যায় না! যা-ই হোক, আপাতত যতীন-মণির অমিলদীর্ণ দাম্পত্যের যে ধরন কিংবা প্রকৃতি সে সম্পর্কে জানা যাক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২১) :

> যতীন জানে, আজ পর্যন্ত যে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে– সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু, পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড় কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্যপক্ষ মন দিল কিনা খেয়াল না করিলেই হয়; কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে; মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

এই বিবরণ-বিশ্লেষণ গল্পে একটি ঘটনা কিংবা কিছুটা সময় সম্পর্কে উপস্থাপিত হলেও, যতীন-মণির সামগ্রিক সম্পর্ক সম্পর্কেও এ কোনো কিছু কম মূল্যবান নয়। এক কিংবা ছোটকে কেন্দ্র করে, উপলক্ষ করে বরং ভিন্ন এবং বৃহৎ বিষয়ে বলা অনেক কথা এগুলো। দাম্পত্য বা সংসারের ব্যাপক/অনেক ক্ষেত্র সম্পর্কে এরা কিছু গভীর সত্যকে ধারণ করে। প্রেম এবং রোমান্টিকতার জীবনদর্শন এখানে প্রশ্ন এবং পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে। এই বিবরণের দু'-একটি পর্যায় আমাকে স্মরণ করিয়েছে অন্য দু'-একটি সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত কিছু পরিস্থিতি সম্পর্কেও। প্রাসঙ্গিক বিধায় এগুলো সম্পর্কেও একটু জানাতে চাই।

"মাই লাস্ট ডাচেস"-খ্যাত রবার্ট ব্রাউনিং-এর একটি প্রায়-বিপরীত উন্মোচনের কবিতা হচ্ছে– "এ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো"। এ্যান্ড্রিয়া নামের এক চিত্রকরের প্রতি তার স্ত্রী লুক্রেজিয়ার শীতলতা এবং প্রবঞ্চনার গল্পটি ব্রাউনিং এখানে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ড্রামাটিক মনোলগ রীতিতে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এখানে এ্যান্ড্রিয়া নামের শৈলীসফল চিত্রকর মানুষটির মধ্যেও দেখা যায় লুক্রেজিয়ার প্রতি এক ধরনের নিঃশর্ত তথা ভীরু মুগ্ধতার মনোভাব। যার সম্পূর্ণ সুযোগ লুক্রেজিয়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য

সাদৃশ্য হল এখানে কবিতার শুরুতেই দেখা যায় এ্যান্ড্রিয়া-লুক্রেজিয়ার যোগাযোগহীনতা, অন্তঃসারশূন্য সংলাপ কিংবা যে-লক্ষ্যে তাদের কোশেশ (তথ্যসূত্র : রবার্ট; ১৯৫১ : ৩৪৩) ।

> But do not let us quarrel any more,
> No, my Lucrezira; bear with me for once :
> Sit down and all shall happen as you wish.
> You turn your ace, but does it bring your heart?
> ... ...
> I often am much waarier than you think,
> This evening more than usual, and it seems
> As if ? forgive now ? should you let me sit
> Here by the window with your hand in mine
> And look a half-hour forth on Fiesole,
> Both of one mind, as married people use,...

এখানে এ এক ভীরু এবং করুণ আর্তি– সংযোগ, সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার জন্যে, যা পূরণ হয় না সংশ্লিষ্ট নারীর উপেক্ষা এবং ঔদ্ধত্যের কারণে । একাধিক কবিতায় রবার্ট ব্রাউনিং দাম্পত্য তথা সম্পর্কের এরূপ সংকটকে উপস্থিত করেছেন, এবং এ জন্যে নারী-পুরুষ দুয়ের দায়িত্বের সত্য এবং সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করেছেন এক ব্যতিক্রমী মনস্বিতার সঙ্গে, বিখ্যাত "নারী" কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম (তথ্যসূত্র: কাজল; ২০০৯: ১১৪) যেমন এক দুর্লভ এবং মূল্যবান সমগ্রতায় বিষয়টিকে দেখেছিলেন,

> বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।
> বিশ্বে যা কিছু এল পাপতাপ বেদনা অশ্রুবারি,
> অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী ।
> নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয় জ্ঞান?
> তারে বল, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান ।
> অথবা পাপ যে? শয়তান যে? নর নহে নারী নহে,
> ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে ।

কিন্তু, আমরা তো ওপরে উদ্ধৃত নজরুল-কবিতার শেষ দু'টো লাইন গুরুত্ব দিয়ে পড়তে এবং তা নিয়ে ভাবতে মোটেই আগ্রহী নই ।

যোগাযোগ কিংবা সংযোগের প্রশ্নটি প্রকট হয়ে আসে নারী-অধিকার বিষয়ে বহুল-উল্লেখিত নাটক *অ' ডলস্ হাউস*-এও । বিস্ময় এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে যে-ঘর ছেড়ে নোরা বেরিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই সে এবং হেলমার স্বীকার করে নেয় যে তাদের মধ্যে দীর্ঘ দাম্পত্যের কোনো একদিনও সত্যিকার অর্থে সংলাপ যাকে বলে,

তেমন কিছু ঘটেনি। এ-হেন পরিস্থিতি তো ঘরহীন ঘরের কথাই বলে, যা থেকে বেরিয়ে যাওয়া-না-যাওয়াটা সমান (হেনরিক ইবসেন; ১৯৮৪ : ৬২-৬৩)।

নোরা : আমাদের বিয়ের আট বছর হয়েছে। তোমাকে কি এটা ভাবাচ্ছে না যে এই প্রথমবার আমরা দু'জন– তুমি আর আমি– কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি।

হেলমার : 'গুরুত্বপূর্ণ' বলতে কী বোঝাতে চাইছ?

নোরা : এই গোটা আট বছরে– তার চেয়ে বেশি সময় হবে– আমাদের পরিচয়ের শুরু থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একটি শব্দও বিনিময় করিনি।

হেলমার : এটা কি সম্ভাব্য ছিল যে আমি অবিরাম এবং সারাক্ষণ তোমাকে তেমন উদ্বেগ সম্পর্কে বলে যাব যার নিরসনে তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না?

নোরা : আমি কাজের বিষয়াদি নিয়ে বলছি না। বলছি যে আমরা কোনোদিন কোনো বিষয়ের মর্মে পৌঁছার জন্যে ঐকান্তিকতা নিয়ে একত্রে বসিনি।

নোরা সংলাপ বা আলোচনার প্রয়োজন সম্পর্কে বলছে দেখছি; এক বৃহত্তর পরিহাস এই যে একটু পরেই দেখা যাবে যে সর্বশেষ এবং একবারের এই সংলাপেরও তোয়াক্কা না-করেই গৃহত্যাগের চূড়ান্ত এবং অনড় সিদ্ধান্ত সে একাই নিয়ে ফেলেছে।

কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মে উপস্থাপিত এ-ও হচ্ছে দাম্পত্যের ছবি। এরই পটভূমিতে দেখা যেতে পারে "শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে যতীন-মণির সম্পর্ককে। একটি অর্থপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় যতীনের মাসির কাছ থেকে, লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে। এ-বিবরণও অবশ্য শুরু হয় যতীনের একটি ভুল বক্তব্য থেকে, মণিকে ইঙ্গিত করে যতীন বলেছে : 'সেই জন্যেই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।' এর পরেই রয়েছে গল্পের বর্ণনাকারী কিংবা লেখকের ভাষ্য (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫১৯) :

> মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না। কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে, তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না। ও একটু চাহিতে শিখুক– মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, একথা

মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আসা পরাভব মানিতেছিল না।

এ তো প্রচলিত পতিদেবতার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি এবং তদ্‌ভিত্তিক ডিসকোর্স! এখানে রয়েছে 'নারীদেবতা'র ধারণা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে! রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে নারীবাদ-বিরোধী এক তত্ত্ব একে বলা যাবে কি-না, আমার প্রশ্ন সেটাই। কেউ স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে যতীনের যে পূজা করে ঊর্ধ্বে-রাখা, রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী নারী চিত্রাঙ্গদা তো তাকেও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে!

যতীনের মাসি অর্থাৎ একজন সংসার-অভিজ্ঞ নারীর দৃষ্টি দিয়ে যতীন-মণির সম্পর্ককে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এতে ওই-গল্পের নানা বিবরণ এবং মন্তব্যের মূল্য বেড়েছে। ওপরে মাসির যে বিবরণ-পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত, গল্পে তারপরও তা এগিয়ে যায়, আর তাতে আসন্নমৃত্যু যতীনের জীবনের করুণ পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক মনে হতে থাকে (রবীন্দ্রনাথ : ১৯৯৮ : ৫১৯) :

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো– সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপনায় যতীনের আত্মমর্যাদাবোধই শুধু কম নয়, তার উপলব্ধিগুলোও অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের, ব্যতিক্রমী। মণিকে নিয়ে তার মনে এক অপরিমেয়-অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, মণির প্রশ্নে সে যে কত বেশি বাড়িয়ে ভাবতে অভ্যস্ত! মাসি যখন চাইছে, তখনই মণির সম্পর্কে বানোয়াট যে কোনো কিছু বলে অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ যতীনকে তা গেলাতে পারছে। গল্পে এর পরে ঠিক এরূপ আরো কিছু কথোপকথন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২০) :

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে?"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি করে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী মাসি, মণি কি তবে ?"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি ?"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে করে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত। ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীরটা বুঝি?"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া ঠিক নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।"

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী করে?"

"আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি। তবু বার বার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়। ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

ওপরে উদ্ধৃত কথোপকথনেও যতীন-চরিত্রের কিছু ত্রুটি পাওয়া যাচ্ছে, তা এ-ত্রুটির যে-নামই আমরা দিই-না কেন। এ হয়তো দমন-নিপীড়ন-নির্যাতন একবারেই নয়, কিন্তু এ-ও নিশ্চয় ভিন্ন এক ভারসাম্যহীনতা-সৃষ্টির কারণ। মণির মধ্যে যতীনের প্রতি যে-বেপরোয়া উপেক্ষা-অবহেলা, অবিবেচনা-অমর্যাদা, যতীনের প্রশ্রয় এবং প্রশস্তি পেয়েই যে তা তৈরি হয়েছে, এ-কথা আমি বলব না, কিন্তু এ সবের ফলেই যে তার বাড়বাড়ন্ত একটি চেহারা হয়েছে, আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গল্পের পাঠক নিশ্চয় আরো এক ব্যাপারে একমত হবেন যে যতীনের প্রতি এক অপার মাতৃস্নেহ এবং রক্ষকের মনোভাব থেকে তার মাসি এক্ষেত্রে শুধু তাকে নয়, মণিকেও রক্ষা করতে চলে গিয়েছে। মণির অনেক অবিচার-অন্যায়কে আড়াল করতে দেখা যাচ্ছে মাসিকে, যদিও এক পর্যায়ে দেখা যায় তিনি দাবি করেছেন মণির প্রতি প্রশ্রয় কমানোর পরামর্শ তিনি যতীনকে দিয়েছিলেন। সেটা হয়তো তাঁর যতীনের অসুস্থ হওয়ার পূর্বের ভূমিকা। এখন অসুস্থ যতীনের মনোকষ্ট লাঘবের জন্যে কিন্তু তিনি সত্য গোপন এবং মিথ্যে ভাষণের একশেষ করে চলেছেন। অসুস্থ এবং মৃত্যু পথযাত্রীর ক্ষেত্রে বৈ এ যে এক সর্বনাশা স্নেহ, কে তা না বলবে? সংসারে ন্যায়-অন্যায়ের নিয়ামক কত বহু এবং বিচিত্র শক্তি যে কাজ করে, সৃষ্টিশীল রচনায় অর্থাৎ সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত তার ছবি এবং বিবরণই বরং অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য। মাসির বিভিন্ন এবং জটিল ভূমিকার নিয়ামক হিসেবে যতীনের কাছ থেকে সম্পদ-সম্পত্তি প্রাপ্তির কম-বেশি আকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছে কি-না, "শেষের রাত্রি" নামের একটি ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ সে-প্রশ্নটি তুলতে ব্যর্থ হননি। এরূপ বহু জটিল বাস্তবই যে মানুষের আচরণকে দৃষ্ট সব জটিলতা দানে চলে যায়, তাতে সন্দেহ নেই। অসহায়ত্ব এবং নির্ভরশীলতাকে অতিক্রম করে সত্য-ভাষণ

সংসারে ক'জন করতে পারে, এসব সত্ত্বেও দৃঢ়তা, প্রতিবাদ, ইত্যাদির শক্তি ক'টি ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে?

গল্পে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে মণি মৃত্যুপথযাত্রী যতীনকে একবার না-দেখেই তার নিজের বোনের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সীতারামপুরে যাচ্ছে। অবস্থা এবারে বেগতিক দেখে দীর্ঘকাল-প্রশ্রয়দাতা (যতীনের) মাসি তুলনামূলক শক্ত একটি অবস্থান নেন। স্বামী যতীনের প্রতি অবিবেচনার বেলায় মণিকে এটা উল্লেখ করতে দেখা যায় যে সে 'তিথি বার' মানে না। অমানবিকতার বেলায় প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়বিধ ভাবাদর্শকে ব্যবহারের ইতিহাসজোড়া সব ঘটনার এ-এক অতি ক্ষুদ্র এবং কৌতুককর দৃষ্টান্ত। দৃশ্য এবং সংলাপ এখানে মর্মন্তুদ এবং অত্যন্ত শিক্ষামূলক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২১) :

"একি বউ, কোথাও যাচ্ছ নাকি।"
"সীতারামপুরে যাব।"
"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"
"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"
"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না– কিন্তু আজ নয়।"
"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ্ করা হয়ে গেছে।"
"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে– তুমি কাল সক্কালেই চলে যেয়ো– আজ যেয়ো না।"
"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"
"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"
"বেশ তো, এখনো সময় আছে– আমি তাকে বলে আসছি।"
"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"
"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন– আজ যদি না যাই তো চলবে না।"
"আমি জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো– তাড়াতাড়ি কোরো না।"
"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে– দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।'

নারীবাদীদের জন্যে এখানে বিবেচনাযোগ্য (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২) একজন নারীর উদ্দেশে আর এক নারীর– মণির উদ্দেশে যতীনের মাসির এ-বক্তব্য : 'ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে...' ইত্যাদি। মণির আচরণের নির্মমতায় ব্যথিত মাসি যতীনের উদ্দেশে এ-ও বলেন, 'ওরে

বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই– আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।' কিন্তু, তা হলে কী হবে, পরক্ষণে দেখা গেল যতীনের মাসি যতীনের ঘরে গিয়ে বিশাল বিস্তৃত মিথ্যেয় ঢেকে দিচ্ছেন মণির অবিবেচনা এবং নির্মমতাকে। 'কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।' যতীনের এসব কথার উত্তরে তার মাসি বললেন, 'গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরো তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২)।' এই করুণ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তী সংলাপ নিম্নরূপ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২) :

> মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যানমাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।
>
> "মাসি।"
>
> "কি বাবা।"
>
> "আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক করো না।"
>
> "না বাবা, আমি শোক করবো না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় এ কথা আমি মনে করি নে।"
>
> "মাসি তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

"শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে এর পরের দৃশ্যেও দেখা যাচ্ছে যতীনের মাসি তাকে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় রেখে মণির তার ভাইয়ের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সীতারামপুরে চলে যাওয়ার ঘটনাটিকে যতীনের কাছ থেকে লুকিয়েই চলেছেন। পুরনো ধরনের কিন্তু বর্ধিত পরিহাস হচ্ছে যে এসব সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুতকৃত উইলে যতীন তার যাবতীয় সম্পদসম্পত্তি এই মণিকেই দিয়ে যাচ্ছে; এমনকি এর একটি অংশের ওপর যতীনের মাসির মালিকানা থাকলেও তিনি যতীনের কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছেন না, এবং সে জন্যে তাঁর কোনো অভিযোগও নেই। এতে কি যতীনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার বোধে কোনো পরিবর্তন আসবে? এ কি কোনো উপেক্ষিত এবং অভিমানী মানুষের আত্ম-অবনমন (Self-degredation)? অভিভাবক হিসেবে যাকে যতীন অনেক পেয়েছে, বার্ধক্যের ভরসা হিসেবেও উইলে তাঁকে যতীনের কিছুই না-দেওয়ার কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? সংসারে অবিচার-অন্যায় কি কোনো একটি-দু'টি

মানুষের? অন্যায় উপেক্ষার শিকার যে-ব্যক্তি, ঘটনার পরবর্তী স্রোতধারায় সে-ই কি হয়ে উঠছে না শিকারি-অন্যায়কারী, স্বয়ং যতীন? তার মাসির ক্ষেত্রে, তার প্রতি? যতীনের মাসিকে সহায়-সম্পত্তি কিছুই না-দেওয়া এবং তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এ-সময়ে এ দুটো মানুষ যে ভাববাদী এবং সান্ধ্য ভাষায় বাক্যবিনিময় করে, তা অত্যন্ত লক্ষণীয় (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৩), যেমন

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ওতো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"
"সেজন্য অত ভাবছ কেন, বাছা।"
"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না ?"
"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

যতীনের মণিকে সব সহায়-সম্পত্তি দিয়ে যাওয়াটা যে নানা অর্থে অপাত্রে দান হচ্ছে, তার মাসির সেই পুরনো অবস্থান দেখা যায় তিনি খানিকটা ধরে রেখেছেন, বলছেন, 'যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।' কিন্তু পরক্ষণেই এ-ও দেখা যায় যে রাশি-রাশি মিথ্যেয় তিনি মণির অনুপস্থিতি-উপেক্ষা-অবহেলাকে আড়াল করছেন, যেমন এবারে বলছেন, 'জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।' আর সঙ্গে সঙ্গে যতীনের বিশ্বাসপ্রবণতা, প্রেমোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি উথলে উঠেছে (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৪)।

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

এর পরে যেন দ্রুতই মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে যায়। মণির অনুপস্থিতি তথা প্রস্থান তথা নির্মমতার সত্যটি আকস্মিকভাবে ফেটে পড়ে। যতীনের মাসির কোনো পরিকল্পনাই তাকে রোধ করতে পারে না। যতীন যখন চেপে-ঠেসে অনুরোধ করে, মাসিকে, 'কেবল তাকে দু' মিনিটের জন্যে ডেকে দাও', এবং বলে আরো কিছু মর্মস্পর্শী কথা, মাসি তখন চাকর শম্ভুকে দরজার কাছে রেখে মণিকে ডেকে আনতে যান, বৃথাই, ব্যর্থ-নির্ধারিত। কারণ, সে তো তখন এ-বাড়িতেই নেই। আর এই

অবসরেই প্রকাশ পায় এই ভয়ঙ্কর সত্যটি। চাকর শম্ভু না-জেনে, না-বুঝে, তা জানিয়ে দেয়, 'জানিয়ে দেয় যে মণি তখন থেকে তিনদিন পূর্বে সীতারামপুরে গিয়েছে।' 'ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আসিল? সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।'

এমন একটি সত্য জানার পরও কিছুক্ষণ বাদে বুঝি যতীন শান্ত হতে পারে। তখন তার মাসি কাছে এলে সে তাকে শুধু তার গত রাতের স্বপ্নটির বিবরণ দেয়, এভাবেই শুধু তার ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ মনোভাব জানায়, 'মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল? কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলাম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।' যতীনের স্বপ্ন বিবরণটিকে তার মাসিও উদ্দিষ্ট অর্থেই গ্রহণ করলেন। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে এতে তিনি ভাবলেন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৫), 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো। প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে এই স্বপ্ন-বিবরণটির উল্লেখ আবারও ঘটে। কিন্তু, তার আগে দেখি যে যতীন আর তার মাসি তখন 'আর জন্মে' ছেলে এবং মেয়ে হয়ে জন্মানো নিয়ে বিপরীত কথা যা বলছে তার অর্থ গভীরতর। এই সব পরিচয়ের চেয়ে যে কর্মের পরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তারা বোধ হয় তা-ই বললেন, প্রকারান্তরে। মণির আচরণ এবং ভূমিকার কারণেই বোধ করি সেখানে মাসির আর মেয়ে হয়ে না-জন্মানোর মনোভাব। এরপরে যতীন যে বলে "চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।" তার ইঙ্গিতও কি মণির নির্মমতার দিকে, আত্মকেন্দ্রিকতার? কারণ, তারই উত্তরে মাসি যতীনকে বলেন, "যাই বল বাছা। তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৬)।"

এরপরে ছোটগল্পটির এক বড় পরিসমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ যতীনের দেখা স্বপ্নের প্রসঙ্গটিকে ফিরিয়ে আনেন। সে-ও যেন এক স্বপ্নদৃশ্য। মণির নির্মমতার সত্যটি যতীনের কাছে দিবালোকের মতো ধরা পড়েছে দেখা যায়। কিন্তু, তা তার মৃত্যুর প্রাক্কালে। এ সত্য মণিদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার সমস্যা যে থেকে গেল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি এবং তাই বর্তমান কালে "শেষের রাত্রি"র মতো ছোটগল্প এবং তার লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মতাবস্থান নিয়ে আলাপ-

আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। "শেষের রাত্রি"র শেষটুকু নিম্নরূপ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৭) :

বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো। ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।

কে এসেছে। স্বপ্ন?

স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে-তোমার শ্বশুর এসেছেন।

তুমি কে।

চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।

মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।

সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।

না মাসি, আমার পায়ের ওপর ও শাল নয়, ও শাল নয়। ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।

শাল নয় যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে– ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর। অমন করে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে। এখন একটুখানি চুপ কর্।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০০৯)। *কথা কালান্তরের, প্রগতির*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

রবার্ট ব্রাউনিং (১৯৫১)। *সিলেক্টেড পোয়েট্রি অব রবার্ট ব্রাউনিং*, কেনেথ এল. নিকারব্রুকার (সম্পা.), নিউ ইয়র্ক : মডার্ন লাইব্রেরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৫ক)। "সবলা", *সঞ্চয়িতা*, ঢাকা : প্রতীক। – (১৯৯৫খ)। গীতবিতান, ঢাকা : প্রতীক। (১৯৯৮)। *গল্পগুচ্ছ*, ঢাকা : প্রতীক।

হেনরিক ইবসেন। (১৯৮৪)। *ফোর গ্রেট প্লেজ বাই হেনরিক ইবসেন*, লন্ডন : ব্যান্টাম বুকস্